
আদমবোমা
সলিমুল্লাহ খান

'যে কোন মূল্যে' স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে হইবে। এই শপথবাক্য নিত্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাঁহারা নিজেদের বলিয়া থাকেন 'স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী'। সবার উপরে স্বাধীনতা সত্য, তাহার উপরে নাই। স্বাধীনতার নিকট শুদ্ধ প্রাণ নহে, খোদ ন্যায়বিচারও তুচ্ছ। এমনকি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইতে হইলেও স্বাধীনতা রক্ষা করা ন্যায্য। যাঁহারা এই দাবি তোলেন তাঁহাদেরই অপর নাম প্রকৃত প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী' বা লিবারেল।

এই বইয়ের ১৮ প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান নানান দিক হইতে প্রশ্ন তুলিয়াছেন লিবারেলিজম বা স্বাধীনতা-ব্যবসায় মতবাদটি কেন এই স্ববিরোধে পরিপূর্ণ। আরব নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ দেখাইয়াছেন আধুনিক জগতের জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারাই সাম্প্রতিক আত্মঘাতী বোমাবাজগণের পূর্বপুরুষ। তাহার বহু আগে ফ্রানৎস ফানোঁ দেখাইয়াছিলেন এই ব্যবসায়ীদের তত্ত্বজ্ঞানী হেগেলের দুনিয়ায় দাস শ্রেণীর বাসনা শ্রমের মধ্যে সীমিত বা নির্দিষ্ট। মেহনত-প্রমেহনতেই তাহাদের মুক্তি। ফানোঁর দুনিয়ায় দেখা যায় ইহার বিপরীত দৃশ্য। সেই দুনিয়ায় দাস শ্রেণীর বাসনা শ্রমে নহে, বরং শাসনে। দাসেরা সেখানে মনিব অর্থাৎ শাসক শ্রেণী হইতে চাহে।

সলিমুল্লাহ খান আদমবোমার মধ্যে এই বাসনারই ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার বিচারে আদমবোমা শুদ্ধ পদার্থ নহে, পদও বটে। পদ ও পদার্থ যেখানে একাকার হয় তাহাকে বলে সম্বল বা সিম্বল। আত্মহত্যা করিয়া কেহ স্বাধীন হয় না এ কথা সত্য কিন্তু আত্মহত্যার সম্ভাবনা হিসাবে না লইলে স্বাধীনতার কোন ভিত্তিই থাকে না। মহাত্মা গান্ধি হইতে স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপল, পণ্ডিত এডোয়ার্ড সায়িদ হইতে কবি শামসুর রাহমান পর্যন্ত স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের নানান রূপ এই বইতে দেখানো হইয়াছে।

তাহা হইলে মানব জাতির ভবিষ্যৎ কী?



সলিমুল্লাহ খান নানান বইয়ের লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক। ইহাদের মধ্যে:

আদমবোমা
Silence: On crimes of power
বেহাত বিপ্লব ১৯৭১
সত্য সাদ্দাম হোসেন ও 'স্রাজেরদৌলা'
সক্রাতেসের সাফাই ও অন্যান্য
আমি তুমি সে
ফ্রয়েড পড়ার ভূমিকা
বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থার চালচিত্র
আল্লাহর বাদশাহি: ওরোখি জুল্লের কবিতা
এক আকাশের স্বপ্ন

প্রকাশের অপেক্ষায়:

A theory of money: central banking in England 1793 1877

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্রমালার মধ্যে:

অর্থ: আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা পত্রমালা
Eqbalnama
ইতিহাস কারখানা
আহমদ ছফা মহাফেজখানা
জাক লাকাঁ বিদ্যালয়
সাম্রাজ্যবাদ বোধিনী

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

ইতিহাস কারখানা ২

সম্পাদক

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান

সহকারী সম্পাদক

সুরাইয়া জান্নাত সুমি
তানিয়া সুলতানা
সুমন আরেফিন

আদমবোমা

সলিমুল্লাহ খান

আগামী প্রকাশনী

এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা

দ্বিতীয় মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৪২০ ॥ ডিসেম্বর ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৪১৫ ॥ মার্চ ২০০৯

প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০, ফোন ৭১১১৩৩২, ৭১১০০২১
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

অক্ষরবিন্যাস: শরীফুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : মুর্তজা খাতুজিয়ান এর তৈলচিত্র অবলম্বনে শিবু কুমার শীল

মূল্য ॥ ৫০০ টাকা

Adomboma by Salimullah Khan
Itihas Karkhana II, ed. by Abul Khaer Mohammad Atikuzzaman

Second Print, Aghrayan 1420 BE, December 2013

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka 1100, Phone : 7111332, 7110021

PRINTED IN BANGLADESH

Price : Taka 500 / US$ 20

ISBN: 978 984 04 1584 7

২৭ মার্চ ১৯৯১

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন

আমার বড় ভাই

অধ্যাপক আমান উল্লাহ্ খান

এই বই

তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

বোমা

বলবার মতো আমাদের আর কোনো কথা নাই
যা বলার তা বলবে আমাদের বোমা
আমাদের মাথা ফেটে বেরিয়ে এসেছে ও মা
যা বলার তা বলবে আমাদের বোমা

আমাদের শেষ ফোঁটা লোহু চুষে খায়
যা বলার তা বলবে আমাদের বোমা
মড়ার মাথার খুলি
সুন্দর পালিশ হবে এমন বোমায়।

....

হ্যারল্ড পিন্টার
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

সূচিপত্র

সত্যের প্রয়োগ

সংবর্ধনা

আদমবোমা প্রবেশিকা

সলিমুল্লাহ খান লিখিত ইতিহাস কারখানা গ্রন্থমালার দ্বিতীয় ভাগ *আদমবোমা*। ভগবানের ইচ্ছায় দুই বৎসর আগে এই গ্রন্থমালা সম্পাদনার দায়িত্ব বেনামে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার ফসল গ্রন্থমালার প্রথম ভাগ *সত্য সাদ্দাম হোসেন ও 'স্রাজেরদৌলা'*। ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সদ্য প্রকাশ পাইয়াছে। (খান ২০০৯/ক) এই সংস্করণে আমি সনামেই প্রকাশিত হইয়াছি।

এই দ্বিতীয় ভাগে সলিমুল্লাহ খানের ১৮টি প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হইল। মনোনিবেশে সুবিধা হইবে মনে করিয়া এইগুলিকে পাঁচ গুচ্ছে ভাগ করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৯৮ হইতে ২০০৯ অবধি এক যুগের মধ্যে বিস্তৃত। এইসব প্রবন্ধের মধ্যে হয়তো অন্তর্গত কোন না কোন মিল থাকিয়া থাকিবে। মিলের কথা ভাবিয়াই লেখকের সম্পাদিত *বেহাত বিপ্লব* ১৯৭১ বই হইতে একটি এবং তাঁহার লিখিত *আমি তুমি সে* বই হইতে আরো দুইটি প্রবন্ধ এইখানে গৃহীত হইয়াছে। (খান ২০০৯/খ; খান ২০০৮/ক) এই বাবদ সহযোগী প্রকাশক যথাক্রমে ওসমান গনি ও পারভেজ হোসেন সাহেব আমাদের ধন্যবাদার্হ।

গত এক যুগ ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় যে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপনের যুদ্ধ শুরু করিয়াছে আমার দৃষ্টিতে তাহাই এই সকল প্রবন্ধের সাধারণ পটভূমি। ইহার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ায় ভৃত্যসমাজের প্রতিরোধ সংগ্রামও থামিয়া নাই। এই প্রবন্ধগুলিকে সেই সংগ্রামের প্রেক্ষিতে পড়িলেই সুবিচার হইবে বলিয়া মনে হয়।

১

ইতিহাস কারখানা গ্রন্থমালার প্রথম ভাগের কেন্দ্র ছিল এরাক যুদ্ধ। বর্তমান ভাগের কেন্দ্র সেই হিসাবে বলা যায় ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম। 'আদমবোমা' পদের মূল পদার্থ হয়তো এই যুদ্ধ ও সংগ্রামই। বলা বাহুল্য নয়, যুদ্ধ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম লইয়া লেখকের এই ধাঁচের সমস্ত প্রবন্ধ এইখানে জায়গা পায় নাই।

লেখার ক্রমানুসারে সঙ্কলনের প্রবীণতম প্রবন্ধ 'ভারতের পরমাণু বোমা ও মহাত্মা গান্ধি'। ইহা ছাপা হইয়াছিল পাক্ষিক *চিন্তা* পত্রিকায় ১৯৯৮ সালে। সর্বকনিষ্ঠ প্রবন্ধ 'সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতা' লেখা হয় জাতীয় কবিতা পরিষদের আমন্ত্রণে, এই ফেব্রুয়ারিতে। একই সময়ে লেখা অন্য দুইটি প্রবন্ধের একটি 'স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা', অন্যটি 'আদমবোমা না স্বাধীনতা-ব্যবসায়'।

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ এবং প্রথম গুচ্ছের একমাত্র সদস্য 'স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা'। ইহার আদিরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ* পত্রিকার পাতায়। ইহার পরিমার্জিত রূপ লেখকের *সাইলেন্স: অন ক্রাইমস অব পাওয়ার* বইতে পাওয়া যাইবে। (খান ২০০৯/গ)

আদমবোমাগুচ্ছের মোট চার প্রবন্ধে নতুন কথা কী আছে তাহা লেখকের জবানবন্দি 'ভৃত্যের প্রার্থনা'য় পাওয়া যাইবে। এই চার প্রবন্ধের প্রথম দুইটা *মাসিক আল-আশরাফ* নামক এক সাময়িকপত্রে ছাপা হয়। 'আদমবোমা না স্বাধীনতা-ব্যবসায়' এই বইতেই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্থ প্রবন্ধ 'সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতা' আমরা এই মাসের মাঝামাঝি প্রকাশ করিয়াছিলাম জাতীয় কবিতা উৎসবে বিতরণের উদ্দেশ্যে।

আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর অনৈতিক যুদ্ধ বিষয়ে সলিমুল্লাহ খান চারটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। একটা হামলা শুরু হওয়ার আগে, অন্য তিনটা যুদ্ধ চলাকালে। ২০০৩ সনে এই চার লেখা একত্রে ছাপে *মানুষ* পত্রিকা। পুনর্মুদ্রণ উপলক্ষে লিখিত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য এইখানে হয়তো প্রাসঙ্গিক: 'বিশ্ববাণিজ্যবিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতির সাথে যতটা আন্তরিকতা ও সততা বিস্তার করে যেভাবে বোঝাপড়া করলেন তা শেখার মতো।' মন্তব্যে আরো কথা ছিল, যেমন 'তাঁর লেখা থেকে আমরা চলমান

বিশ্বজোড়া যুদ্ধকে বুঝতে শিখেছি।' (নিউটন ২০০৩: ১৮১) ইহার সহিত সম্ভবত যোগ করা যাইবে: এই বোঝা এখনো চলিতেছে।

চতুর্থ গুচ্ছ প্রবন্ধের সার 'সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি'। ইহাদের কেন্দ্রে আছে সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার আধিপত্য ও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। একবাল আহমদের প্রাসঙ্গিক এক উক্তি এইখানে পুনরুদ্ধার করা যায়: 'যে ভাবধারায় আপনার স্বার্থ নাই সেই ভাবধারার সম্মুখে আপনিও যখন নতি স্বীকার করেন তখন বলিতে হইবে সেই ভাবধারার আধিপত্য কায়েম হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ এমনই।' (আহমদ ২০০৬/ক: ২৩১)

এই বইয়ের শেষ প্রবন্ধগুচ্ছের শিরোনাম মহাত্মা গান্ধির সম্মানে রাখা হইল 'সত্যের প্রয়োগ'। গান্ধিজি ছাড়াও এই গুচ্ছের দুই নায়ক স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপল এবং একবাল আহমদ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধের যেমন, তেমনি শেষ প্রবন্ধেরও—'একবাল আহমদের ১৯৭১'—বিষয়। সেই অর্থে বলা চলে ইহার দৌড় বাংলাদেশ পর্যন্তই।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পাকিস্তানি মনীষী একবাল আহমদ ছিলেন জন্মসূত্রে ভারতীয় কিন্তু অঙ্গীকারসূত্রে যেমন আরব (আলজিরীয় ও ফিলিস্তিনি) তেমনি ভিয়েতনামি কিংবা মার্কিন। তাঁহাকে একই সূত্রে বাঙালি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য করে তিনি ছিলেন সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

১৯৭১ সনের যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বলার মতন বুদ্ধিজীবী সারা পাকিস্তানে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ছিল না। একবাল আহমদ ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির সদস্য। তিনি শরিক হইয়াছিলেন আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে। ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে কাজ করাও তাঁহার জন্য কম সাহসের কাজ ছিল না। কিন্তু স্বাধীন আলজিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রামের নেতাদের উচিত সমালোচনা করিতে তিনি কখনো দ্বিধা করেন নাই। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি যেমন দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানাইয়াছিলেন তেমনি সংগ্রামী নেতৃত্বের দোষত্রুটি নির্দেশ করিতেও পিছ-পা হন নাই। 'একবাল আহমদের ১৯৭১' প্রবন্ধে সলিমুল্লাহ খান লিখিয়াছেন, 'দেশ আলাদা হইলেই সামাজিক অন্যায়ের শেষ হয়, ইহাও তিনি ভাবিতেন না।' তাঁহার চিন্তাধারার এই রকম নমুনা এই প্রবন্ধে আরো পাওয়া যাইবে।

নাইপল প্রসঙ্গে একবাল আহমদ একবার বলিয়াছিলেন নাইপল 'অসাধু' লেখক। তাই তাঁহার আর লেখা উচিত নয়। দরকার হইলে তিনি শুয়োরের

কাবাব বা সসেজ বিক্রি করিতে পারেন। একবাল আহমদের এই মন্তব্য উৎকলিত হয় নাইপলের *বিয়োন্ড বিলিফ* বই প্রসঙ্গে। (আহমদ ২০০০: ১১১) একবাল আহমদ যাহাকে বলিয়াছেন 'সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ' নাইপলের এই জাতীয় লেখা তাহার সাক্ষাৎ উদাহরণ। নাইপলের যে বই পড়িয়া একবাল তাঁহার তিক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই একই বই পড়িয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মত লিখিয়াছিলেন *প্রথম আলো* পত্রিকার কলাম লেখক হাসান ফেরদৌস। (ফেরদৌস ২০০০) সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক প্রকাশের আরো উদাহরণ দরকার হইলে হাসান ফেরদৌসের কলাম পড়া যাইতে পারে।

'স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের অখণ্ড ভারত' লিখিত হইয়াছিল হাসান ফেরদৌস লিখিত কলামের প্রতিবাদস্বরূপ। *প্রথম আলো* লেখাটির কিছু অংশ এক সংখ্যায় প্রতিক্রিয়া আকারে এবং বাকি অংশ দুই সপ্তাহ পরের আরেক সংখ্যায় দুর্ভাগ্যবশত পাঠকের চিঠি আকারে ছাপায়। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি এই প্রথম একত্রে ছাপা হইল। ঐতিহাসিক কারণে হাসান ফেরদৌসের মূল লেখাটিও সংবর্ধনা অংশে ছাপা হইতেছে। অনুমতি প্রদানের জন্য আমরা *প্রথম আলো* কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

হাসান ফেরদৌসের লেখার শেষাংশে প্রসঙ্গক্রমে প্রয়াত কবি ফররুখ আহমদের সমালোচনা করা হয়। সলিমুল্লাহ খানের দৃষ্টিতে তাহা ছিল 'অসাধু সমালোচনা'। ফররুখ আহমদের জীবন ও কবিতা লইয়া অনেক বিতর্ক আছে—এই কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি খোদ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন—কথাটা ইতিহাসসম্মত নহে। এই কথার প্রমাণ সলিমুল্লাহ খান তাঁহার লেখায় হাজির করিয়াছেন।

ইচ্ছা করিলে ১৯৭৩ সনে প্রকাশিত আহমদ ছফার বিখ্যাত লেখাটির দোহাইও তিনি দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দেন নাই। এই লেখাটিও সংবর্ধনা অংশে গ্রহণ করা হইল। অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা আহমদ ছফার ওয়ারিশগণের, বিশেষ নূরুল আনোয়ারের, ঋণ স্বীকার করিতেছি।

সংবর্ধনা গুচ্ছের অন্য তিন রচনা 'সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতা' প্রবন্ধে পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত ছিল। সর্বশেষ রচনা 'কালো আণ্ডা' এই বইতে রাখা হইয়াছে লেখকের ইচ্ছায়, হয়তো যুক্তির তোয়াক্কা না করেই। শত হউক উপপাদক তো তিনিই, আমি সম্পাদক মাত্র!

পরিশেষে জানানো প্রয়োজন, উৎকলিত 'বোমা' কবিতাটির অনুবাদ সলিমুল্লাহ খানের *সত্য সাদ্দাম হোসেন ও 'স্রাজেরদৌলা'* বই হইতে নেওয়া হইয়াছে। (দেখুন, খান ২০০৯/ক: ৯৭) সম্প্রতি প্রয়াত ব্রিটিশ মনীষী কবি

ও নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার ২০০৩ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরাক আক্রমণের প্রতিবাদে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

কয়েকটি রচনার আদি শিরোনাম এইখানে সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের পাত্র ও সময় বলিয়া রাখিয়াছি। কিছু সূত্র অনিশ্চিত থাকায় সময়কাল বাংলা পঞ্জিকানুসারে লিখিতে পারিলাম না। এই অপরাধে আমরা সহৃদয় পাঠকের মার্জনা প্রার্থনা করি।

২

আগেই বলিয়াছি, এই বইয়ের বেশির ভাগ লেখা পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে এইখানে যাহা ছাপা হইতেছে তাহা ব্যাপক মাত্রায় পরিমার্জিত। আমার বিশ্বাস ইহাতে বক্তব্যবস্তু সমান মাত্রায় সম্মার্জিত হয় নাই। জলের সঙ্গে আশা করি শিশুটাও পড়িয়া যায় নাই।

তবে একটা কথা বলিতেই হইবে। পূর্বের বইগুলিতে আমরা সম্পাদনার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার একটা কঠোর রীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এই বইতে তাহা খানিক শিথিল হইতে শুরু করিয়াছে।

আমি তুমি সে সম্পাদনার শেষ পর্যায়ে লেখক আবেদন করিয়াছিলেন 'কাল'কে 'কালো', 'ভাল'কে 'ভালো' করিতে হইবে। এই বইতে তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। সলিমুল্লাহ খানের 'ভাষারীতি, শব্দের ব্যবহার, এমনকি বানানও দিনান্তরে বদলাইয়া যায়।' আমাদের এই পুরানা অভিযোগ এখনো বর্তমান।

সজ্জন, লক্ষ্য করিবেন যে কেবল 'সোবিয়েত', 'এয়ুরোপ', 'সক্রাতেস', 'ক্লাইব' প্রভৃতি বিদেশি শব্দই নহে, অতি বাংলা এমনকি সংস্কৃত শব্দ—যেমন 'শুদ্ধ', 'অতয়েব'—পর্যন্ত তিনি এমনভাবে লেখেন যাহা দেখিয়া না ভড়কাইয়া উপায় থাকে না। একজন 'পাঠিকা' এইসব বানানকে বলিয়াছেন 'বিদঘুটে'। তদুপরি লেখক কোন প্রকার 'প্রমিত' বানানরীতি অনুসরণ করেন না। এই কথা আবারো আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি।

বিদেশি ভাষার অধিকাংশ উদ্ধৃতি বাংলা তর্জমায় দেওয়ার পর মূলভাষার উদ্ধৃতিগুলি বোধিনীতে নেওয়া হইয়াছে। বিদেশি লেখার কিছু উদ্ধৃতি শুদ্ধ বাংলায় ছিল। সেইগুলির মূলরূপ নতুন করিয়া বোধিনীতে যথাসম্ভব যুক্ত করা হইল।

গ্রন্থের শেষে সংবর্ধনা পাওয়া লেখাগুলি উৎসের মুদ্রণ ভ্রান্তিসহ অবিকল রাখা হইয়াছে। একই প্রকারে মূল রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতিও যথা সম্ভব মূলানুগ

করিয়াছি। কিছু ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ খুঁজিয়া পাই নাই। তাই উদ্ধৃতিতে ভুল থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না।

আমাদের গৃহীত নতুন রীতি অনুসারে সকল বোধিনী ও দোহাই একত্রিত করিয়া গ্রন্থের শেষে পৃথক বিভাগ আকারে সংযুক্ত হইল।

৩

এই বই প্রকাশে লেখক এবং সম্পাদক যাঁহাদের কাছে ঋণী তাঁহাদের মধ্যে আছেন নূর মোহাম্মদ, আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, এ. কে. এম. সলিমুল্লাহ, মফিদুল হক, রেহনুমা আহমেদ, মোহন রায়হান, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, জিয়াউর রহমান, সাজ্জাদ শরিফ, জহিরুল ইসলাম কচি, শহিদুর রহমান, ব্রাত্য রাইসু, সুমন রহমান, রাশিদা সুলতানা, সায়দিয়া গুলরুখ, সেলিম রেজা নিউটন, সায়েমা খাতুন, শরীফ আতিক-উজ-জামান, সাখাওয়াত হোসেন হাওলাদার, আল-আসাদুল করিম, কুতুব হিলালি ও শান্তনু খান গ্রামসি।

হাসান ফেরদৌসের লেখাটি *প্রথম আলো* হইতে নরমরূপে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে শরিফুল ইসলাম হাসান। তাহার এই অবিস্মরণীয় সাহায্যের সুবাদেই রচনাটি যথাসম্ভব নির্ভুল ছাপা সম্ভব হইয়াছে। হাসান আমার সহপাঠী মাত্র নহে, বন্ধুও বটে।

সম্পাদনা দলেও আমার কতক বন্ধু আছেন। না থাকিলে এই বই বই হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। সুরাইয়া জান্নাত সুমি, তানিয়া সুলতানা এবং বিশেষভাবে সুমন আরেফিনকে লইয়া এই দল। তাঁহারা কতখানি কাজের কাজ করিতে পারিলেন সেই বিচারের ভার পাঠকের হাতেই থাকুক। প্রচ্ছদ আঁকিয়াছেন তরুণ শিল্পী শিবু কুমার শীল। লেখকের ছবি তুলিয়াছেন নাসির আলী মামুন। তাঁহারা আমাদের উত্তমর্ণ। অক্ষরবিন্যাস এমনকি সম্পাদনার কাজেও শরীফুল ইসলামের অক্লান্ত সহযোগিতা না হইলে এই বই ঠিক কবে বাহিরে আসিত বলিতে পারি না।

বইটির প্রকাশ উপলক্ষে ইঁহাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

....

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান

১৪ ফাল্গুন ১৪১৫

ভৃত্যের প্রার্থনা

Chez Hegel, l'esclave se détourne du maître et se tourne vers l'objet. Ici, l'esclave, se tourne vers le maître et abandonne l'objet.

হেগেলের দুনিয়ায় দাস মনিবমুখী হয় না, সে কাজে মন দেয়।
আমাদের দুনিয়ায় আমরা দাসেরা কর্মমুখী হই না, মন দিই মনিবে।

—ফ্রানৎস ফানোঁ (১৯৫২: ১৭৯)[১]

এয়াহুদি বংশের বিখ্যাত ফরাসি মনীষী এমিল দুর্খাইম নাকি একদা বলিয়াছিলেন এয়াহুদি জাতির সদস্যরা কোনদিন আত্মহত্যা করে না।

এই খবর শুনিয়া আরেক দিন মহাত্মা ফ্রানৎস ফানোঁ বলিতেছিলেন এখন কালো মানুষের পালা আসিয়াছে। বলা হইতেছে কালো মানুষ কোনদিন আত্মহত্যা করে না। মার্কিন লেখক রিচার্ড রাইটের কোন গল্পে শ্বেতজাতির জনৈক সদস্য বলিতেছেন, 'আমি যদি কালো মানুষ হইতাম, আমি তো আত্মহত্যা করিতাম... ।' তিনি আকারে ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন এহেন অপমান অবিচারের মুখে একমাত্র কালো মানুষ ছাড়া আর কেহ আত্মহত্যা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

এই দাবির প্রতিবাদচ্ছলে ফ্রানৎস ফানোঁ অনেক সংখ্যা হাতড়াইয়া দেখাইতেছিলেন কালোরাও কিন্তু আত্মহত্যা করে। ডেট্রয়েটের নগর হাসপাতাল হইতে সংখ্যা ঘাঁটিয়া তিনি দেখাইলেন ঐ শহরের জনসংখ্যার শতে ৭.৬ জন মাত্র লোক কালো বর্ণের হইলেও মোট আত্মঘাতীর সংখ্যার শতকরা ১৬.৬ জনই কালো মানুষ। সিনসিনাটি অঞ্চলের আত্মঘাতী তালিকায় দেখা যায় কালো মানুষের মধ্যে আত্মঘাতীর সংখ্যা সাদা আত্মঘাতীর দুই গুণ। তাহাতে আবার পুরুষের অনুপাতে নারী আত্মঘাতীর সংখ্যা ঢের বেশি। যেখানে পুরুষ আত্মঘাতীর সংখ্যা মাত্র

৭৬ সেখানে নারীর সংখ্যা ৩৫৮ জন। (ফানোঁ ১৯৫২: ১৭৭; ফানোঁ ১৯৭০: ১৫৫)

এই খবর ১৯৫২ সনের। তখন আরব, বিশেষ ফিলিস্তিনি জাতির পালায় কী বলা যাইত তাহা আন্দাজ করিতে আপনারা বিশেষ বেগ পাইবেন না। তাহাদের বেলায় এখন আর বলা যাইতেছে না আরব জাতি কোনদিন আত্মহত্যা করে না। যাইতেছে কি?

ইংরেজি ২০০০ সনের পর হইতে দেখা যাইতেছে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আত্মহত্যার পালা আরো ভারী হইয়াছে। বিশেষ ২০০১ সনের বিশ্ববিখ্যাত আত্মহত্যার পর কেহ আর ভুলেও দাবি করিবেন না আরব জাতি আত্মহত্যা করে না। করিবেন কি?

আরবরা এখন এত বেশি বেশি আত্মহত্যা করিতেছে কেন? আরব বংশোদ্ভূত নৃবিজ্ঞান বিশারদ তালাল আসাদের এক পুস্তিকার তিন বক্তৃতা ভরসা করিয়া আমি এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিয়াছি। তালাল আসাদ ইহার উত্তর পুরাপুরি দিতে না পারিলেও প্রশ্নটি নিশ্চিত তুলিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্য বলিতেই হইবে।

তিনি ফিরিয়া প্রশ্ন ছুঁড়িয়া দিয়াছেন। এয়ুরোপ ও আমেরিকার স্বাধীনতাবাদী বা লিবারেল মহল—যাঁহাদের প্রকৃত নাম আমি বাংলায় 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী' রাখিবার পক্ষে—যদি এই আত্মঘাতীদের সন্ত্রাসবাদী বলিতে চাহেন তবে বলিবেন কোন মুখে? তালাল আসাদ দেখাইয়াছেন যাঁহারা আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছেন তাঁহাদেরও সন্ত্রাসবাদী বলা যায় একই যুক্তিতে। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বুর্জোয়া বিপ্লবীদের সেই অপবাদ দেওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই আরব আত্মঘাতীদেরও মুক্তিযোদ্ধা বলা ছাড়া উপায় কি?

তালাল আসাদ স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিয়াছেন কিনা তাহা বড় কথা নহে। তাঁহার কথার নির্গলিতার্থ কিন্তু ইহার চাইতে ভিন্ন নহে। আমার আদত ইচ্ছা ছিল তালালকে ছাড়াইয়া আরো একটু আগাই। আপাতত সেই অবসর পাইলাম না। এইখানে আমার চিন্তার আভাসটুকু দিয়া রাখিতেছি।

১

আমার 'আদমবোমা: পশ্চিমা সাম্রাজ্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধটি আকাশপাড়ায় প্রকাশিত হইবার পর এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তালালের মত আমিও আদমবোমা সমর্থন করি কিনা। আমি উত্তর দেওয়া দরকার মনে

করি নাই। এইখানেও সেই উত্তর দিব না। শুদ্ধ উত্তরে-দক্ষিণে ফ্রানৎস ফানোঁর নাম লইব।

একদা প্রশ্ন ছিল আরব লোক আত্মহত্যা করে না কেন? এখন বরং প্রশ্ন চলিতেছে উঁহারা এই দুষ্কর্ম করিতেছে কেন? আরব জাতির প্রাণকোষে ইহার উত্তর লিখা আছে এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। এসলাম ধর্মের বিশ্বকোষেও ইহার ব্যবস্থাপত্র লিখিত নাই। কোথাও যদি এই ব্যবস্থাপত্র লিখিত থাকিতই থাকিত সেই 'লৌহ মাহফুজে' যেখানে মানুষ কী করিয়া মানুষ হইল তাহার গোপন বাণী লিখিত আছে।

মনীষীর দোহাই দিয়া মহাত্মা ফানোঁ বলিতেছেন হেগেলের দুনিয়ায় প্রভু ও ভৃত্য, মনিব ও দাস একে অপরের উপর নির্ভর করে। দাস মনিবের দরবারে হাত পাতে মানুষ হিসাবে গণিত হইবার জন্য। কিন্তু মনিব দাসের দরবারে একই দাবি লইয়া হাত পাতে না। দাস তাহাকে মানুষ বলুক আর না-ই বলুক তাহাতে মনিবের কিছু আসেও না, যায়ও না। মনিব শুদ্ধ কাজ মাগে। উদ্বৃত্ত মূল্য যাচ্ঞা করে। দাস কাজ করিলেই মনিবের তুষ্টি। গণিত হইবার জন্য তাহার অন্য মানুষ, অন্য মনিব চাই।

হেগেলের দুনিয়ায় ভৃত্য বা বান্দা বা দাস জয়ী হয় কাজের মধ্যে। সে যখন মেহনত করে তখন সব জানিয়া ফেলে। তাই জিত হয় তাহারই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের নায়ক হয় সে-ই। বান্দা বলিয়াই সে নায়ক। শুদ্ধ শ্রমিক বলিয়াই সে মুক্তিযোদ্ধা। শ্রমই তাহার মুক্তির সোপান। শ্রমেই সে মুক্ত হয়।

ফ্রানৎস ফানোঁর দাস কিন্তু একটুখানি আলাদা। শ্রমের মধ্যে সে মুক্তি খোঁজে না। সে মুক্তি খোঁজে প্রভুর মধ্যে, মনুষ্যত্বের মধ্যে। ফানোঁর ভাষায় 'কালো মানুষ মনিবের মতন হইতে চাহে।' মানে সে কাজ ছাড়িয়া দেয়। তাহার ধ্যানজ্ঞানের বিষয় হইয়া ওঠে খোদ মনিব, স্বয়ং প্রভু। বান্দা পরমের স্বাদ পাইবার সাধ করে। 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।'

ফলে—ফানোঁজি কহিতেছেন—তাঁহার কালো মানুষ হেগেলস্য দাসের তুলনায় খানিক কম স্বাধীন, কম স্বনির্ভর। হেগেলের দাস মনিব ভুলিয়া কাজে রত হইয়াছিল, কর্মরতিতেই জুটিয়াছিল তাহার মুক্তি। কিন্তু ফানোঁর দাস—কালো মানুষ—কাজ ভুলিয়া স্বয়ং মনিবে উপরত হইল।

আমার প্রস্তাব আপনারা কালো মানুষ বা নিগ্রোর জায়গায় আরব বা ফিলিস্তিনি লিখিয়া লইবেন। যুক্তির কোন হেরফের হইবে না।

আরব কেন, সমস্ত আদমই আদমবোমা বনিতেছে এই কারণেই। আদম মানে শুদ্ধ মানুষ নহে, প্রথম মানুষ। এই কথা ভুলিবেন কি করিয়া?

যদি আমরা পদে পদে হেগেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতাম তো বলিতাম দাস মানে সে, যে আত্মহত্যায় পরান্মুখ, যে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে অর্থাৎ কাজে রত হইয়াছে। হেগেলদাসের ধর্ম, তাহার অবলম্বন, তাহার পদ 'কর্মরতি'। অথচ আমরা ফানোঁর 'পদার্থ' ধরিয়া দেখিলাম নতুন দাসের ধর্ম কর্মরতি নহে, বরং 'কর্মবিরতি'। তাহার রতি খোদ মনিবে।

> হেগেলের দুনিয়ায় দাস মনিবমুখী হয় না, সে কাজে মন দেয়।
> আমাদের দুনিয়ায় আমরা দাসেরা কর্মমুখী হই না, মন দিই মনিবে।

হেগেল বলিয়াছিলেন স্বাধীনতা পাইতে হইলে জীবনের ঝুঁকি লওয়া ছাড়া উপায় নাই। হেগেলের ভাষায় যে প্রাণী নিজেকে জানে সেই প্রাণীর নামই মানুষ। তাহার মধ্যে মনের উষ হইয়াছে। তাহার স্বভাব শুদ্ধ প্রাণের মধ্যে (bare life) সীমাবদ্ধ থাকা নহে। সৃষ্টির প্রথম আলোতে প্রাণ যেরূপে দেখা দেয় নিজেকে জানার পর সেই প্রাণ সেই আদ্যরূপে আর বিরাজ করে না। প্রাণের বিশাল প্রান্তরে (life's expanse) অন্তর্গত হওয়া সজ্ঞান বা জ্ঞানী প্রাণের (self-consciousness) নিদর্শন নহে।[২]

তিনি আরো জানাইয়াছিলেন, 'যে প্রাণী নিজের প্রাণ ত্যাগ করিবার ঝুঁকি লয় নাই তাহার মুখ মানুষের মতন (person)—এ কথা নিঃসন্দেহে মানিতে হইবে সত্য। কিন্তু স্বাধীন সজ্ঞান প্রাণ আকারে গণিত হইবার গূঢ়কথা কী তাহা সে ধরিতেই পারে নাই।'[৩]

আরব যেদিন এই ঝুঁকি লইতে শুরু করিয়াছে সেদিন সে মানুষ হইয়াছে। মানুষ মানুষ হইতে পারে কেবল প্রাণধারণের মধ্যে নহে। প্রাণত্যাগের মধ্যে, নিঃশেষে প্রাণ দান করিবার মধ্যেই মানুষের মানুষ বা স্বাধীন সজ্ঞান প্রাণী হইবার চাবি।

আমি মানুষ হইয়াছি কিনা তাহার কষ্টিপাথর আমি নহি, সেই কষ্টিপাথর তুমি ও সে। আপনারা ও তাহারা। আমি আমার প্রাণের ঝুঁকি লইয়াছি মানে আমার জগতের আরাম ছাড়িয়া তোমার ও তাহার জগতে—'সাব্যস্ত' ভুবন (subjective certainty, *Gewissheit*) ছাড়িয়া 'অভ্যস্ত' জগতে (objective truth, *Wahrheit*)—উঠিতে চাহিতেছি।

আমি চাই (I desire) মানে কি? ফানোঁ বলিয়াছেন আমি চাই মানে আমি তোমাকে যেমন গণিতেছি তুমিও আমাকে তেমন গণিতেছ কিনা সেই জিজ্ঞাসা (recognition)। আমি প্রকৃতির সামগ্রী মাত্র নহি, আমি শুদ্ধ ছিপি-আঁটা বোতলের বাতাস নহি। আমি অন্য কোথাও যাইতেছি, আমি চলিয়াছি অন্য

কিছুর লাগিয়া। আমি তাই তোমাকে বলিতেছি তুমি আমাকে যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা নহি। শুদ্ধ তোমার ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার নহি। আমাকে যদি নিছক এক টুকরা প্রাণ ভাবিয়া থাক তবে তুমি ভুল করিয়াছ।

আমি প্রাণমাত্র নহি, প্রাণ ছাড়াইয়া আমার মনুষ্য পরিচয়। আমি প্রাণ পার হইয়া যাইতে চাহি মানুষের সংসারে—মানুষ মানে শুদ্ধ প্রাণ নয়, বস্তু নয়, মানুষ মানে আরেক মানুষ, মানুষের জগৎ। সেই জগতে একে অপরকে গণনা করে।[৪]

যে আমাকে গণিতে চাহে না সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে। তাঁহার সম্মুখে আমি এই দাঁড়াইলাম, মানে আমি মৃত্যুর পরোয়ানা করিতেছি না। বরং মৃত্যুর উপরই জারি করিতেছি মৃত্যু পরোয়ানা।

আমি নিজেকে শেষ করিয়া দিব। তবু জয় করিতে দিব না তোমাকে। ইহারই অপর নাম অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলা। আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিব। যে কখনো আত্মহত্যা করিবার সাহস করে নাই সে কখনো মানুষ হয় নাই।[৫]

যাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার ইহার বেশি আর বলিবার নাই।

২

জাঁ পল সার্ত (Jean Paul Sartre) একবার—১৯৪৮ ইংরেজিতে—*কালো অরফিয়ুস* (*Orphée noir*) বইয়ের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন:

> যে সকল কালো মুখে ঠুলি পরাইয়া তোমরা এতদিন চুপ করাইয়া রাখিয়াছিলে সেই সব ঠুলি এখন খুলিয়া দিয়া তুমি কী আশা করিতেছ? তাঁহারা তোমার হামদ ও নাত গাহিবে? এইসব মাথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদা জোর করিয়া দাবাইয়া দিয়াছিলেন, এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পর তাহাদের চোখ হইতে তুমি কী প্রেম আর প্রীতি আশা করিতে পারো? (দেখুন, ফানোঁ ১৯৭০: ২২)

উত্তরে ফানোঁ বলিয়াছিলেন: 'না। তবে শুদ্ধ এইটুকু বলিব আমার চোখে কোন গোনাগুণতিও নাই, কোন ঘৃণাও নাই। আছে শুদ্ধ প্রশ্ন, চিরস্থায়ী প্রশ্ন। যে আমার চোখে অন্য কিছু দেখিবার আশায় তাকাইবে সে দৃষ্টিশক্তি হারাইবে।'[৬]

আত্মহত্যায় যে প্রস্তুত নহে, *যে কোন মূল্যে* স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যে সদা জাগ্রত নহে, সে মানুষ হয় নাই। হেগেলের এই প্রস্তাব শুদ্ধ যাহার বেলায়

প্রযোজ্য সে একই সঙ্গে যেমন মানুষ তেমনি প্রভুও বটে। তাঁহার প্রস্তাবের নির্গলিতার্থ, যে প্রভু হয় নাই সে মানুষই হয় নাই।

জাঁ-জাক রুসোর কথাটা তাই আমাদের পাল্টাইয়াই বলিতে হইবে। মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মায় নাই—তাহাকে স্বাধীন হইয়া উঠিতে হইবে।

হেগেল ভাবিয়াছিলেন কিছু 'মানুষরূপ' আছে যাহারা কোন দিন মানুষ হইবে না—তাহারা প্রাণীই থাকিয়া যাইবে। তাঁহার অভিধানে মানুষরূপী প্রাণীর অপর নাম তাই দাস। এই মনীষীর এক বাক্য অনুসারে মানুষ মাত্রই যেমন প্রভু হইতে পারে তেমনি দাসও বনিতে পারে। তাঁহার অন্য বাক্য অনুসারে আবার যে প্রভু হয় নাই সে মানুষই হয় নাই। ইহা আমরা একটু আগেই দেখিয়াছি।

তাঁহার কথার স্ববিরোধ এইখানে যে, এক অর্থে দাস হইয়াও কোন কোন মানুষ পদবাচ্য, আবার অন্য অর্থে মানুষের সংজ্ঞাই এমন যে সে দাস হইতেই পারে না। যাঁহারা বলিয়া থাকেন কালো মানুষ, আরব মানুষ, পরাজিত মানুষ ইতি আদি মানুষ আর কোন দিন মানুষ হইবে না, শুদ্ধ দাসই থাকিয়া যাইবে তাহাদিগকেই বলা হয় রক্তবাদী বা বর্ণবাদী। কারণ তাঁহারা গাত্রবর্ণের বা রক্তধারার সহিত মনুষ্যত্বের সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ণবাদীরা পরের দেশ দখল করিয়া রাখিবার সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ যোগ করিলেন, কালো মানুষ চিরকালই দাস থাকিবে। এই কথায় অন্যরাও—স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীরাও—সায় দিলেন। ইঁহারা নাকি এয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ফ্রানৎস ফানোঁর বিচারে বর্ণবাদ এই কারণেই আমেরিকা ও এয়ুরোপের সাধারণ দৌলত, সার্বজনীন সম্পত্তি। তাঁহার গুরু কবি এমে সেজারের দোহাই পাড়িয়া তিনি দেখাইয়াছেন নাৎসি নেতা আডলফ হিটলারের বর্ণবাদ হইতে আর দশ বুর্জোয়া এয়ুরোপীয় ভদ্রলোকের বর্ণবাদ মোটেও আলাদা নহে। কিছু কথা সেজারের বক্তৃতা হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন:

> রেডিও খুলিতেই যখন শুনি মার্কিন মুলুকে কালোদের ধরিয়া ধরিয়া ঝুলাইয়া মারা হইতেছে, তখনি বলি আমাদের এতদিন মিছাকথা শোনানো হইয়াছে: হিটলার মারা যায় নাই। রেডিও খুলিতেই যখন শুনি এয়াহুদিদের অপমান করা হইয়াছে, অপদস্থ করা হইয়াছে, উৎপীড়িত করা হইয়াছে, তখনি বলি আমাদের মিছাকথা শোনানো হইয়াছে: হিটলার মারা যায় নাই। শেষমেশ রেডিও খুলিতেই যখন শুনি আফ্রিকায় জবরদস্তি করিয়া বেগার শ্রম আদায়ের প্রথা চালু করা হইয়াছে, আইনের আওতায়ও আনা হইয়াছে, তখনি বলি আমাদের সত্য সত্য মিছাকথা শোনানো হইয়াছে: হিটলার মারা যায় নাই।[৭]

তাহা হইলে কী দাঁড়াইল? কোন কোন মনীষী বলিলেন, পরদেশ দখল করিয়া বর্ণবাদী শাসন চালু করার অপরাধে এয়ুরোপীয় সভ্যতা এবং ইহার যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁহারা দায়ী নহেন। এই বর্ণবাদের দায় তাহা হইলে শুদ্ধ চোর-ডাকাত আর রাষ্ট্রনেতাদেরই? সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ ইহার দায় নিবেন না? অন্য এক ফরাসি মনীষীর বরাত দিয়া ফানোঁ লিখিলেন—নিতে হইবে। যে জাতির নাম ভাঙ্গাইয়া অপরাধ করা হয় সে জাতির প্রত্যেক সদস্যই তাহার জন্য দায়ী।[৮]

এয়ুরোপ ও আমেরিকার এই অপরাধ, এই দায় আছে বলিয়াই কি তাঁহারা আর দশ নিষ্ঠুরতাকে যত ভয় পাইতেছেন, ঘৃণা করিতেছেন আদমবোমায় তাহার চেয়ে ঢের বেশি ঘৃণা অনুভব করিতেছেন আর ভয় পাইতেছেন? হয়তো তাহাই।

৩

ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী এডোয়ার্ড সায়িদ ১৯৭৯ সনে *ফিলিস্তিন সমস্যা* (*The Question of Palestine*) নাম দিয়া একটি বই লিখিয়াছিলেন। সেই বইতে তিনি সাহস দেখাইয়া ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদের নিন্দামন্দও বেশ করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যের মধ্যে, এডোয়ার্ড সায়িদও এয়ুরোপীয় স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীর মতন বলিলেন ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদ জিনিসটা ভালো নহে। তবে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করিলেন, তুলনা করিলে দেখা যাইবে এসরায়েলের সন্ত্রাসবাদ পরিমাপে অনেকগুণ বেশি। দুই সন্ত্রাসবাদের তুলনা করিলে এসরায়েলের দিকের পাল্লাটা ভীষণভাবে ঝুঁকিয়া আছে—ইতিহাসের খাতায় তাহাই দেখা যাইতেছে। (সায়িদ ১৯৯২: [৩৮])

এডোয়ার্ড সায়িদকে ভর্ৎসনা করিয়া একবাল আহমদ বলিয়াছিলেন এই তুলনা অর্থহীন। অপরাধ, বিনিময়যোগ্য পণ্য নহে। এডোয়ার্ড সায়িদের স্বাধীনতা-ব্যবসায় আমরা এখানে ধরিয়া লইতেছি 'অজ্ঞান' স্বাধীনতা-ব্যবসায়। তাই ইহাতে আমাদের ভ্রান্তি আরো বাড়িতেছে। অজ্ঞান স্বাধীনতা-ব্যবসায় এডোয়ার্ড সায়িদের বিবরণকে বেশ ম্লানই করিয়া দিয়াছে।

একবালের বিচারেও সায়িদ আরব ইতিহাসের কয়েক পাতা বুঝিতে পারেন নাই। ফিলিস্তিন মুক্তিসংঘ বা পি.এল.ও. যেদিন রক্তারক্তি শুরু করিল তাহার আগের দিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন সমস্যা বলিয়া একটা সমস্যা যে আদপেই ছিল তাহা কেহ স্বীকারও করে নাই।

১৯৪৮ সনের পর আনুমানিক ২০ বৎসর পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে এয়ুরোপ আমেরিকা তো গণনার যোগ্যও মনে করে নাই। পি.এল.ও. আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত ওঁরা নাক ডাকিয়া বলাবলি করিতেন 'আরব শরণার্থী সমস্যা' লইয়া কিছু একটা করিতে হইবে। ফিলিস্তিনি গেরিলাদের বিমান ছিনতাইপর্ব শুরু হইবার আগের ২০ বৎসর আরব নেতারা কূটনৈতিক প্রচারণা বাদে সংগ্রামের অন্য কোন পথই অবলম্বন করেন নাই।

কূটনৈতিক প্রচারণার ফলে সম্মিলিত জাতিসংঘে এক ডজনেরও বেশি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেগুলি কেহ প্রয়োগ করিতে চাহেও নাই, পারেও নাই। এই আটকুঁড়ে প্রস্তাব-সংগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিলে ফিলিস্তিনি জাতির সেই কূটনৈতিক সংগ্রাম হইতে আর কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

এই কথা মনে রাখিয়া—সীমার ভিতর অসীম বিচার করিয়া—একবাল আহমদ লিখিয়াছিলেন রক্তারক্তিতে ফলও একটা পাওয়া গিয়াছিল। অথচ এডোয়ার্ড সায়িদ এক আঁচড়ে সবই নাকচ করিয়া দিলেন। বলিলেন, আদমবোমায় কাজ হইবে না। উত্তম।

আদমবোমায় কি ফিলিস্তিন সত্য সত্য স্বাধীন হইবে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, হইবে না। প্রাচীন এয়াহুদি জাতির 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' শিমশোন ওরফে স্যামসনও তো আত্মহত্যার সঙ্গে ৩,০০০ প্রাচীন ফিলিস্তিনি স্ত্রী-পুরুষ মারিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মহত্যার ফলে এয়াহুদি জাতি মুক্তি কিন্তু আসে নাই। ফিলিস্তিনিদের আত্মহত্যাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন?

একবাল আহমদ পরামর্শ দিয়াছিলেন মাঝখানের কিছু পথ ও পাথেয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দেখিতে বলিয়াছিলেন নির্বোধ দাসত্ববরণ ও দেশত্যাগের মাঝখানে আর কী কী পথ খোলা আছে দেখিতে হইবে। জাতিসংঘের আটকুঁড়ে প্রস্তাব ও আদমবোমার মধ্যবর্তী উপত্যকায় আর কোন কোন গিরিপথ আছে?

একবাল আহমদের সম্মানে এইটুকু বলিব, তিনি এই পথগুলির সন্ধান না দিলেও সংজ্ঞা দিয়াছেন 'সংগ্রামী অহিংসা' (militant non-violence) নামে। তাঁহার মতে এই চেষ্টাটা কখনো করা হয় নাই। ইহা ১৯৮২ সনের কথা। ততদিনে ফিলিস্তিন মুক্তিসংঘ লেবাননে পরাজয় বরণ করিয়া তিউনিশিয়ায় আশ্রয় লইয়াছে। (আহমদ ২০০৬/ক: ৩৫৫)

১৯৮৭ হইতে ২০০০ পর্যন্ত দুই পর্বে এন্তেফাদা বা সংগ্রামী অহিংসার পথ গ্রহণের পরও ফিলিস্তিনিরা আশার আলো দেখিতেছেন না। অসলো চুক্তির পর যখন দেখা গেল ফিলিস্তিন স্বাধীন হইতেছে না, বরং দুনিয়ার বৃহত্তম কারাগার বনিয়া যাইতেছে ঠিক তখনই দেখা গেল আদমবোমার প্রাদুর্ভাব।

আমাদের সামনে এখন আদমবোমা কথাটি বিরাট এক পাতা জিজ্ঞাসাচিহ্ন আকারে হাজির হইয়াছে। ইহার মধ্যে তুমি না পাইবে গণিবার পথ না দেখিবে ঘৃণার ছায়া। অন্য কিছু যদি দেখিতে চাহ, দেখিবে তোমার দৃষ্টিশক্তিই নষ্ট হইয়াছে। ইহার পর আর কী ঘটিবে? ব্রিটিশ মনীষী হ্যারল্ড পিন্টারের ভাষা ধার করিয়া বলিব:

> ইহার পর আর কিছু ঘটিবে না।
> আব ও হাওয়ার ইহাই আখেরি পূর্বাভাস।
>
> (পিন্টার ২০০৯: ৯৬)

এডোয়ার্ড সায়িদসুদ্ধ অনেকেই ভাবিতেছেন আদমবোমা বুঝি বিশুদ্ধ পদার্থ (signified)। পদার্থ মাত্র হইলে তাহাতে মুক্তি নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আদমবোমা পদার্থ মাত্র নহে, ইহা এক ধরনের পদ (signifier) অর্থাৎ বার্তাও বৈ কি। ইহা ভাষা। তাই ইহা ফিলিস্তিনিদের মাত্র ফিলিস্তিনি করিয়াই রাখিতেছে না, মানুষ করিতেছে।

৪

এই পুস্তিকা লিখিতে কেহ আমাকে বাধ্য করে নাই। অগত্যা লিখিতে বাধ্যই হইয়াছি যখন তখন সকলে আশা করি জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার প্রয়োগ করিবেন। ইহাই প্রার্থনা। কী জিজ্ঞাসা করিবেন? আদমবোমার সহিত অচলিত ভাষার সম্বন্ধ?

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি কেন সম্প্রতি 'অচলিত' ভাষায় লিখিতেছি। উত্তরে বলিয়া থাকি একে তো অচলিত ভাষার আপন নাম সাধু, দুইয়ে আমি লিখিতেছি শুদ্ধ পাঠিকার নামে। পাঠকের ছোট পাঠিকা, যেমন পত্রের ছোটও নিজেকে 'পত্রিকা' বলিয়া আদর করে। এই প্রীতি মনুষ্যজাতির অলঙ্কার।

আমি নিজেও ছোট লেখক। আমার লেখার প্রচার বিশেষ নাই। লিখিয়া থাকি ছোটলোকের দিকেই চোখ রাখিয়া। তাই কেহ আমাকে লেখিকা বলিলেও উষ্ণ হইতে পারিব না। আমার সাধু ভাষাকে যাঁহারা 'অচলিত' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন আমিও তাহাদের চলিত জবানকে বলিতে বাধ্য হইয়াছি 'অসাধু'। কবি জসীমউদ্‌দীন অনুসৃত ভাষাই আমাকে এই অসাধু ভাষা ছাড়িবার সাহস দিয়াছে।

কিন্তু মানুষ মানে শুদ্ধ না বলা নয়, হাঁ বলাও। মনে রাখিতে হইবে আদমবোমা মানে শুদ্ধ আত্মহত্যা নহে, আত্মসৃষ্টিও বটে।

সেই সাহসে বলিব সাধু ভাষাও এক জাতীয় আদমবোমাই।

ইহার পরও বলিব মানুষের প্রীতি, ফরমান ও ভালবাসা কম পাই নাই। মানুষ স্বভাবে দানশীল ও মহানুভব। হয়তো তাঁহাদের মহানুভবতার কারণেই আমার মতন অজ্ঞাত লেখিকার বহিও ছাপাখানায় যায়। ভাষা বদলায়।

....

সলিমুল্লাহ খান
১৪ ফাল্গুন ১৪১৫

পূর্বাভাস

§ ১

স্বাভাবিক জরুরি অবস্থা

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে লিখিত আছে দেশের জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভার সম্মতি না লইয়া এই দেশ কোন যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে না, কিংবা পারিবে না কোন যুদ্ধে শরিক হইতেও।

সংবিধানের ৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদের এই বিধান যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হয় তবে প্রশ্ন করা চলে: যখন একটি জাতীয় সংসদ লোপ পাইয়াছে অথচ আরেকটি সংসদ গঠন করা হয় নাই তখন কী কর্তব্য? ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ৭২ নম্বর অনুচ্ছেদে।

৭২(৪) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে সেই জাতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ এক জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হইয়াছে বলিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে লোপ পাইয়াছে অথচ পরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই তখন) রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন দেশে যুদ্ধাবস্থা দেখা দিয়াছে তখন তিনি লোপ পাওয়া পুরাতন সংসদ ডাকিয়া অধিবেশনে বসাইবেন, আর বসাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। খুবই উত্তম কথা। ইহার নামই সংসদীয় গণতন্ত্র। এই বিধান আদিকাল অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান গ্রহণ করিবার সময় হইতেই জারি রহিয়াছে।

এদিকে ১৯৭৩ সনে গৃহীত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীযোগে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান জারি হইয়াছিল। সেই বিধান অনুসারে তিন যুক্তিতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা চলে। প্রথম যুক্তি যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুক্তি বৈদেশিক আগ্রাসন আর তৃতীয় যুক্তি আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। ইহাতে বোঝা যায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ যুদ্ধ কিংবা বৈদেশিক আগ্রাসনের সহিত সমতুল্য যুক্তি।

সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদের তৃতীয় উপানুচ্ছেদে বলা আছে যুদ্ধ প্রভৃতি অবস্থা সত্য সত্য দেখা দিবার দরকার নাই, দেখা দিবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যাইবে। এই রকম বিধান ভারতের সংবিধানেও একদা সংযুক্ত ছিল। ১৯৭৭ সনে ক্ষমতায় বসার পর জনতা দলের কোয়ালিশন সরকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান রদ করিয়াছেন। শুদ্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা করা যাইবে বলিয়া বিধান হইয়াছে।

মজার বিষয়, কি বাংলাদেশ কি ভারত কোথাও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে হইলে সংসদের অনুমতি লওয়া আবশ্যক মনে করা হয় নাই। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৪১(ক)(২) উপানুচ্ছেদ বলিয়াছে জরুরি অবস্থার ঘোষণা জাতীয় সংসদে পেশ করা হইবে। আর জাতীয় সংসদের সম্মতি না পাইলে ১২০ দিন পর জরুরি অবস্থা অকার্যকর হইয়া যাইবে।

যখন পুরানা সংসদ লোপ পাইয়াছে অথচ নতুন সংসদ গঠিত হয় নাই তখন কী হইবে? এই প্রশ্নে বলা হইয়াছে পুনর্গঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বসিবার ৩০ দিনের মধ্যে অনুমতি না মিলিলে জরুরি অবস্থা রদ বলিয়া গণ্য হইবে। যুদ্ধ ঘোষণার বিধানের সহিত জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধানে হেরফের রহিয়াছে।

ইহার মানে কী? মানে আর কিছুই নহে—আভ্যন্তরীণ গোলযোগের যুক্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে জাতীয় সংসদের সম্মতি লাগে না। লাগিলে যুদ্ধ ঘোষণা পরিস্থিতির মত জাতীয় সংসদ লোপ পাইলেও পুরানা অবলুপ্ত জাতীয় সংসদ ডাকিয়া তাহার সম্মতি লওয়ার বিধান থাকিত।

প্রশ্ন এইখানেই। জরুরি অবস্থা ঘোষণার একটাই পূর্বশর্ত—তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি। ১৯৯১ সনে পাশ করা এক সংশোধনী মোতাবেক এই জাতীয় ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরও সংযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাতেও পরিষ্কার জাতীয় সংসদকে সরাসরি কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। আর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রীর স্থলে কার্যরত যে প্রধান উপদেষ্টা কাজ করিবেন তাঁহার সংযুক্ত স্বাক্ষর দেওয়ার দরকার কিন্তু হইবে না।

২০০৭ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহার কারণ ও প্রক্রিয়া লইয়া ভবিষ্যতে অনেক লেখা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা তাহা লইয়া কোন অনুমানের মধ্যে যাইতে চাহি না।

রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিই একমাত্র যুক্তি। তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জরুরি অবস্থা জারি হইয়াছে। এই পর্যন্তই। তাঁহাকে কেহ বাধ্য করিয়াছেন কিনা তাহা ভবিষ্যতের স্মৃতিচারণ কবিরা লিখিবেন।

আমরা দেখিলাম, রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিই হইতেছে—বলিতেই হয়—আইনের উৎস ও শেষ অবলম্বন, দুইটাই। দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হইয়াছে কিনা তাহা রাষ্ট্রপতিই বলিবেন। হইতে পারে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সত্য সত্যই বিপন্ন। কিন্তু এমনও তো হইতে পারে ইহা সত্য নহে—নিছক একটা ব্যাখ্যামাত্র। ইহা ভাঁওতাবাজিও হইতে পারে। আইনের উৎস ও যুক্তি যখন একটা ব্যাখ্যামাত্রের উপর দাঁড়ায় তখন কী হইবে? তখন আইনের জোরটাও কমিয়া যায়। যাহাকে বলে নৈতিক জোর তাহা দুর্বল হইয়া যায়। সেই অবস্থায় আইনের শাসনও রহিত হইয়া যায়। যাইবেই। যাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া চালান দেওয়া হয় তাহার ভিতরের এই ভাঁওতাই জরুরি অবস্থা।

শুদ্ধ বাংলাদেশে কিংবা ভারতে নহে, সারা দুনিয়ায় এক জাতীয় বিশেষজ্ঞ/ আইনজ্ঞ আছেন যাঁহারা দাবি করেন—'প্রয়োজনই আইনের জননী।' কথাটা একটু পুরাতন ভাষায় বলিলে দাঁড়ায়—'প্রয়োজন কোন আইন মানে না।' প্রয়োজন মানে যদি ধরিয়া লই রাষ্ট্রের প্রয়োজন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় রাষ্ট্র কোন আইন মানিতে বাধ্য নহে, তাহাকে শুদ্ধ মানিতে হইবে প্রয়োজন। প্রয়োজনই কেবল। কেবল পরম।

যে আইন কেবল প্রয়োজনেরই সেবধি তাহা আইন কিনা সেই প্রশ্ন এখানে তুলিতেছি না। শুদ্ধ প্রশ্ন করিতেছি 'প্রয়োজন' জিনিসটা কী? তাহার সংজ্ঞা কে নির্ধারণ করিবে? যদি তাহা শুদ্ধ রাষ্ট্রপতির উপরই ন্যস্ত থাকে তবে কী বলিব? যদি জাতীয় সংসদের হাতে ইহার ভার ন্যস্ত থাকিত তবে না হয় বলিতাম আইন যাঁহারা বানাইতেছেন তাঁহারাই সংজ্ঞা দিতেছেন 'প্রয়োজন' কী বা কী নয়। এই ভার কেবল রাষ্ট্রপতির মাথায় চাপাইয়া আমরা জিনিসটা হালকা করিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু তাহা হালকা হইয়াছে কি?

কোন দেশে কোন এক সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিবার মতন অবস্থা দেখা দিয়াছে কি দেখা দেয় নাই তাহা ঘটনা বা সত্য নহে—এক প্রকার মতামত মাত্র। মতামতমুক্ত বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া কিছু নাই। থাকিলেও তাহা আন্ধার ঘরে কালো বিড়ালের মত মিশিয়া থাকে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরও লোকে বলে আইন পবিত্র, পবিত্র সংবিধান। ভারতে কেহ কেহ সংবিধানকে নবযুগের 'ধর্মশাস্ত্র' বলিয়া সম্মান দেখাইয়া

থাকেন। এই কথা আমি এক বিদেশি বিশেষজ্ঞের বইতেও দেখিলাম। (অস্টিন ২০০৪)

জরুরি অবস্থার বিধান খোদ সংবিধানেই আছে। তবে থাকিলেও তাহা ধর্মসম্মত (legitimate) কিনা তাহা পরীক্ষা করা দরকার।

১

জরুরি অবস্থা কথাটাই ভাষার একপ্রস্ত চমক। অলঙ্কারশাস্ত্রে এই জাতীয় চমকের নাম রূপক বা মেটাফর। ইহার নির্গলিতার্থ হইতেছে আইনের শাসন স্থগিত (বা রদ) হইয়াছে। অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গকেও আইন মানিয়া চলিতে হয় বলিয়া যে ধর্মকথা আমরা শুনি, জরুরি অবস্থা সরকারকে সেই আবশ্যকতার হাত হইতে মুক্তি দেয়।

আমরা অন্তত ১৭ শতক হইতে আমাদের মহাজন মহাদেশ এয়ুরোপ হইতে শুনিয়া আসিতেছি রাষ্ট্র গড়িবার ভিত্তি আইন অর্থাৎ সরকারকেও আইনের অধীনে থাকিতে হইবে—এই ঐকমত্য। এয়ুরোপখণ্ডের মহাপণ্ডিতরা ইহাকেই 'স্বভাবের ধর্ম' (state of nature) বা 'সমাজ চুক্তি' (social contract) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। স্বভাবধর্ম বা সমাজচুক্তি অনুসারে মনুষ্য নিজ স্বার্থেই নিজ স্বভাব ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেয়, তাহার অধীনতা স্বীকার করে। শর্ত একটাই: খোদ রাষ্ট্রও আইনের ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিবে।

আইনের ধর্ম বা স্বভাবধর্ম জিনিসটা কী তাহা লইয়া খোদ ইংরেজভূমির পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। টমাস হব্‌স (Thomas Hobbes) ধরিয়া লইলেন স্বভাবধর্ম মানে সর্বসাধারণ আইন মানিয়া চলিবে বলিয়া অঙ্গীকারপূর্বক সমস্ত ক্ষমতা রাজার হাতে তুলিয়া দিয়াছে, ইহা বৈ নহে। আর জন লক (John Locke) বলিলেন, তাহা নহে, তাহা নহে, সর্বসাধারণ রাজাকে একটা মাত্র শর্তেই মানিবে। খোদ রাজাও আইন অনুসারে চলিবেন।

আঠার শতকের শেষ নাগাদ উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতাকামীগণ লকের ধারণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসি দেশের বিপ্লবীরা আরো এক কাঠি আগুয়ান। বৃত্ত আঁকিবার আগেও যেমন তাহার সকল ব্যাসার্ধ সমান থাকে আইনও তেমন, ঘোষণার আগেও তাহার ভিতরে ন্যায় থাকা চাই। এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন তিনি বিপ্লবী রুসো (J.-J. Rousseau)

নহেন, সংরক্ষণশীল মঁতেস্কু (Baron Montesquieu)। ইহার তাৎপর্য এই যে অন্যায় আইন আইন পদবাচ্য নহে। যে আইন সমাজধর্ম বা সমাজচুক্তির লঙ্ঘন তাহা আইন নহে, শুদ্ধ গায়ের জোর বা ক্ষমতা মাত্র। এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ যে দেশে বাড়িয়া যায় সেই দেশের আইন তাহার বৈধতা বা ধর্মসম্মতি হারায়। সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের মুখামুখি আসিয়া পড়ে।

যাঁহারা জরুরি অবস্থা জারি করেন তাঁহারাও আকারে প্রকারে স্বীকার করিবেন জরুরি অবস্থা মানে 'আইনের অতিক্রম'। কেহ কেহ বলিবেন 'আইনের ব্যভিচার'। তবু প্রশ্ন উঠিবে: জরুরি অবস্থার বিধান কেন সংবিধানে যোজিত হইয়াছে?

সংবিধানে থাকুক বা না থাকুক, দুনিয়ার সকল দেশে সকল কালে জরুরি অবস্থা মধ্যে মধ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে। জর্জিও আগামবেন (Giorgio Agamben) নামের জনৈক এয়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন গত দুইশ বৎসরে নতুন একটা দৃশ্যও দেখা দিয়াছে। যে জরুরি অবস্থার বিধানকে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে একদা মানিয়া লইতে হইয়াছিল তাহাই এখন ক্রমশ স্বাভাবিক ব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছে। বিশেষ ১৯৩০ সালের দশকে এই বিষয়ে জার্মানিতে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল।

এই আলোচনার যাত্রাবিন্দু হিসাবে সকলই মানিয়া লইলেন, জনগণের সম্মতি হইতেছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। আর জরুরি অবস্থা হইতেছে সেই সম্মতির যে ভিত্তি—অর্থাৎ আইনের শাসন—তাহার ব্যভিচার বা অতিক্রম। জরুরি অবস্থাকে আইনের মোড়ক পরাইতে হইলে খোদ আইনকেই দাঁড়াইতে হয় জরুরি অবস্থার উপর। (আগামবেন ২০০৫: ২৯–৩০)

১৯৭৫ সনের জুন মাসে ভারতে যে জরুরি অবস্থা জারি হইয়াছিল তাহার পক্ষে সাফাই গাহিয়া শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি বলিয়াছিলেন জরুরি অবস্থা এক প্রকার তিতা ওষুধের মতন। রোগীর হিত করিবার জন্যই ইহার বিহিত হইয়াছে। গান্ধির এই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সেইবার এক বৎসর সাত মাস জরুরি অবস্থা চলিয়াছিল। তাঁহার হাতে তখন আইনসভাও ছিল। তিতাই হউক আর মিঠাই হউক ওষুধ ও ওষুধই—খাদ্য হইতে পারিবে না, অন্তত চিরকাল পারিবে না। তাহা ইন্দিরা গান্ধিও টের পাইয়াছিলেন। বাংলাদেশও টের পাইয়াছে। তেইশ মাস পাঁচদিন পর এদেশে জরুরি অবস্থার আপাতত অবসান হইয়াছে।

কিন্তু তাহা আবার আসিতেছে কখন তাহা কিভাবে জানা যাইবে?

১৯৩৬ সনে গঠিত ভারতীয় নাগরিক অধিকার সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন জগদ্বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৭ সালে বিলাতের নাগরিক অধিকার সমিতি বরাবর লেখা এক বার্তায় কবি লিখিয়াছিলেন:

> অধিকার এমন এক বস্তু যাহা প্রতিদিন লড়াই করিয়া আদায় করিতে হয়। কারণ যে সরকার সবার তুলনায় বেশি গণতান্ত্রিক কায়দায় নির্বাচিত হইয়াছে সেই সরকারও অত্যাচারী হইয়া উঠিতে চায়, বিশেষ যখন তাহার অধীনস্ত জনসাধারণ নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে উদাসীন থাকে কিংবা ভয়ে কাতর হইয়া চুপচাপ থাকে। (দেখুন, দত্ত ২০০০: ২৮৭)

কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা তো পরাধীন দেশের অভিমানী কবির কথা মাত্র। সত্য কিন্তু শুদ্ধ দেশে বা কালে আটক থাকে না। রবীন্দ্রনাথের তিন বৎসর পর সেকালের নাতিবিখ্যাত এয়াহুদি গোত্রসম্ভূত জার্মান মনীষী বাল্টার বেনিয়ামিনও (Walter Benjamin) একই রকম কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে আত্মঘাতী হইবার কিছু আগে তিনিও লিখিয়াছিলেন: 'নিপীড়িত জনসাধারণের ইতিহাস হইতে আমরা শিখিয়াছি যে আমরা "জরুরি অবস্থা"র ভিতর বাস করিতেছি। ইহা নিয়মের অতিক্রম নহে, নিয়ম মাত্র।' (বেনিয়ামিন ২০০৬/ক: ৩৯২)

২

জরুরি অবস্থা ঘোষণার সহিত জড়িত নাগরিক অধিকার। সেই অবস্থায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২ ইত্যাদি অনুচ্ছেদ স্থগিত অর্থাৎ সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়। ইহার অধিক যাইয়া সকল মৌলিক অধিকার—যাহা সংবিধানের তিন নম্বর অংশে আছে—স্থগিত করার আদেশও রাষ্ট্রপতি জারি করিয়া থাকেন। ইহা ১৪১(খ) অনুচ্ছেদে পাই।

শুদ্ধ তাহাই নহে। ১৪১(গ) অনুচ্ছেদ আরো একটি অধিকার কাড়িয়া লইতেছে। বলা হইতেছে সংবিধানের সেই বিধান (অনুচ্ছেদ ৪৪) যাহা নাগরিকগণকে আদালতের আশ্রয় লইবার অধিকার দিয়াছে তাহাও রাষ্ট্রপতি স্থগিত করিতে পারিবেন। জরুরি অবস্থার থলির বিড়াল ইহা হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জাতির নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক অবস্থা রক্ষা করিবার প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে বিশ্বাস করিব অথচ উচ্চ আদালতকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিব না—জাতীয় সংসদকে তো করিবই না—ইহাই কি জরুরি অবস্থার সারমর্ম নহে?

ভারতের ১৯৫০ সনের সংবিধানেও এই রকম একটি অনুচ্ছেদ—৩৫২(৫)—ছিল। ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা শেষ হইবার পর তাহা পরের সংসদ বাতিল করিয়াছে। ইহার নাম ৪৪ নং সংশোধনী। খোদ ইন্দিরা গান্ধিও এই সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের জমানায় তাহা ঘটিয়াছিল। আরো খুঁটাইয়া দেখিলে দেখিব বিষয়টা নিছক উচ্চ আদালতের ক্ষমতা লইয়া আন্তঃবিভাগীয় বিরোধ মাত্র নহে, বিষয়টা নাগরিক সমাজের অধিকার ও শেষ প্রতিকার লইয়াও বটে।

১৯৭৬ সনের জব্বলপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়াছিলেন তাহাতে একমাত্র দ্বিমত পোষণকারী বিচারক খান্না মহোদয় বলিয়াছিলেন মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করিবার আইন মাত্রই দেশের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু সেই মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সুপ্রিম কোর্ট জাতির সহিত করা বিশ্বাসঘাতকতাকে ধর্মের জোব্বা পরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা আইনসঙ্গতির (legality) সহিত ধর্ম্মসঙ্গতি (legitimacy) ভেদই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে আইনের বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বাহিরে গিয়া কোন নাগরিকের প্রাণ লওয়া যাইবে না বা তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করা যাইবে না। বাংলাদেশের সংবিধানেও হুবহু একই বিধান আছে ৩২ নং অনুচ্ছেদে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সনে অধ্যাদেশ জারি করিয়া বলিলেন এই বিধান স্থগিত থাকিবে। সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন তথাস্তু। ইহার সামনে দাঁড়াইয়া দ্বিমত করিলেন বিচারক খান্না মহোদয়। তিনি বলিলেন যে দেশে প্রাণ ও স্বাধীনতা বিনা বিচারে হরণ করা যায় সেই দেশে আইনের শাসন আছে বলা চলিবে না।

আইনের শাসন না থাকিলে খোদ রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি কোথায়? রাষ্ট্র তখন শুদ্ধ গায়ের জোরের উপর দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় সেই রাষ্ট্রকে জোরে পারলে কেহ উৎখাত করিতেও পারে। তাহাতে অন্যায় হইবে না।

জরুরি অবস্থায় কেন, ভারতে স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিনা বিচারে নাগরিকের প্রাণ লইতে পারে সেনাবাহিনী। নাগরিকের স্বাধীনতাও কাড়িয়া লইতে পারে। ১৯৫৫ সনেই সেই আইন পাশ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার নাম সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৫। ইহা শুদ্ধ রচিয়াই জওহরলাল নেহরু সরকার ক্ষান্তি দেন নাই। ১৯৫১ সনে সৃষ্ট নবম তপশীলে ইহা তুলিয়া রাখাও হইয়াছে। নবম তপশীলে যে সকল আইন জায়গা পায় সেই সকল আইন আদালতের পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার হইতে মুক্ত থাকে।

এই আইন প্রথম পাশ করা হইয়াছিল আসাম ও মনিপুর রাজ্যে প্রয়োগ করিবার জন্য। পরে তাহা উত্তরপূর্ব ভারতের সর্বত্র এবং আরো পরে অন্যান্য রাজ্যে কাজে লাগানো হইয়াছে।

এই আইনের বিধান অনুসারে গুলি করিয়া হত্যা করিবার অধিকার সশস্ত্র বাহিনীর নিম্নস্তরের কয়েক ধাপ বাদ দিয়া সকল কর্মকর্তাকে দেওয়া আছে। ২০০৪ সনেও এই আইনের বলে মনিপুরে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। ১৯৭৫ সনের জরুরি অবস্থা চলার সময় নির্যাতনের ফলে দক্ষিণ ভারতের কেরালায় রাজন নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার কলেজ ছাত্র পুলিশ-হেফাজতে নিহত হয়। তাহা প্রথমে গোপন করিবার চেষ্টা হয়। পরে জানাজানি হইলে যে কেলেঙ্কারি ঘটিল তাহার এক পর্যায়ে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত (শ্রীকরুণাকরণ) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থাৎ মনিপুরের জন্য যাহা নিয়ম, কেরালায় তাহা ব্যভিচার গণ্য। (সুব্রহ্মনিয়ম ২০০০: ১৪২–৪৩)

বাংলাদেশের দিকে যদি চোখ রাখিয়া কথা বলি তবে কী দেখি? বাংলাদেশ কি ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালার না মনিপুরের সগোত্রীয়? এই দেশে ১৯৭৪ সন হইতে জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আছে ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালের বেদনা। সর্বশেষ ২০০৭–০৮ সনের ঘটনা বাদ দিয়াও যদি বলেন এখানে নাগরিকের প্রাণ ও স্বাধীনতা কোথায় আছে? ২০০৩ সনে দেলসাফ অপারেশনের পর যৌথ বাহিনী দায়মুক্তি আইন পাশ করা হইয়াছে। তাহার পর গঠিত হইয়াছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন।

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ কি তাহার পরও বহাল আছে?

সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম বলিয়াছেন র‍্যাবের হেফাজতে থাকার সময় নিয়ম করিয়া বন্দিরা তাহাদের সঙ্গীগণ কর্তৃক অপহরণের সম্মুখীন হইতেছে আর ইহার ফলে অনুষ্ঠিত গোলাগুলিতে তাহারা যথাবিহিত নিয়মে মারা পড়িতেছে—এমন কথা দুইচারি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু দিনের পর দিন এই ধরনের কাহিনী মোটেও বিশ্বাস্য থাকিতে পারে না। মাহমুদুল ইসলাম এই ঘটনাধারাকে আইনের শাসনের ভীষণ অতিক্রম ও প্রকাশ্য ব্যভিচার বলিয়া রায় দিয়াছেন। (ইসলাম ২০০৫: ৪৭)

জরুরি অবস্থায় যাঁহাদের প্রবল আপত্তি (এই আপত্তি আমারও) এহেন আইন-বহির্ভূত প্রাণহরণ ও স্বাধীনতা ধর্ষণের বিষয়ে তাঁহারা কী বলিবেন? দেশের জরুরি অবস্থা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আইন-বহির্ভূত প্রাণহরণ কি লোপ

পাইয়াছে? বিনা বিচারে আটক আবদুল লতিফ মির্জাকে ১৯৭৪ হইতে ১৯৭৯ পর্যন্ত কারাগারে বাঁচিতে হইয়াছিল। (৩১ *ডিএলআর* [১৯৭৯]) সেই ঐতিহ্য কি এখনো বজায় থাকিবে? যদি থাকে তবে বাল্টার বেনিয়ামিনের কথায় সারবস্তু আছে—আজিও আছে—মানিতে হইবে: 'নিপীড়িত জনসাধারণের ইতিহাস হইতে আমরা শিখিয়াছি যে আমরা "জরুরি অবস্থা"র ভিতর বাস করিতেছি। ইহা নিয়মের অতিক্রম নহে, নিয়ম মাত্র।'

....

আদমবোমা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

আদমবোমা

§ ২

আদমবোমা: পশ্চিমা সাম্রাজ্যের বর্ণপরিচয়

অস্মদ্দেশে সাধারণ্যে এডোয়ার্ড সায়িদ যতখানি সুপরিচয় লাভ করিয়াছেন—উদাহরণ দিয়া বলিতেছি—তালাল আসাদ মনে হয় ততখানি প্রচারধন্য নহেন। তবে তিনি যে একেবারে ডুমুরের কুসুম তাহাও নহেন। আমাদের এই ব্যাপক বিদ্যাবুদ্ধি ধনদৌলত বিবর্জিত দেশে যাঁহারা দুনিয়াদারির খবর অল্পস্বল্প হইলেও রাখেন তাঁহাদের কাছে তালাল আসাদ নামটা আদৌ আনকোরা নহে। তিনি জন্মসূত্রে খানিকটা আরব। আর লেখাপড়া করিয়াছেন ইংলন্ডে।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে তরুণ তালাল আসাদ সদলবলে *নরবিজ্ঞান ও পররাজ্যাভিযান* (*Anthropology and the Colonial Encounter*) নামধেয় এক চমৎকার বহি প্রকাশ করিয়া ইংরেজভূমি আর ইংরেজি প্রভাবাধীন জগতে ব্যাপক নাম কুড়াইয়াছিলেন। (আসাদ ১৯৯০) আমি অন্তত তাঁহার নাম প্রথম মুখস্থ করিয়াছিলাম। ঐ বইযোগেই। ১৯৮০ দশকের শেষ নাগাদ তালাল আসাদ মার্কিন মুলুকে হিজরত করেন। অদ্যাবধি সেই দেশেই তাঁহার বসবাস। যতদূর জানি নতুন ইয়র্কের একটি মধ্যমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এখনো অধ্যাপনাকর্মে নিয়োজিত আছেন। সেখানেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। ইহা ১৯৮৮ সনের পরের কথা।

ইত্যবসরে তালাল আসাদের আরো দুইখানি প্রবন্ধ সঙ্কলন—একটার নাম *ধর্মের কুলজি* (*Genealogies of Religion*), অন্যটা *দুনিয়াদারির রূপজগৎ* (*Formations of the Secular*)—বাজারে উঠিয়াছে। (আসাদ ১৯৯৩; আসাদ ২০০৩) এইগুলির কোনটাই গড়পড়তা অধ্যাপকের পুঁতিগন্ধমাখা চাকরিচৌকি কিংবা জারিজুরি লেখা নহে। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা

যাইবে তালাল আসাদ এমনকি নোম চমস্কি কিংবা এডোয়ার্ড সায়িদের মতন স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী অর্থাৎ লিবারেলও নহেন। *ধর্মের কুলজি* গ্রন্থের এক প্রবন্ধে তিনি অতি দক্ষতার সহিত সালমান রুশদির *শয়তানি পদাবলি* (*The Satanic Verses*) গ্রন্থের পিছনে ব্রিটিশ লিবারেল মহলের সমর্থন যে বহুল পরিমাণে ছদ্মবেশী এসলামবিরোধী জঙ্গিবাদের আর মধ্যযুগীয় ধর্মযোদ্ধা সুলভ মানসিকতার ফসল ছিল তাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গত বৎসর (মানে ২০০৬ সালে) মার্কিন দেশের কালিফোর্নিয়া রাজ্যের অন্তর্গত আরবিং শহরের এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তালাল আসাদ তিন দিনব্যাপী যে অতিথি বক্তৃতা (ওয়েলেক লাইব্রেরি বক্তৃতা) দিয়াছিলেন তাহা সদ্য এই বৎসর ছাপা হইয়াছে।

এই নিবন্ধে ঐ তিন বক্তৃতার প্রথমটির সমালোচনা করিব বলিয়া মনস্থির করিয়াছি।

১

তালাল আসাদ তাঁহার বক্তৃতামালা শুরু করিয়াছেন ইংরেজি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনা বা দুর্যোগ হইতে। সারা জাহানের মুসলমান জনগণের—বিশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের—কপালে এই ঘটনা আরো বড় দুর্যোগ আকারে হাজির হইয়াছে। এই দুর্যোগকে একদিকে দেখা হইতেছে সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে।

অন্যদিকে ইহার সহিত মুসলমান সমাজ কোন না কোনভাবে—শুদ্ধ ব্যক্তি আকারে নহে, আগাপাস্তলা সমাজ হিসাবেই—জড়িত বলিয়া দোষারোপ করা হইতেছে। অনেকেই বলিয়াছেন সন্ত্রাসবাদ জিনিসটা খোদ এসলাম ধর্মের অন্তরেই প্রোথিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহা এসলামের স্বভাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই অশুদ্ধ এসলাম ধর্মকে শুচিশুদ্ধ করিতে হইবে। এই শুদ্ধি অভিযানের দায়িত্ব—পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে—কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা তাঁহার তাবেদার মিত্রশক্তিপুঞ্জ—দুনিয়ার যে যে এলাকাকে তাঁহারা পয়লা 'মধ্যপ্রাচ্য' নাম দিয়াছেন সেই সেই এলাকায়—কম করিয়া বলিলেও চারিটি যুদ্ধ শুরু করিয়াছেন। একটা আফগানিস্তানে, একটা এরাকে। আর ফিলিস্তিনের গাজা

জেলায় ও লেবাননে একটা করিয়া। বলা হইয়াছে ঐ সকল দেশের জনসাধারণকে রক্ষা করাই এই সকল যুদ্ধের লক্ষ্য। কিন্তু তালাল আসাদ দেখাইতে চাহেন আসল লক্ষ্য তাহা নহে, 'অন্য কিছু'। এই 'অন্য কিছু' অন্য কিছুই নহে, শুদ্ধ এসলাম ধর্মের শুদ্ধি বা সংস্কারকর্ম। এই লক্ষ্যেরও আবার লক্ষ্য আছে। আর তাহা হইতেছে পাশ্চাত্যের মনোমত প্রজাসমাজ ও প্রজারাষ্ট্র গড়িয়া তোলা। ইহার লক্ষ্য অন্য ধরনের—অর্থাৎ অন্য বিশ্বাসের—সমাজ ও মানুষকে আইন করিয়া নিষিদ্ধ করা।

এই ধরনের লক্ষ্য অর্জন করিতে এয়ুরোপ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ভাবের ঘরে কয়েক দফা চুরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তালাল আসাদ তাহার কয়েকটা এক্ষণে পরিষ্কার দেখাইয়া দিতে পারিয়াছেন।

এয়ুরোপ ও মার্কিন দেশ এই সমস্ত যুদ্ধ শুরু করিয়াছে সন্ত্রাসবাদ দমন করিবার অজুহাতে। যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে তবে তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। শুদ্ধ প্রভেদ থাকিলেই চলিবে না, দেখাইতে হইবে তাঁহাদের ঘোষিত যুদ্ধ জিনিসটা ন্যায়সঙ্গত হইলেও হইতে পারে কিন্তু বিরোধীপক্ষের সন্ত্রাসবাদ ন্যায়সঙ্গত নহে। সুতরাং ইহার তাৎপর্য এই যে যুদ্ধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও শক্তির আছে। কিন্তু **সন্ত্রাসের অধিকার** বলিয়া কোন বালাই কাহারও থাকিতে পারে না।

ইহাতে কিন্তু একটা সমস্যা আসিয়া হাজির হয়। যুদ্ধের অধিকার যাঁহারা রাখেন তাঁহাদিগের ঘাড়ে দায় পড়ে যুদ্ধকে যুদ্ধ হিসাবেই পরিচালনা করিবার। তাঁহাদের যুদ্ধ যেন সন্ত্রাসবাদের সমতুল্য বা তাহার চেয়েও মন্দ বস্তু না হইয়া ওঠে ইহা দেখিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হইতেছেটা কি?

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামক মতবাদের প্রধান অভিযোগ, সন্ত্রাসবাদীরা অকারণে—বিনা দোষে বা নির্বিচারে—মানুষ হত্যা করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য নিজেদের রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করা। নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ বা যুদ্ধবন্দি হত্যা—বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎ সমর্থিত আইনের বিধান অনুসারেও—যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এহেন অপরাধ সচরাচর সন্ত্রাসবাদীরাই ঘটাইয়া থাকে। তাই তাহারা নিন্দার্হ। কিন্তু তালাল আসাদ দেখাইতেছেন পাশ্চাত্যের যোদ্ধাবাহিনীও তো একই অপরাধ আকছার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহা সত্য হইলে পরাশক্তিগণের যুক্তির তলায় মৃত্তিকাটা থাকিতেছে কোথায়? তাঁহারা নিন্দার পাত্র হইবেন না কেন?

পাশ্চাত্য জগতের পক্ষ হইতেও বলা হয়: লেবাননে কি গাজায়, এরাকে কি আফগানিস্তানে নিরপরাধ লোক মারা যাইতেছে কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু

না মারিয়া উপায় নাই। 'সাদা-দিল' মানুষের এই অভিযানের লক্ষ্য বৃহত্তর—অসীম স্বাধীনতা আর অপরিসীম ন্যায় (infinite justice)। সেই বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করিতে হইলে 'আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি' (collateral damage) হিসাবে এইটুকুন কসুর তো সহ্য করিতেই হইবে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতেছে: যুদ্ধাপরাধের সহিত আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির প্রভেদটা কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ উকিল ও পণ্ডিতগণ বলিতেছেন: প্রভেদ আছে। তবে তাহা উপায়ে নহে, উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতেছেন নির্বিচার হত্যা শুদ্ধ সন্ত্রাসবাদীরাই করে না, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের কারবারীরাও করিয়া থাকেন। সুতরাং নির্বিচার হত্যা করে বলিয়াই সন্ত্রাসবাদীরা খারাপ—ইহা বলা যাইতেছে না।

তাহা হইলে নির্বিচার হত্যা খারাপ হইল কেন? খারাপ হইবার কারণটা লুকাইয়া আছে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই । পাশ্চাত্য জগৎ যেহেতু পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়ের রাজ্য কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর—অর্থাৎ যেহেতু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভালো—তাই তাঁহারা নির্বিচারে হত্যা করিলেও অন্যায় হইতেছে না। বড় ন্যায় ছোট্ট (ও মাঝারি) ন্যায়কে শুদ্ধ কাছেই টানে না, মাঝে মাঝে দূরেও ঠেলিয়া দেয়।

সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু বড় ন্যায়ের নাগাল পায় নাই, সুতরাং তাহাদের নির্বিচার হত্যা—মায় আত্মহত্যা অবধি—অন্যায়। তালাল আসাদ দেখাইতেছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুক্তি ধোপে টিকিবার যোগ্য নহে। টিকিলে পাশ্চাত্যের যুক্তি পর্যন্ত বর্ণের কলুষে বিবর্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

২

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সন্ত্রাসবাদের সহিত ন্যায়যুদ্ধের পার্থক্য আরো এক জায়গায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নির্বিচার হত্যা করিয়া সন্ত্রাসবাদী তো বিবেকের কামড় অনুভব করে না! অথচ ন্যায়যোদ্ধারা তাহা করেন। ন্যায়যোদ্ধা জানেন নিরীহ লোক হত্যা অন্যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া উপায় থাকে না বলিয়াই তাঁহারা নির্বিচারে লোক মারিতে বাধ্য হন। বাধ্য হইলেও এই বাবদ তাঁহারা সত্যি সত্যি অনুতাপ বোধ করেন। তাঁহারা জানেন যাহা করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন, তাহা অন্যায়কর্ম। এহেন কর্ম শুদ্ধ অনন্যোপায় অবস্থায় করা যায়।

তালাল আসাদ প্রশ্ন উঠাইয়াছেন, অনন্যোপায় যে হইলাম তাহা নির্ণয় করিবে কে? উপায়ের তো কখনো শেষ নাই। কোন উপায় শেষ উপায় তাহাই বা কে বলিবে? পররাজ্য দখল করিতে গিয়া যদি দেখি পানিতে বিষ মিশাইয়া দিলে সহজেই শত্রু সংহার করা যাইবে, নইলে পররাজ্যটি দখল করার কোন উপায় থাকিতেছে না—তখন আমি তো অনন্যোপায় হইলাম। অতয়েব মাখো বিষ। পাশ্চাত্য ন্যায়ের যুক্তিতে দেখা যায় ইহাও সিদ্ধ।

তালাল আসাদ বলিতেছেন, যাহাদিগকে সন্ত্রাসবাদী বলা হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগও তো ইহাই। তাহারা নিরস্ত্রদের আক্রমণ করে যাহাতে অস্ত্রধারী কর্তৃপক্ষও চাপে পড়িয়া নতি স্বীকার করেন। আর ন্যায়যোদ্ধারাও যদি একই কাজ করেন তো প্রভেদটা থাকিতেছে কই!

সন্ত্রাসবাদীরাও বলে, অন্য উপায় থাকিলে তাহারা সন্ত্রাস করিত না। তাহাদের এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায় জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তে। নিরুপায় কিংবা অনন্যোপায় হইলে প্রত্যেক সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই 'পরমাণু বোমা' ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এই কথা ঐ আদালতের সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। তাহা উল্লেখ করিয়া তালাল আসাদ বলিতেছেন: ইহা কি মনুষ্যজাতির আত্মহত্যার অধিকার স্বীকার করিবার সমতুল্য যুক্তি নহে? পরমাণু বোমার আবিষ্কার ও ব্যবহার মনুষ্যজাতির সম্মিলিত আত্মহত্যার পক্ষে যাত্রা বৈ কি!

আর একটা যুক্তিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আদালত কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে (যাহা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিতে রাজি হয় নাই। ভারত, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি বহুজাতিক রাষ্ট্রের দাবি ছিল যেসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলন করিতেছে—অন্য ভাষায় বলিতে সন্ত্রাসকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করিতেছে—তাহাদিগকে বলা হউক এই ধরনের সন্ত্রাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই আবদার এখনো আইনের মর্যাদা পায় নাই। কারণ তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দাবি করিতেছে তাহারাও তো যুদ্ধই করিতেছে। আমরা তো দেখিলামই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ন্যায়যোদ্ধারাও অনেক সময় একই রকম সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় লইয়া থাকেন। নির্বিচারে বেসামরিক নাগরিক হত্যা করিবার পক্ষে তাঁহারা যুক্তি দেখান—এহেন হত্যা না করিলে আরো মূল্যবান, আরো অধিক প্রাণ নষ্ট হইত।

তাহা হইলে মানিতে হয় যে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন।

৩

তালাল আসাদের আরো একটা যুক্তি যুতসই হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন সন্ত্রাসবাদের কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সভ্যতার সাপ বাহির হইয়া আসিতেছে। ২০০১ সালের অনেক আগে হইতেই আধা ইংরেজ আধা মার্কিন প্রাচ্য বিশারদ বার্নার্ড লুইস প্রমুখ পণ্ডিত 'সভ্যতার সহিত সভ্যতার সংঘাত' প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছিলেন। স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের মতন জনপ্রিয় লেখক আর সামুয়েল হান্টিংটন প্রমুখ প্রচারক তাহাই বাজারে ছাড়িয়া জোর লাভবান হইয়াছেন। আসাদ দেখাইতেছেন: 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' মানে 'সভ্যতার সহিত সভ্যতার সংঘাত' নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অসভ্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ মাত্র। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক যুদ্ধেও এমন যুক্তিই দেখানো হইত।

এসলাম ধর্মের অন্তরে সন্ত্রাসবাদ জন্মসূত্রে গৃহীত বলিয়া যাহা প্রচারিত হইতেছে তাহার অর্থ এই যে এসলাম ধর্মের অন্তর্গত বিষাদই সভ্যতার পরিপন্থী। সুতরাং নিজের আমূল সংস্কার না করিলে সভ্যজগতে কাহারও জায়গা নাই। পাশ্চাত্যের এই নগ্ন প্রচারের অতি উৎসাহে আর আতিশয্যে আরো ভয়ানক প্রমাদ আছে। তালাল আসাদ প্রমাণ করিয়াছেন আত্মঘাতী বোমা বা আদমবোমা এসলাম ধর্মের অন্তরে প্রোথিত চিরস্থায়ী সত্য নহে অর্থাৎ ইহাকে ইমানের সহিত সমান মর্যাদা দেওয়া যাইবে না।

এই বোমাবাজি শুদ্ধ ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ের বা পরাধীন মুসলমান সমাজের পরাধীনতার প্রকাশ মাত্র। পরাধীনতা দূর হইলে আদমবোমা জিনিসও ফরাসি কিংবা মার্কিন দেশে বীমা করিয়া জাদু প্রদর্শনীতে পাঠানো সম্ভব হইবে।

রবার্ট পাপ (Robert Pape) নামক জনৈক পশ্চিমা রাষ্ট্রপণ্ডিত গুনিয়া দেখাইয়াছেন ২০০১ সালের আগের ২২ বছরের মধ্যে—অর্থাৎ ১৯৮০ হইতে ২০০১ সালের ভিতর—তামাম দুনিয়ায় ১৮৮টির মতন সাধারণ আদম ওরফে আত্মঘাতী বোমা ফাটিয়াছে। নানান দেশের রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীঘটিত আত্মঘাতী বোমার হিসাবটা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। পাপ সাহেব দেখাইতেছেন দ্বাবিংশ বৎসর পূর্বে গোনা এই ১৮৮টি আদমবোমার মধ্যে গোটা ৭৫ ফাটাইয়াছে শ্রীলঙ্কার 'তামিল ব্যাঘ্রকুল' ওরফে 'তামিল টাইগার্স' দল। ইহারা জাতে তামিল, তালে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আর ধর্মে হিন্দু বলিয়া প্রকাশ। (আসাদ ২০০৭: ৫৪) ইহাতেই প্রমাণ এই বিষয়ে এসলাম ধর্মের কোন একচেটিয়া অধিকার নাই। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এই সত্য হজম করিবেন কী করিয়া?

তালাল আসাদ প্রমাণ করিয়াছেন, আদমবোমা শুদ্ধ মুসলমানরাই ফাটায় না, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ফাটাইতে পারে। আর এসলাম ধর্মও এমন কথা বলে নাই যে সকল যুগে সকল দেশে এই জাতীয় বোমা বানাইতে কিংবা ফাটাইতে হইবেই। না বানাইলে বা না ফাটাইলে ধর্মই থাকিবে না এমন কথা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গও নয়। তবুও আজকাল এই এসলামবিরোধী প্রচারযুদ্ধ জোরদার হইতেছে। কিন্তু কেন? তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে ইতিহাসে।

তালাল আসাদ মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে যে অসম যুদ্ধ চলিতেছে কলাকৌশলে তাহা নবীন হইলেও চরিত্রে আগেকার যুগের ঔপনিবেশিক বা পররাজ্যলোভী দখলদারী যুদ্ধেরই হুবহু নতুন সংস্করণ। যদি তাহাই হয় তবে পশ্চিমের যুদ্ধ 'সভ্যতার সহিত সভ্যতার যুদ্ধ' নয়—অসভ্যতার সহিত সভ্যতার যুদ্ধ মাত্র। ইহারই অপর নাম বর্ণবাদ।

তালাল আসাদ রচিত *আদমবোমা* পড়িলে সেই বর্ণপরিচয় গাঢ় হয়। তালাল দেখাইতেছেন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বর্ণবাদী বলিয়াই তাঁহারা পশ্চিমের সাথে যুদ্ধে পরাজিত সকল অপশ্চিমা জাতিকে 'অসভ্য' বা জংলি বলিয়া গালি দেন। তাঁহারা বলেন, অসভ্য জাতির যোদ্ধারা নিঠুর, দয়া-মায়া কথাটা উহাদের অভিধানে নাই। তাই তাহাদের প্রতি দয়া দেখাইবার প্রশ্নই ওঠে না। আসাদ বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যাধিপতিরা যেভাবে নানান যুদ্ধাপরাধকে—যেমন নির্বিচার হত্যা, বন্দি নির্যাতন এমনকি অসামরিক গণহত্যাকেও—মানবদরদী কর্মের উদাহরণ বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন তাহার তুল্য কোন যুক্তি তথাকথিত অসভ্য জাতিগোষ্ঠী কোনদিনও দেখাইতে পারে নাই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ যে কতখানি সভ্য হইয়াছে ইহাতে তাহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

৪

তাই তালাল আসাদ বলিতেছেন আসল প্রশ্ন অন্য জায়গায়। মানুষ আত্মহত্যার মতন ন্যক্কারজনক কাজ করে কেন? আসল প্রশ্ন ইহা নহে। আত্মহত্যার দৃশ্য দেখিয়া জ্যান্ত মানুষজন কী বলে, কী করে তাহাই আসল কথা।

ফিলিস্তিনের আত্মঘাতী বোমা পশ্চিমে যত আলোড়ন তোলে শ্রীলঙ্কার বোমা তত তোলে না কেন? আপন ও পর এখানে সবল হইয়া আসে। তাহা ছাড়াও কথা আছে। খ্রিস্টধর্মের তত্ত্ব সন্ধান করিয়া আসাদ দেখাইয়াছেন: আত্মত্যাগ, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ধর্মবোধ মধ্যযুগের উত্তরাধিকার হিসাবেই এই যুগের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে।

তালাল আসাদ বলিতে চাহেন বর্তমান দুনিয়ার সংঘর্ষ আদপেই সভ্যতার সহিত সভ্যতার সংঘাত নহে। কারণ পরস্পরের প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ কোন সভ্যতাই নাই। সংঘাত কিছু যদি থাকিয়া থাকে তাহা প্রতিটি সভ্যতার ভিতরেই আছে। মুসলমান সমাজও এই সংঘাতমুক্ত নহে। এই সমাজেও আসাদ বলিতেছেন—আধুনিক 'লিবারেল' বনাম অন্ধবিশ্বাসীর সংঘাত আছে। তিনি না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারি শাসক ও পীড়িতের সংঘর্ষ হইতে মুসলমান সমাজও নিস্তার পায় নাই।

তবে তালালের জোরটা পড়িয়াছে খোদ আধুনিক সভ্যতার ঝাণ্ডাধারীর উপর। তাঁহার বিচারে আধুনিক সভ্যতাও তথাকথিত 'সভ্যতা ও অসভ্যতার সংঘাত' হইতে মুক্ত হয় নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার, তাহার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার গোড়ায় ছিল তথাকথিত অসভ্য জাতির উচ্ছেদ অথবা পরাধীনাবস্থা। এই কথা একদা বলিয়াছিলেন জার্মান মনীষী ম্যাক্স বেহ্‌বার (Max Weber)। তালাল আসাদ তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন।

আজ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার গোড়ায় হাত পড়িয়াছে। আজ সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'দেশপ্রেমিক আইন' পাশ হইয়াছে। অনেকেই মনে করেন ইহা সেই দেশের নাগরিক স্বাধীনতায় কিঞ্চিত বিয়োগ কিংবা ভাগ বসাইয়াছে। আসাদও মনে করেন, পশ্চিমের সমাজ যে অসুখে পড়িয়াছে ইহা তাহার সামান্য লক্ষণ বৈ নহে। আপন অন্দরের এই সংঘর্ষকে পশ্চিমা সমাজের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণ 'সভ্যতার সহিত সভ্যতার সংঘাত' (clash of civilizations) নাম দিয়াছেন। আজ তাঁহাদের সভ্যতা-বাণিজ্যও সমর বিশেষে পরিণত হইয়াছে। সঙ্কটের নিদান পাইবেন মনে করিয়া অদূরদর্শী নেতারা কাল্পনিক এসলামের বিরুদ্ধে অন্তহীন ক্রুসেড পরিচালনা করিতেছেন।

তাই আমরাও ভালোবাসিয়া বলিতে পারি অতীতের ক্রুসেড যেমন হয় নাই এই ক্রুসেডও তেমন সফল হইবে না। তাহার আগেই সভ্যতার হৃদয় বিদারক কাণ্ড ঘটিবে। ঘটিবেই ঘটিবে। কারণ আজ পর্যন্ত যত মানব সমাজ দেখা গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস বৈ নহে।

....

মাসিক আল-আশরাফ, ডিসেম্বর ২০০৭

§ ৩

আদমবোমাঃ আত্মহত্যা না সত্যাগ্রহ

আদমবোমা নামক পুস্তিকায় তালাল আসাদ তিনটা প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাবে তিনি দেখাইয়াছেন পশ্চিমা সাম্রাজ্যশাসকরা যে জিনিসকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলিয়া গালি দিতেছেন তাহার সহিত যে বস্তুকে তাঁহারা 'যুদ্ধ' বলিয়া সালাম করেন তাহার ভেদ বিশেষ নাই। সাম্রাজ্যশাসকদের বিচারে আইনসম্মত হত্যাকাণ্ডকে যুদ্ধ বলা যায় আর আইন-বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদিরই অপর নাম সন্ত্রাসবাদ। পার্থক্যটা হত্যা আর অহত্যায় নয়। বরং হত্যা ও হত্যায়। এক হত্যার উদ্দেশ্য—তাঁহারা বলেন—জীবনদান। অন্য হত্যার উদ্দেশ্য নিছক অর্থাৎ শুদ্ধ জীবননাশ।

কিন্তু—তালাল আসাদ দেখাইতেছেন—জীবন বা সভ্যতার সুন্দর প্রহরা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাঁহারা যুদ্ধঘোষণা করেন তাঁহারা তো তাঁহাদেরই পূর্বঘোষিত যুদ্ধের আইন—যেমন 'জেনেভা কনভেনশন'—মানিয়া চলেন না। বলপ্রয়োগের যে সীমা আইনে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে—যেমন যুদ্ধবন্দিকে নির্যাতন করা চলিবে না—তাহা মানিয়া চলেন না ইঁহারা। প্রমাণ গুয়ানতানামো উপসাগরের মার্কিন বন্দিশিবির। প্রমাণ এরাক, প্রমাণ আফগানিস্তান, প্রমাণ ভিয়েতনাম, প্রমাণ আলজিরিয়া। তাহা হইলে 'মানবাধিকার আইন' কথাটা তো একটা কথার কথা বৈ নহে!

অথচ এই শক্তিমন্ত দেশের নায়ক ও সেনানায়কগণই সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু কোন মুখে? তাঁহারা বন্দিজনের পায়ুপথে বিদ্যুৎবায়ু প্রবেশ করাইয়াও শান্তি পাইতেছেন না। বলিতেছেন সন্ত্রাসবাদ সভ্যতার অথবা মানবাধিকারের দুশমন। তালাল আসাদ চোখে আঙ্গুল ঢুকাইয়া কহিতেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমা সভ্যতার যুক্তি হইল সন্ত্রাসবাদ যাহারা আঁকড়াইয়া

আছে তাঁহারা সভ্যতার বাহিরে বাস করিতেছে। কাজেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় সভ্যতার আইন-কানুন—যেমন মানবাধিকার আইন—প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

১৯২৭ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর কাপ্তেন এলব্রিজ কোলবি (Elbridge Colby) এক প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন—আসাদের মতে—তাহা আজও পাশ্চাত্য শাসক শ্রেণীসমূহের প্রকৃষ্ট আদর্শ আকারে জিয়াইয়া আছে। কোলবির কথায়:

> বন্যজাতি যুদ্ধের মূলকৌশল হিসাবে শুদ্ধ ধ্বংসসাধন ও বিলুপ্তির পথই গ্রহণ করে—ঘটনার সারকথা ইহাই। যাহারা এ রকম নির্দয় পদ্ধতি বাছিয়া লয় তাহাদিগের মোকাবেলায় আমাদিগেরও নির্দয়ার পথই লইতে হইবে। অতিশয় মানবাধিকার মানবাধিকার করিয়া এই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো ঠিক হইবে না। কারণ সেনাপতি হিসাবে শত্রুকে বেশি দয়া দেখাইতে গিয়া আপনি তো আপন জাতির প্রতি নির্দয়া প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। (আসাদ ২০০৭: ৩৪-৩৫)

পাশ্চাত্য শাসকশ্রেণীর নেতারা 'মানবাধিকার আইন' লঙ্ঘনের অভিযোগে অসভ্য (বা বন্য ও বর্বর) জাতির নিন্দা করেন। অদ্য তাঁহারা সভ্যজাতির দুশমন বলিয়া যাহাদের চিহ্ন দিতেছেন তাহারাই হইয়াছে 'সন্ত্রাসবাদী'। ইহাদেরও প্রধান দোষ ইহারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করিয়া নিরীহ মানুষ হত্যা করিতেছে। সুতরাং ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানবাধিকার আইন মানিয়া চলিবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিতে পারে কি? মানবাধিকার রক্ষা করিবার স্বার্থে মানবাধিকার ভঙ্গ করা কোন অপরাধই নয়—পাশ্চাত্য যুক্তির নিহিতার্থ যদি ইহাই হয় তাহা হইলে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরাও যে একই যুক্তির আশ্রয় লইবে তাহাতে আপনার বিস্ময় কেন?

এই প্রশ্ন সম্বল করিয়া তালাল আসাদ দ্বিতীয় প্রস্তাব সায়ের করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে তাঁহার বিচারের বিষয় তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রধান ঘটনা—খোদ 'আদমবোমা'। কেহ কেহ ইহার নাম রাখিয়াছেন শহিদী (martyrdom) বোমা। (আসাদ ২০০৭: ৪৩)

১

আত্মঘাতী অথবা আদমবোমা বা শহিদী বোমার প্রকোপ দুনিয়ার নানান দেশে, নানান সময়ে দেখা গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত ধুরন্ধর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই বোমা আবিষ্কারের কৃতিত্ব ফিলিস্তিনি

মুক্তিযোদ্ধাদের দান করিতেই গ্রীবা উঁচু করিয়া আছেন। ১৯৮৭ সালের পর ফিলিস্তিনের পামর জনসাধারণ এক প্রকার 'ঢেলাযুদ্ধ' শুরু করিয়াছিল। এই ঢেলার অনুবাদ আমরা একদা করিয়াছিলাম 'কঙ্কর' শব্দ দিয়া। (খান ২০০৮/গ: ৭১; দেখুন, প্রবন্ধ ১৩) আরবি জবানে এই যুদ্ধ 'এন্তেফাদা' বা গণজাগরণ অভিধা অর্জন করিয়াছিল। ইহার ফলাফল কী হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন।

দোসরা এন্তেফাদা শুরু হইয়াছে ২০০০ সালের অক্টোবর মাস হইতে। প্রাচীন জেরুজালেম শহরের বনিয়াদি আল আকসা মসজিদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার অভিলাষ চরিতার্থ করিতে ঐ মাসের একদিন এসরায়েল রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আরিয়েল শ্যারন (Ariel Sharon) উস্কানিযোগে পবিত্র মসজিদে ঢুকিয়া পড়িলেন। ফিলিস্তিন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতর শরিক হামাস দল সেই উস্কানির স্পর্ধা আপনকার কাঁধে তুলিয়া লইল। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি এই দলের প্রথম 'শহিদ' বোমাভিযান শুরু হইল।

ইহার পর অন্যান্য দুনিয়াবি রাষ্ট্রনৈতিক দল এমনকি নির্দলীয় পামর পর্যন্ত বুকে-পিঠে বোমা বাঁধিয়া এসরায়েল সীমান্তের চৌকি পার হইল। মনে রাখিতে হইবে 'এসলামি জেহাদ' নামা দলের স্থপতি ফতি শিকাকি (Fathi Shikaki) ১৯৮০ সালের কয়েক বৎসর পর এসরায়েলের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করিয়াছিলেন। পরাজয়ে না ডরাইয়া বীরেরা এখন বুকে বোমা বাঁধিয়া মরিতেছে আর এসরায়েলি নাগরিক-অনাগরিক যাহাকে সম্ভব মারিতেছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আকাশযোগে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে আদমবোমা ফাটিবার পর দুনিয়া জুড়িয়া নতুন হৈ চৈ উঠিয়াছে। উদাহরণ দিয়া বলিব মার্কিন দার্শনিক রিচার্ড রোর্টি (Richard Rorty) রটাইয়াছেন পাশ্চাত্য জগতের কোথাও যদি সন্ত্রাসবাদীরা সেই রকম বড় হামলা আরো একবার করিতে পারে তো পশ্চিমে এতদিন 'গণতন্ত্র' বলিয়া যে সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহা শেষ হইয়া যাইবে। ইহার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে পামর সাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কিছু পরিমাণ সঙ্কোচনের শিকার হইয়াছে—সেই দেশে তথাকথিত 'দেশপ্রেম আইন' (Patriot Act) পাশ হইয়াছে। ইহাই প্রমাণ।

রিচার্ড রোর্টির উদ্বেগ শুদ্ধ তাঁহার একার হইলে কথা চলিত না। চলিতেছে কারণ ২০০১ সালের অনেক আগে হইতেই বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও প্রচারক মহল হইতে বলা হইতেছে 'সভ্যতার সংঘাত' বা সভ্যতায় সভ্যতায় যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে। তালাল আসাদ তদীয় *আদমবোমা* বইয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতায় আমাদের দর্শন করাইয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচারকগণের বক্তব্য: পাশ্চাত্য

সভ্যতার সহিত যাহারা কড়িবর্গাসুদ্ধ এক হইয়া মিশিতেছে না তাহারা সভ্য হইয়া সারে নাই। উনিশ শতকের পররাজ্যাভিলাষী (colonial) যুদ্ধের আদলে পাশ্চাত্য সভ্যতা নতুন যুদ্ধ শুরু করিয়াছে। এই যুদ্ধের মূল নৈতিক ভিত্তিও সেই পুরানা অজুহাতই: 'সভ্যতা বিস্তারের স্বার্থে অসভ্যকে ধ্বংস করিতে হইবে।' 'পশ্চিমা সাম্রাজ্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে তাহার কিছু বয়ান পেশ করা হইয়াছে। (দেখুন, প্রবন্ধ ২)

সকলেই বলিতেছেন আত্মঘাতী ওরফে আদমবোমা জিনিসটা সত্যই বড় ভয়াবহ জিনিস। তালাল আসাদ সওয়াল করিলেন: কেন? কথাটার মধ্যে দুই সত্য লুকাইয়া আছে। এক নম্বরে, অনেকেই পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের সুরে সুর মিলাইয়া বলিবেন, আদমবোমারুরা কেবল নিরীহ, বেসরকারি, বেসামরিক লোক ধরিয়া মারিতেছে। ইহাই ভয়াবহতার গূঢ় কারণ। নিরীহ লোক হত্যা শুদ্ধ আত্মঘাতী বোমারুরাই করিতেছে—ইহা কিন্তু সত্য নহে। এই কাজ অনেক দেশের সেনাবাহিনীও করিয়া থাকে। মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিতে এই ঘটনা দেদার ঘটিয়াছে। জাপানের কথা না হয় না-ই বলিলাম।

তাহা হইলে আত্মঘাতী অভিযান জিনিসটার বিশেষ গুণ কোনখানে? আখ্যান অনুসারে বলি তো বলিতে হয়, যে অভিযানে শত্রুপক্ষের লোক—নিরীহ দোষী নির্বিচারে—হত্যার নিমিত্ত আমি নিজেকে পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিতে রাজি তাহাই আত্মঘাতী অভিযান বা 'সুইসাইড অপারেশন'। অতয়েব আসল কথা আত্মহত্যা, নিরীহ-হত্যা নহে।

কিন্তু ইহাতেও সমস্যা দেখিতেছি। দেশের মুক্তির জন্য, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কত বীরই না আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ইতিহাসে তাহার কতক কাহিনী লেখা হইয়াছে, কতক লেখাও হয় নাই। আমাদের দেশের ইতিহাসেও শ্রেষ্ঠ আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকগণকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' অভিধা দেওয়া হইয়াছে। কই আমরা তো ইঁহাদের কখনো ভয়াবহ বলি নাই। বলিয়াছি কি? আর ব্যক্তিগত বা মনোগত গভীর অসুখের কারণে কত মানুষই না আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আমরা তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, কেহ বা গালিও দিয়া থাকি কিন্তু ভয়াবহ তো বলি না।

ধর্মীয় ধারায় 'আত্মহত্যা মহাপাপ' বলা হয় বটে তবে আমাদের দেশে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত দণ্ডবিধি অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে শুদ্ধ এক বৎসরের কারাভোগ করিবার বিধান রহিয়াছে (১৮৬০ সনের ভারতীয় দণ্ডবিধি, ৩০৯ ধারা) অথচ অন্য প্রকার হত্যার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে দণ্ড কম করিয়া হইলেও ১৪ বৎসর। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে

ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রস্তাবিত প্রথম দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যায় সহায়তাকরীর দণ্ড কঠোরতর ছিল।[১]

আঠার শতকের ইতালীয় মনীষী সেসার বেকারিয়া (Cesare Beccaria) বলিয়াছেন, যাহারা পরিণত বয়সে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যায় তাহাদের পাপের তুলনায় আত্মহত্যা তো কোন পাপই নহে। কারণ— বেকারিয়ার ধারণা—হিজরতকারী সঙ্গে টাকাপয়সা, ধনদৌলত লইয়া গেল আর তাহার নতুন দেশ যদি পুরানা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তো প্রকারান্তরে সে শত্রুদেশের সহায়তাই করিল। অথচ আত্মঘাতী শুদ্ধ নিজের কায়াটা ছাড়া কিছুই লইয়া যাইবে না।[২]

কাজেই দেখা যাইতেছে, আত্মঘাতী বোমার ভয়াবহতা ঠিক আত্মঘাতেই নিহিত নাই। আর—আগেই তো দেখিলাম—ইহার কারণ নিরীহের হত্যায়ও নিহিত নহে। তাহা হইলে এই ভয়াবহতার কারণ কোথায়? অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

আত্মঘাতী বোমা ফাটিবার পর যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়, যে প্রাণহানি ঘটে তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞরা বিশেষ সময় ব্যয় করিবেন না। তাঁহারা শুদ্ধ জানিতে উৎসুক যে বা যাহারা বোমা ফাটাইল তাহার বা তাহাদিগের ব্রত বা মতলব (motive) কী? সকলেই জিজ্ঞাসা করেন: সে কেন এই কাজ করিল?

প্রশ্ন হইতেছে আত্মহত্যা—বিশেষ সফল আত্মহত্যা—শাস্তিযোগ্য অপরাধ নহে কেন? আপনি তাহাকে কোথায় পাইবেন? অতয়েব প্রমাণ করা চাই: 'আত্মহত্যা যে করিয়াছে আত্মহত্যা সে করে নাই,' কেহ না কেহ তাহাকে দিয়া করাইয়াছে। অতয়েব তাহাদিগকে ধর, মার, কাট, পোড়াও। ইহাই বিশেষ এসরায়েল রাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চিন্তাধারা।

আসল প্রশ্নের উত্তর ইহাতে মিলিল না কিন্তু। আত্মঘাতী অভিযানে যাইবার ইচ্ছা যাহার যাহার মনে জাগিয়াছে তাহার তাহার মনে তাহা কখন ও কিভাবে জাগিল? এই প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই পাওয়া যাইবে না—এমন কথা তালাল আসাদ বলেন নাই। তিনি মাত্র বলিতেছেন, উত্তর পাওয়াটা সহজকর্ম নহে। এই জায়গায় দুই ঘটনার স্রোতরেখা একটা ধারায় আসিয়া মিশিয়াছে। তাই কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন: 'লোকটি কি মারিবার জন্য মরিয়াছে নাকি মরিবার জন্য মারিয়াছে?'

জঁ বেশলে (Jean Baechler) নামক জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বুফে (Buffet) নামক একজন আততায়ীর উদাহরণযোগে বলিয়াছেন, কেহ কেহ মরিবার পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অন্য লোক ধরিয়া, মানে পর ধরিয়া মারে। বুফে তাঁহার

শেষ অভিলাষ হিসাবে ফরাসি রাষ্ট্রপতি সমীপে আর্জি পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দাবি করিয়াছিলেন তাঁহাকে গিয়োতিন (Guillotine) নামক তলোয়ারের নিচে মরিবার সুযোগ দেওয়া হউক। তিনি বলিতেন, 'আমি আত্মহত্যার সুযোগ চাহিব বলিয়া পরহত্যা করিয়া থাকি। ইহাই আমার নীতিধর্ম।'[৩] মরিবার ফন্দিস্বরূপ মারিবার চমৎকার দৃষ্টান্ত ইহা। (আসাদ ২০০৭: ৪০)

মঁসিয় বেশলে আবার অন্য দৃষ্টান্ত পেশ করিতেও পিছ-পা হয়েন নাই। দুই নম্বর মহাযুদ্ধের জমানায় জাপানের কামিকাজি (*Kamikaji*) বা আত্মঘাতী বৈমানিকগণ ইহার উল্টা করিয়াছিল। তাহারা মরিয়াছিল মারিবার জন্যই। জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ইজ্জত তাহাদের কাছে নশ্বর জীবনের তুলনায় ঈশ্বরস্বরূপ বা অবিনশ্বর। আর বুফের মতন জাত অপরাধীরা দুই পয়সার বিষ না কিনিয়া খামোখা লোকক্ষয় করিয়াছে। প্রভেদ এই নয় কি?

এখানেও আমাদের উত্তর মিলিল না। শুদ্ধ জানিতে পারিলাম আত্মহত্যাকারীর উদ্দেশ্য নিজেকে শেষ করা। আর আত্মঘাতী বোমারুর **উদ্দেশ্য** অন্যকে শেষ করা—নিজেকে শেষ করা তাহার **উপায়** মাত্র।

প্রশ্ন থাকিল: অন্যকে শেষ করিবার ব্রত কেন লইল সে? অন্যকে শেষ করিবার অন্য উপায় থাকিবার পরও যদি সে সেই পথ ধরিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে সে সত্যি সত্যি কোন মতাদর্শের—যেমন ধর্মীয় জবানধারার—বন্দি হইয়াছে।

তালাল আসাদ কহিতেছেন বিশেষজ্ঞরা ইহাই প্রমাণ করিতে তৎপর কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিপ্রমাণ ও সাক্ষ্যসাবুদ দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা আসলে কিছু একটা লুকাইতে চাহিতেছেন। আত্মঘাতী বোমার জন্ম মানুষের আত্মহত্যা প্রবণতায় হয় নাই। পরহত্যালিপ্সাও এই বোমার জননী নহে। এসলাম ধর্মের মূলসূত্র ধরিয়া যতই টানাটানি করেন না কেন ইহার 'মুদা' পাইবেন না। জীবনের সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এসলাম মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া যে প্রচার বহাল তাহা—তালাল আসাদ দাবি করিতেছেন—মোটেও সত্য নহে।

তাহা হইলে—সিদ্ধান্ত হইতেছে—আদমবোমার জন্ম খোদ ইতিহাসেরই গর্ভাশয়ে। আত্মঘাতী বোমা অসহায়ের শেষ সহায়, ভাষাহীনের শেষ ভাষা মাত্র। এসলামের হৃদপিণ্ডে বোমা নাই—বোমা বাঁধা নিছক ইতিহাসের কোমরবন্ধে।

২

আত্মঘাতী বোমার প্রকৃত ঠিকানা ইতিহাস। কিন্তু না বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা, না চোরা শোনে ইতিহাসের কাহিনী। যেমন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইয়ন এলস্টার (Jon Elster) প্রচার করিতেছেন—আত্মঘাতী বোমা মারা সাময়িক উত্তেজনার কাজ।

তিনি কী করিয়া জানিলেন এই সত্য? তিনি আরেকজন বিশেষজ্ঞের কাছে শুনিয়াছেন। এই বিশেষজ্ঞের নাম আরিয়েল মেরারি (Ariel Merari)। মার্কিন সিনেটে সাক্ষ্য বয়ানের সময় তিনি জানাইয়াছেন, 'আত্মঘাতী বোমা ফাটাইবার পূর্বক্ষণে বোমারুদের কেহ কেহ খুব উল্লাস বোধ করে আর চরম মুহূর্তে কেহ কেহ পায় পরম পুলক।' (আসাদ ২০০৭: ৪১)

সঙ্গত কারণেই জিজ্ঞাসা করা চলে, মরিবার পূর্বসন্ধিক্ষণে বোমারু বেচারার মনে কী ছিল তাহা আপনি জানিলেন কোন পথে? আত্মঘাতীর মনের গভীর অসুখ সম্বন্ধে আগে হইতেই আপনি জানিতেন। তাহা ছাড়া নতুন খবর আর কি ছাইপাশ এখানে আছে? আত্মহত্যা মনের বিকারমাত্র—এই পূর্বধারণা না থাকিলে আত্মহত্যাকারীর মনের খবর 'পাইয়াছি, পাইয়াছি' বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা কোন অর্থই বহন করিত না। উপচাইয়া চৌবাচ্চা ছাড়িত।

আত্মঘাতী বোমারুর মনোবিকার—পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন—দুই প্রকার। এক নম্বরে মাথা খারাপ হইয়া গেলেই লোকে এহেন কাণ্ডে মাতে। সকলেই বলেন না এই কথা, তবে অনেকেই বলিয়া থাকেন। দুই নম্বরে বলা হয় সমাজ ও সভ্যতার সহিত খাপ খাওয়াইতে অসমর্থ হইয়া কিছু লোক আত্মঘাতী বোমার ঝুড়ি বাছিয়া লইতেছে। মনে রাখিবেন এখানে সমাজ বলিতে বুঝিতে হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাম্রাজ্য।

বোমা বিশারদগণ একই মুখে দুই কথা বলিতে কদাচ কসুর করেন না। এক মুখে তাঁহারা বলেন: বোমারু যোদ্ধাটি খুব হিমশীতল মাথায় বোমা ফাটাইল। ইহার অর্থ নিজের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ষোল আনা আছে। দোসরা মুখে তাঁহারা বলিবেন: অন্য লোকে, মানে মন্ত্রণাদাতারা তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া এই গর্হিতকর্মে নামাইয়াছে। যোদ্ধাটি—ইহার মানে দাঁড়াইল—খুবই উনোবুদ্ধির লোক আর তাহার মন্ত্রণাদাতৃমণ্ডলি ভারি দুনো লোক। তাহারা সাংঘাতিক, ভয়াবহ রকমের নির্দয়, নিঠুর, পাঁজি।

তালাল আসাদ প্রমাদ গুণিতেছেন ইঁহাদেরই। ব্যাখ্যা দিবার ছলে তাঁহারা শুদ্ধ নতুন সমস্যা হাজির করিতেছেন। আমাদের জ্ঞানচক্ষু মুদিয়া আসিল বলিয়া—আসাদ বলিলেন—আত্মঘাতী বোমারু বোমাবাজিতে নিজ ইচ্ছায় নামুক আর পরের সাধ্যসাধনায় নামুক কিছুই যাইয়া আসিতেছে না। নামাটা কাজের শর্ত (condition) মাত্র, ব্রত বা মতলব নহে।

কেহ কেহ বলিতেছেন আত্মঘাতী বোমাবাজি নিছক মনের **ভুলে** করিবার মতন কাজ নহে। ইহার জন্ম মনের **শুদ্ধে** বটে। কী সেই শুদ্ধ? মহাপরাক্রমশালী, অজেয় অপার শত্রুর সমক্ষে পড়িয়া, তাঁহার দয়ামায়াহীন যাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া যুগপৎ নিজ ও পরকে ধ্বংস করিবার পথ ছাড়া তাহার সামনে আর কোন সড়ক থাকে না।

আবার কেহ কেহ বলেন এসলাম ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষাই সমস্ত নষ্টের গোড়া। মাথাধোলাই করিয়া আত্মঘাতী বানাইবার কারখানারই অপর নাম এসলাম—বলিতেছেন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ। ফিতার ভিতর অচিন ভাষায় রেকর্ড করা বিবৃতি শুনিয়া তাঁহারা নিশ্চিত হন আত্মঘাতীর মনের প্রকৃত সত্য ধরা পড়িয়াছে। অথচ তাঁহারা ভুলিতেছেন এই মুখস্থ ভাষাও আচার বিশেষ মাত্র।

সত্য কি আসলে তাহাই? আসাদ বলিয়াছেন: বিশেষজ্ঞদের মতলব বিশেষ করিয়া বিচার না করিলে এখানে ঠকিবার সম্ভাবনা প্রবল। বোমাব্রত ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে জীবনের জায়গায় মৃত্যুকে বাছিয়া লইল। ইহাতে কী প্রমাণিত হইতেছে? হইতেছে যেই ধর্ম এহেন শিক্ষা প্রচার করে সেই ধর্মের জীবনাদর্শ মৃত্যু, তাহার সংস্কৃতি মরণের মহোৎসব মাত্র।

অথচ এই যুক্তির প্রণেতা ও প্রচারকগণ ভাবিয়া দেখেন নাই—আত্মঘাতী বোমার ব্রত বা লক্ষ্য মৃত্যু নয়, মৃত্যু এক প্রকার পরিণতি মাত্র।[৪] ব্রতসন্ধানী পশ্চিমা পণ্ডিতসমাজ—আপাতত মনে হইতেছে—এই সমালোচনায় তেমন বিব্রত হইবেন না।

আত্মঘাতী বোমার ব্যাখ্যাস্বরূপ পশ্চিমা পণ্ডিতসমাজের অনেক ব্যাখ্যাই পূর্বসংস্কারের পরিমার্জনা বৈ নহে। লাভের মধ্যে, ধর্মপরায়ণতা (religious subjectivities) ও দুনিয়াবি গায়ের জোর বা রক্তপাত (political violence) সম্বন্ধে অনন্ত-স্বাধীনতাবাদী ওরফে স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীগণ (liberals) কী চিন্তা করেন তাহার পরিচয় পাইলাম। এখনো বোমা বা এসলাম সম্পর্কে নতুন কিছুই জানা হইল না।

৩

পশ্চিমা সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরগণ (intellectuals) বলিতেছেন, আত্মঘাতী বোমা এসলাম ধর্মীয় চিন্তাধারার ফসল। তালাল আসাদ এই ব্যাখ্যা সঠিক মনে করেন না। ধুরন্ধরগণ প্রমাণ করিতে চাহেন আত্মঘাতী বোমা বোমাবাজগণের ব্রতের ফসল। ধর্মবিদ্যার খ্যাতনামা পণ্ডিত আইভান স্ট্রেনস্কি (Ivan Strenski) বলিতেছেন বোমা ফাটাইয়া আত্মহত্যা করিবার ব্রত এক ধরনের ধর্মীয় আত্মোৎসর্গ বা জান 'কোরবানি' বৈ নহে। গবেষক বেগম মে জায়ুসি (May Jayyusi) লিখিয়াছেন, এই জাতীয় আত্মোৎসর্গের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অপমান হইতে মুক্তির প্রয়াস, তবে শেষ বিচারে ইহাও আত্মদানের মতন ধর্মীয় বিশ্বাস হইতেই জন্ম লইয়াছে।

আরেক বিশারদ, ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্রুনো এতিয়ন (Bruno Etienne), একই পথে জানাইতেছেন আত্মঘাতী বোমা আরবজাতির অস্থিমজ্জায় প্রোথিত 'মরণ-কামড়' (death-wish) বৈ নহে। এই তিন ব্যাখ্যার সামান্য দিক তালাল নির্ণয় করিয়াছেন—উহা আর কিছু নহে, এক ধরনের ব্রত বা মোটিভ। সেই ব্রত মৃত্যু। মৃত্যু কেন? কারণ এসলাম ধর্ম জীবনের সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ঢের মহিমাযোগে দেখিয়া থাকে। এসলাম তাঁহাদের মতে এক জাতীয় 'মরণ সভ্যতা' (culture of death)।

আইভান স্ট্রেনস্কি যাত্রা করিয়াছেন এয়াহুদি বংশোদ্ভূত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানবেত্তা এমিল দুর্খাইমের (Emile Durkheim) আত্মহত্যা-বিদ্যা হইতে। দুর্খাইমের অনুসারী বলিয়া পরিচিত জনৈক পণ্ডিতের নাম হাবোয়াকস (Halbwacks)। তিনি আত্মহত্যা (suicide) ও আত্মোৎসর্গের (sacrifice) মধ্যে ভেদ দেখিয়াছেন। এই ভেদ কী তাহা জানিবার প্রধান উপাদান সমাজ। সমাজ দুই জিনিসকে তো এক চোখে দেখে না। আত্মনিগ্রহ বা আত্মহত্যার সঙ্গে সমাজের অনুমোদন যখন যোগ করা হয় তখন তাহা আচারানুষ্ঠানযোগেই (ritual) করা হয়।

শুদ্ধ কি তাহাই? আত্মোৎসর্গ মানে 'পবিত্র করিয়া তোলা'। লাতিন শব্দ সাক্রিফিকিয়ুম (*sacri-ficium*) অর্থও ইহা বৈ নহে। ইহা হইতেই ইংরেজি ভাষার বুলি 'স্যাক্রিফাইস' আসিয়াছে।

স্ট্রেনস্কি দেখাইতে চাহেন ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা ফিলিস্তিনি জাতি (বা উম্মা) সমীপে বোমারুর আত্মোৎসর্গ বা উপহার

(আরবিতে 'হাদিয়া') মাত্র। আদমবোমা জেহাদি যোদ্ধার বিবেচনায় যুদ্ধের কৌশলও বটে। স্ট্রেনস্কি তাহা অস্বীকার করিতেছেন না। তারপরও তিনি যোগ করিয়াছেন এই ঘটনার প্রকৃত বিচার করিতে হইলে ইহার ধর্মীয় ভিত্তিটুকু হিসাবে লইতেই হইবে। তাঁহার মতে আত্মোৎসর্গের সহিত রক্তপাতের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। তাঁহার বিচারে ধর্ম মানেই আত্মনিগ্রহ বা আত্মোৎসর্গ। অতয়েব রক্তপাতে বিলম্ব কেন?

স্ট্রেনস্কির কহতব্য কতখানি যুক্তিসম্মত? তালাল আসাদ মনে করেন স্ট্রেনস্কি বৃথাই দুর্খাইমের নাম ভাঙ্গাইতেছেন। দুর্খাইম দেখাইয়াছিলেন আত্মহত্যা যদিও এই দুনিয়ার মধ্যে মনুষ্য-সন্তানের সবচেয়ে বেশি আপন বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তথাপি ইহার মধ্যে 'অপর' বা সমাজ নানাভাবে জড়াইয়া থাকে।

তালাল আসাদ মনে করেন এমিল দুর্খাইম বাঁচিয়া থাকিলে আত্মঘাতী বোমার ঘটনাকে 'পরার্থপর বা পরোপকারী আত্মহত্যা' (altruistic suicide) বলিয়া গণিতেন। অথচ স্ট্রেনস্কি এক হাতে এই ঘটনাকে কৌশলে ব্যক্তির ব্রত বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, আবার অন্য হাতে ইহার সহিত আচার যোগ করিয়াছেন। এইভাবে ব্যক্তির সহিত—সমাজকে পাশ কাটাইয়া—ধর্ম যোগ করিয়াছেন তিনি। করিয়া প্রমাণ করিলেন (এসলাম) ধর্মই আত্মহত্যা বোমার জননী।

তালাল আসাদের দ্বিতীয় মন্তব্য অনুসারে এসলাম ধর্মে আত্মোৎসর্গ বলিয়া কিছু নাই। যাহা আছে তাহা হইল পশু জবাই (আরবি 'জবিহা') করা। ইহার যুক্তি: আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন পশু হত্যা করিবে, যেন তোমার মানুষ হত্যা না করিতে হয়। ইহাই হজরত এব্রাহিম শিখাইয়াছিলেন। কোরবানির সময় ইহাই পালন করা হয়। কোন বিপদ বা ফাঁড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া উঠিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওয়াস্তে আরেক ধরনের উৎসর্গ করা হয়। তেসরা ধরনের উৎসর্গ হয় কোন অতিশয় অন্যায় বা ভ্রান্তির হাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর খেসারত (বা 'কাফ্ফারা') হিসাবে। আত্মঘাতী বোমারুর কৃত্য ইহাদের কোনটার সহিতই মিলিতেছে না। তাই বাধ্য হইয়া স্ট্রেনস্কিকে নাস্তি নাস্তি বলিতে হইবে।

তিন নম্বর কথা, স্ট্রেনস্কি আত্মোৎসর্গ কথাটি আরবি 'কোরবান' শব্দের তর্জমা আকারেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আরবিতে কোরবান মানে কখনো 'হাদিয়া' বা উপহার দাঁড়ায় না। অথচ তিনি দুই অর্থ গুলাইয়া যে অপূর্ব খিচুড়ি করিয়াছেন তাহা আরবি ভাষাভাষী খ্রিস্টান জাতির সম্পদ মাত্র।

হজরত ইসা—আল্লাহ তাঁহার নাম অনুমোদন করুন—নিজেকে 'উপহার' দিতে পারেন। তিনি পিতার কাছে ফিরিবার হকদার। অন্যের—বিশেষ

মুসলমানের—সেই হক কই? কোরবান কথাটা পবিত্র কোরানের যে তিন জায়গায় পাওয়া যাইতেছে (৩: ১৮৩, ৫: ২৭ এবং ৪৬: ২৮) তাহাদের কোনটাতেই স্ট্রেনস্কির ধারণার সমর্থন পাওয়া যাইবে না। (আসাদ ২০০৭: ৪৪)

এতক্ষণে আশা করি আইভান স্ট্রেনস্কির ব্রত কী তাহা স্থির করিবার পথ পরিষ্কার হইয়াছে। তিনি দাবি করিতেছেন, আত্মোৎসর্গের সিদ্ধান্ত যে লইয়াছে ইহা তাহার ব্রত মাত্র। এই ব্রত হইতে অপরাধ জন্ম লইতেছে। অনেকে যে বলিয়া থাকেন এসরায়েল রাষ্ট্রের পাশবিক দমন ও পীড়ন নীতির কারণেই আত্মঘাতী বোমার বিস্তার, তাহা ঠিক কথা নহে—ইহাই স্ট্রেনস্কির দাবির নির্গলিতার্থ।

এই এক ঢিলে দুই পাখি বধ করিতে চাহিয়াছেন স্ট্রেনস্কি। তিনি একে তো প্রমাণ করিলেন এই বোমাপরাধ ধর্ম হইতে জাত। সুতরাং ইহাকে 'ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ' বলিয়া ডাকা যাইবে। দ্বিতীয় স্থানে প্রমাণিত হইল অপরাধের দায় বর্তায় খোদ বোমাবাজের গায়। কাজেই এসরায়েল দেশের বিপদ কোথা হইতে আসিতেছে তাহাও সনাক্ত হইল। অতয়েব এই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার (রক্তপাতের চৌহদ্দি আরো বাড়াইয়া লওয়া তাহার মধ্যে) তাহা তাহা করিবার অধিকার এসরায়েলের হাতে প্রকাশ্যে সংরক্ষিত রহিল।

মে জায়ুসিও একই ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও ধরিয়া লইয়াছেন আত্মঘাতী বোমাবাজি এক প্রকার জান কোরবানির বিষয়। তিনিও বিশ্বাস করিতেছেন এসলামের সহিত 'মরণ সভ্যতা ' কথাটা জোড়া লাগাইয়া দেওয়া যায়। তালাল আসাদ বলিলেন, ইহাতে আমরা যে সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছি—অর্থাৎ আত্মঘাতী বোমার কারণ নির্ণয় করিতেছি—তাহার কোন রাহা কিন্তু হইতেছে না।

'মরণ সভ্যতা' শুদ্ধ এসলামের মৌরসী সম্পত্তি হইবে কেন? 'অনন্ত-স্বাধীন', স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী, গণতান্ত্রিক সভ্যতাও কি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য মরণকে তুচ্ছ করিবার শিক্ষা দেয় না? না দিলে ন্যায়যুদ্ধ কথাটা কি সোনার পাথরবাটি হইত না?

শ্রীমতি জায়ুসি দেখাইয়াছেন, জাতির ওয়াস্তে আত্মদানই ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা বুকে বাঁধিবার আসল উদ্দেশ্য। ইহাকে তিনিও এসলামি সভ্যতার শরিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তবে তাঁহার বিচারে এসলাম এই ঘটনার কারণ নহে। কারণ খুঁজিতে হইবে এসরায়েল রাষ্ট্রের দমননীতির মধ্যে।

আত্মঘাতী বোমার উৎপত্তি, জায়ুসির বিচারে, অসলো (Oslo) চুক্তির পর। ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত হইয়াছে এই চুক্তির কারণে। ফলে যে জাতীয় হতাশা গোটা জাতিকে গ্রাস করিয়াছে এই বোমা তাহারই প্রতিফলন।

জার্মান এয়াহুদি বংশোদ্ভূত মার্কিন দার্শনিক ও রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক খানম হানা আরেন্টের (Hanna Arendt) বরাত দিয়া বেগম জায়ুসি বলিয়াছেন এসরায়েলের নিপীড়ন ও অপমানজনক ব্যবহার হইতেই ফিলিস্তিনি জাতির সদস্যগণের মনে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের সঞ্চার ঘটিয়াছে। এই ক্রোধেরই অপর নাম আত্মঘাতী বোমা। কিন্তু সত্যের খাতিরে তিনিও কবুল করিলেনঃ এখানে রক্তপাত বা 'ভায়োলেন্স' আসল কথা নহে, আসল কথা স্বাধীনতার স্পৃহা।

যখন আইনসঙ্গত রাজনীতির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তখন রাজনীতির পানি রক্তপাতের পথেই আপনার পথ করিয়া লয়। হানা আরেন্ট বলিয়াছিলেন, দেশের রাষ্ট্রনীতিতে শরিক হইতে না পারিলে মানুষ মানুষই হইয়া উঠিতে পারিত না। রাষ্ট্রনীতি যাহার মাধ্যমে ব্যক্ত হয় না তাহাকে 'ব্যক্তি' বলা মানে ভাষার সর্বনাশ করা মাত্র। আর রোমক সাম্রাজ্যের পতনের আগে—বা আরো বিশদ বলিতে—ইসা পয়গম্বরের আগের যুগে মানুষের অমর হইবার পথ শুদ্ধ রাষ্ট্রনীতির জমিতেই কাটা ছিল। খ্রিস্টধর্ম সেই পথ টানিয়া ধর্মের জগতে আনিয়াছে।

তাহা হইলে বলিতে হইবে শ্রীমতি মে জায়ুসির বিচার শ্রীমান আইভান স্ট্রেনস্কির জমি হইতে সরিয়া আসিয়াছে খানিকটা। তিনি ধর্মীয় আত্মোৎসর্গকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও অমরতা বাসনার সহিত যোগ করিয়াছেন। ইহাতে ভুল বোঝাবুঝির একটুখানি ছুটি থাকিয়াই যাইতেছে। যেমন 'শহিদ' কথাটি শুদ্ধ ধর্মীয় আচার আকারে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন স্ট্রেনস্কি। কিন্তু ফিলিস্তিনের সংগ্রামে যাহারা এসরায়েলি সৈন্যবাহিনী কিংবা পুলিশের গুলিতে মারা যাইতেছে তাহাদের সকলকেই শহিদ বলা হয়। শহিদ কেবল আত্মঘাতী যোদ্ধাদেরই বলা হয় না। শহিদের মৃত্যুর মানে ধরা হয় বিজয়—কোনক্রমেই আত্মোৎসর্গ বা পরাজয় নহে।

ফরাসি রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক ব্রুনো এতিয়েন উত্তর আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ। তিনি আলজিরিয়ার ইতিহাস ঘাঁটিয়া প্রমাণ করিয়াছেন আরব জগতে রক্তপাতের ঐতিহ্য অনেক লম্বা। তাঁহার বিশ্লেষণ পড়িয়া দেখিলে মনে হয়, তিনি ফিলিস্তিনের আত্মঘাতী বোমাযুদ্ধ আর উত্তর আফ্রিকার ঐতিহ্য পরস্পরের আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কাহার স্থান

কারণস্বরূপ আর কাহার স্থান কার্যস্বরূপ তাহা বলিতে ব্যর্থ হইয়াছেন তিনি। (আসাদ ২০০৭: ৫১)

যুক্তির এই ধাতুদৌর্বল্য হ্রাস করিবার মানসে এতিয়েন কী করিয়াছেন? তিনি আশ্রয় লইয়াছেন মহাত্মা ফ্রয়েডের। ফ্রয়েড বলিয়াছিলেন মানুষ সমাজের আদ্যাবস্থায় যে বড় অপরাধটি করিয়াছিল অর্থাৎ গোত্রপিতার জীবননাশ করিয়াছিল, পশুহত্যা তাহারই পুনরাবৃত্তি বৈ নহে। আত্মহত্যা বা আত্মোৎসর্গ—পশুহত্যার মতন—প্রকৃত প্রস্তাবে পিতৃহত্যারই পুনরাবৃত্তি। এই শেষোক্তস্থলে হননেচ্ছা শুদ্ধ 'হাদিয়া' বা উপহার আকারে হাজির থাকে। পার্থক্য শুদ্ধ এইটুকু।

এতিয়েন এই যুক্তির শরণ লইয়া বলিতেছেন এসরায়েল রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান নিপীড়নের মুখে আরবজাতির অসহায় পরাজয় আরবদের মনে আত্মধিক্কারের জন্ম দিয়াছে। এসরায়েলের তৈরি করা বিশাল বিশাল দেওয়াল আর সীমান্তচৌকি সেই ধিক্কার পাকা করিয়াছে। এই সকল দ্রব্য অবজ্ঞা ও ঘৃণা উৎপাদন করিতেছে আর আত্মগ্লানিকে পরহত্যা বাসনায় রূপান্তরিত করিতেছে।

এতিয়েনের এই প্রস্তাব কতখানি যুক্তিসঙ্গত? এই প্রশ্ন তালাল আসাদ তুলিয়াছেন। এতিয়েন প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রয়েডের 'মরণ-কামড়' কথাটাই বুঝিতে পারেন নাই। ফ্রয়েডের বিচারে 'জীবনতৃষ্ণা' (pleasure principle) ও 'মরণ-কামড়' সমানে সমান, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সক্রিয় এই দুই বাসনা। অজ্ঞান হইতে তাহারা আসা যাওয়া করে জ্ঞানের বা সংজ্ঞার জগতে। এতিয়েন সেখানে হাত দিয়া ব্যবধান গড়িয়াছেন, একটাকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই হস্তক্ষেপের পশ্চাতে যুক্তি কোথায়?

তাঁহার দাবি অনুসারে যখন রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে শরিক হইবার সুযোগ বন্ধ হইয়া যায়—ফিলিস্তিনে তাহাই ঘটিয়াছে বৈ কি—তখন মানুষের বাড়তি যে জীবনীশক্তি ছিল তাহা উপচাইয়া উপচাইয়া 'মরণ-কামড়' আকারে প্রকাশ পায়। তাঁহার এই বক্তব্যের সহিত ফ্রয়েড প্রবর্তিত 'মরণ-কামড়' ধারণার কোনই সংযোগ নাই। এই কল্পিত সংযোগ অনুমান করিয়া তিনি বলিয়াছেন রাজনৈতিক কল্পনায় টান পড়িয়াছে বলিয়াই ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধারা আত্মঘাতী বোমার ভার বহন করিতেছে।

কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখিলাম যে জায়ুসি ইহার বিপরীত অনুমানই সিদ্ধ মনে করিয়াছেন। জায়ুসি বলিয়াছেন: রাজনীতি যে অমরতা দেয় সেই অমরতা লাভের বাসনা বা অনন্ত জীবনতৃষ্ণাই আত্মঘাতী বোমার জননী। আর এখন

এতিয়েনের মুখে শুনিতেছি মন্থরার বাণী: মানুষ মরিতে চাহে বলিয়াই আত্মঘাতী বোমার কারখানা বসায়!

এতিয়েনের এই ধারণার গোড়াও রহিয়াছে হানা আরেন্টের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণায়। আরেন্ট একা নহেন, সকল অনন্ত-স্বাধীনতাবাদী অর্থাৎ স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী বা লিবারেল দার্শনিকই মনে করেন রক্তপাত ও রাজনীতির সম্পর্ক ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। একের যেখানে সারা অন্যের সেখানে শুরু।

রক্তপাত ও রাজনীতি যে একে অপরের গাত্র জড়াইয়া সর্বদা মাখামাখি করিতেছে ইহা তাঁহাদের শিখাইবে কে? আমার সেই সাধ নাই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যের ভিত্তি পশ্চিমা দেশের ইতিহাসে। সেই শিক্ষা সেখানেই আছে। সতের শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন লকই দেখাইয়াছেন রক্তপাত বিহনে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। এখন যে কথা যোগ করা দরকার তাহাও এই: রক্তপাতের একচ্ছত্র অধিকার রাষ্ট্রের হাতে যতদিন থাকিবে না ততদিন দশের রায় অর্থে রাষ্ট্রও নাই।

কাজেই ফিলিস্তিনি পামররা রাজনীতি না বুঝিয়া বোমাব্রত ধারণ করিয়াছে—ইহাকে শুদ্ধ ফিলিস্তিনি জাতির অপমান বলিলেই হইবে না। বলিতে হইবে ইহা 'অনন্ত-স্বাধীন' বা লিবারেল চিন্তার ধাতুদৌর্বল্যও বটে।

কোন ব্যক্তিমানুষ কোন পথে নিজ জীবন শেষ করিতে চাহে তাহার সরল ব্যবস্থাপত্র আর যিনিই লিখিয়া থাকুন মহাত্মা ফ্রয়েড কখনো লিখিয়া রাখেন নাই। এতিয়েন বলিতেছেন আত্মঘাতী বোমারু দুশমনের মধ্যে নিজের ছায়া দেখিতে পাইয়াছে। তাই তাহাকে হত্যা করিয়া সে আসলে আপনাকেই শেষ করিল, 'মরণ-কামড়' চরিতার্থ করিল। আপন পরের এই অভেদ যদি সত্য সত্য সত্য হইত তবে জিজ্ঞাসা করা চলিত: আত্মহত্যা না করিয়া আর আর মানুষ সমর ঘোষণা করিতেছে কেন?

রূপক অর্থে যুদ্ধকেও আত্মহত্যা বলা যায়। তাই আন্তর্জাতিক আইনে যখন বলা হয় কোন কোন রাষ্ট্রের পরমাণু বোমা ব্যবহার করিবার হক আছে তখন তাহাকে আত্মহত্যার হক বলিয়াও গ্রহণ করা যায়।

আত্মহত্যার ইচ্ছা যদি অজ্ঞান (the unconscious) হইতেই আসিয়া থাকে তবুও সজ্ঞান মনের মধ্য দিয়াই তাহাকে পথ চলিতে হয়। যুদ্ধঘোষণার বেলায়ও ইহা সত্য। যুদ্ধঘোষণা ব্যক্তির ইচ্ছা ছাড়াইয়া জাতি বা রাষ্ট্রের বা নিদেনপক্ষে শ্রেণীর ইচ্ছা পর্যন্ত ভ্রমিয়া আসে। ইহাও আগ্রাসন বা ধ্বংসাভিলাষ বটে।

কিন্তু লিবারেল দার্শনিকরা বলিতেছেন মানুষ যত সভ্য হইতেছে ততই যুদ্ধ কমিয়া আসিতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, মারণাস্ত্রের উন্নতির ফলে যুদ্ধবিগ্রহে মৃতের

সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। (ওবেরমায়ার ২০০৮) মানুষের ইতিহাস কিন্তু এই বক্তব্য সমর্থন করিতেছে না। তালাল আসাদ বলিয়াছেন, তথাকথিত অসভ্য জাতিগণের তুলনায় সভ্য অভিমানী জাতির যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা অনেক বেশি। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তাহার যুদ্ধাভিলাষ দমনের ইতিহাস বলিয়া মনে হয় না। 'প্রগতি' শব্দের আর যে অর্থই থাকুক—এই অর্থ করা যাইতেছে না।

ফ্রয়েড বলিয়াছেন, মানুষের মনে অপরাধবোধ জাগিলে পরহত্যাভিলাষ কিছু কমিয়া আসে। সভ্যতার প্রগতি বলিতে ফ্রয়েড এই অপরাধবোধের প্রগতিই বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাহা আত্মহত্যার ঝোঁক বাড়ায় এমন কথা ফ্রয়েড বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের জ্ঞানে প্রবেশ করে নাই।

তালাল আসাদ এক জায়গায় বলিয়াছেন যুদ্ধের সময় আত্মহত্যার সংখ্যা কমিয়া আসে—এই কথা সত্য। তবে তিনি নিশ্চিত নহেন যে কথাটি পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস হিসাবেও সত্য। ফ্রয়েডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ফরাসি জাক লাকাঁ কোন একস্থলে কহিয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাসে প্রবর্তিত 'প্রগতি' কথাটাই ভুয়া।

৪

রবার্ট পাপ (Robert Pape) নামক ভিন্ন একজন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দাবি করিতেছেন: আত্মহত্যার বোমা আসলে ধর্মটর্ম নহে, যুদ্ধের কার্যকর কৌশল মাত্র। প্রমাণ সকলেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, শুদ্ধ ফিলিস্তিনিরা করে না। তিনি শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ১৯৮০ হইতে ২০০১ সালের মধ্যে পৃথিবীতে একুনে ১৮৮টি আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা নিকাশ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন ইহাদের মধ্যে ৭৫টি ঘটনা একলা শ্রীলঙ্কার তামিল মুক্তিযোদ্ধারাই ঘটাইয়াছে।

পাপের গবেষণা দুই জায়গায় খতরনাক সিদ্ধান্ত টানিয়াছে। আত্মঘাতী বোমাহামলা আসলেই কি তেমন কার্যকর পদ্ধতি? আদমবোমা যত গর্জে তত বর্ষেও কি? ফিলিস্তিন সংগ্রামের ইতিহাস কী প্রমাণ করিতেছে? আত্মঘাতী বোমার প্রকোপবৃদ্ধির পর এসরায়েলের পক্ষে পশ্চিমা সাম্রাজ্যের জনমত আরো সবল হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রাম ১৯৬০ দশক হইতে কত কৌশলেরই না আশ্রয় লইয়াছে! তাহা হইলে ফিলিস্তিন সংগ্রামের আত্মঘাতী কৌশল ও তাহার পায়ের তলার এসলামি সভ্যতা লইয়া পশ্চিমা জ্ঞানজগতে এত শোরগোল

পড়িয়াছে কেন? ইহার উত্তর কিছু পরিমাণে তালাল আসাদও লিখিয়াছেন তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাবে। আমরাও আশা করি যথাস্থানে—আদমবোমা না স্বাধীনতা-ব্যবসায় প্রবন্ধে—তাহা লিখিব। (দেখুন, প্রবন্ধ ৪)

এক্ষণে শুদ্ধ বলিব আত্মঘাতী বোমাকে বিশেষ ব্রতের ফসল হিসাবে দেখিবারই কুফল এই এসলামবধ কাব্য। ধর্মের (বিশেষ এসলামের) ব্রত হইতে আত্মঘাতের উদ্ভব বলিতে পারিলে অনেক লাভ। একদিকে মনস্তত্ত্ব, অন্যদিকে সভ্যতা এই দুই কুলই রাখা যাইবে। 'মনস্তত্ত্ব'ও হইল (মানে অপরাধ নির্ণয়ের পরিচিত ফৌজদারি আদালতসম্মত পদ্ধতি হইল—অপরাধীর মনে কী আছে তাহা জানা হইল) আর 'সভ্যতা'ও হইল (মানে আমরা ও তাহারা—সভ্য ও অসভ্য জাতি—যে এক নই তাহাও স্পষ্ট হইল)। 'সভ্যতা' জীবনতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে আর 'বর্বরতা' (গতকল্য পর্যন্ত যাহা 'বন্য' ছিল) 'মরণ-কামড়' খাইতেছে। আহা কি আনন্দ বিচার ও বিশ্লেষণে, কি অপূর্বমিলন মণি ও কাঞ্চনে!

তালাল আসাদের বিচার্য শেষ বিশেষজ্ঞের নাম রোকসান এয়ুবেন (Roxanne Euben)। ইনিও শুরু করিয়াছেন দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হানা আরেন্ট হইতে। কিন্তু শেষ করিয়াছেন অন্য জায়গায়। দেখিব মে জায়ুসির মতন ইনিও বলিবেন, আত্মঘাতী বোমা ফিলিস্তিনের সংগ্রাম বা তাহার মুক্তিযুদ্ধের কৌশল—ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কৌশলের গোড়া নিছক এসলাম ধর্মের বিশ্বাসে পোঁতা বলিয়া ইনি জাহির করেন নাই। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

এয়ুবেন দাবি করিয়াছেন, এসলামি পরিভাষায় যাহাকে 'জেহাদ' বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য শুদ্ধ পরকালের দরজা খোলার চাবিতে খুঁজিলে চলিবে না। ইহাকে দুনিয়াবি ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে অন্ধ রক্তলোলুপ হত্যার উৎসব হিসাবে দেখাও ঠিক হইবে না। তাহা হইলে 'জেহাদ' ঠিক কী বস্তু?

হানা আরেন্টের সান্ধ্যভাষা (discourse) ব্যবহার করিয়া বেগম এয়ুবেন জাহির করিতেছেন: জেহাদ এক জাতীয় রাজনীতি যে রাজনীতির লক্ষ্য দুনিয়াবি জীবনের নশ্বরতা পার হইয়া অবিনশ্বর জীবনের স্বাদ পাওয়া। কিন্তু এই অবিনশ্বরতার পথও এই নশ্বর জীবনবেদের ভিতরেই পাওয়া যাইবে। সেই জীবনবেদ আর কী হইতে পারে? তাহার নাম এই দুনিয়ার ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা।[৫]

হানা আরেন্ট ও অন্যান্য স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী দার্শনিক মনে করেন রাষ্ট্র ও রক্তপাত যেন বা তেল ও জলের নাহান, একে অপরের সহিত মিশিতে পারে

না। রাষ্ট্র মানে রক্তপাতের অবসান আর সতত-সম্মতির শুরু। কিন্তু আরেন্টের এই ধারণার সহিত রোকসান এয়ুবেন একমত নহেন। তিনি সঙ্গত কারণেই প্রস্তাব করিতেছেন: রক্তপাত ছাড়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু রক্তপাতের **সম্ভাবনাটা** বাদ দিলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রই হইত না। (আসাদ ২০০৭: ৫৮) রক্তপাত জিনিসটা খারাপ কিন্তু এই খুনখারাবি ছাড়া রাষ্ট্রের মঙ্গল প্রতিষ্ঠিতও হয় না, ধারণাও ধারণ করা যায় না।

কথার শেষ কিন্তু এখানেই হইল না। শুদ্ধ একদিন রক্তপাত করিয়াই যদি রাষ্ট্র ক্ষান্ত দিত তারপরও হইত না। নীরব রক্তপাতই রাষ্ট্রের নিত্যদিনের কর্মসূচি। রক্তপাতের অধিকার একদিনও যদি স্থগিত থাকে তো কোন 'অনন্ত-স্বাধীন' রাষ্ট্রই অনন্ত থাকিত না, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু হইয়া যাইত। জাতীয় দণ্ডবিধি (Penal Code) অনুসারে মৃত্যুদণ্ডদানের ক্ষমতা আর আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতার অপর নাম রাজশক্তি, সার্বভৌমত্ব বা নিত্য-রক্তপাত। কাজেই অনন্ত-স্বাধীন রাষ্ট্রের রক্তেই রক্তপাতের নেশা ঘুমাইয়া আছে বলিলে সত্যের উপকার ভিন্ন অপকার হইতেছে না।

ইহা যদি সত্য না হইত তবে দুনিয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র যে দুনিয়া দাবড়াইয়া দাবড়াইয়া জাতীয় নিরাপত্তা কায়েম করিতেছে তাহা কী করিয়া করিত? রক্তপাতের অধিকার স্বীকার না করিলে পশ্চিমা ধনতন্ত্র আজ যে বিশ্বসাম্রাজ্য কায়েম করিয়াছে তাহাও বিধিসম্মত হইত না। শুদ্ধ তাহাই নহে, এই দুনিয়া ধ্বংস করিবার অর্থাৎ পরমাণু বোমা ফাটাইয়া চলিবার অধিকারও জাতিসংঘভুক্ত 'আন্তর্জাতিক ন্যায়ের আদালত' স্বীকার করিয়াছে। (আসাদ ২০০৭: ৬০)

পরমাণু বোমার অধিকারও যদি সত্যাগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে তবে আত্মঘাতী বোমা কেন আত্মহত্যার অপবাদ একলা একলা বহন করিবে? অনন্ত-স্বাধীন ব্যবসায়ী রাষ্ট্র আজও তাহার উত্তর দিতে পারে নাই।

আত্মহত্যার আগে পারিবে কিনা সন্দেহ করিবার কারণ আছে। ঢের আছে।

....

মাসিক আল-আশরাফ, জানুয়ারি ২০০৮

§ ৪

আদমবোমা না স্বাধীনতা-ব্যবসায়

নতুন ইয়র্ক নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক তালাল আসাদ ২০০৬ ইংরেজি সনের মে মাসে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবিন নামক পরিসরে তিনটি বক্তৃতায় আত্মহত্যাকারী বোমা আক্রমণ বিষয়ে বিচার ও আলোচনা করিয়াছিলেন। পরের বৎসর নতুন ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সেই বক্তৃতামালা লইয়া একখণ্ড ছোট মাপের বই ছাপাইয়াছেন। প্রকাশিত প্রথম দুই বক্তৃতায় তালাল আসাদ আলোচনা করিয়াছিলেন দুই প্রশ্নের: পশ্চিম জগতের নীতি-নির্ধারকরা 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'ত্রাসনীতি' বলিতে কী বোঝেন আর তাঁহাদের বিচারে কোন কোন মানুষ কেনই বা ত্রাসনীতির চরম প্রকাশস্বরূপ আত্মহত্যার মতন বোমা ফাটায়।

আমি ২০০৭ সনের শেষের দিকে এই দুইখানা বক্তৃতা লইয়া দুই আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার কিছু কিছু সমালোচনাও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি নিজেও এই জাতীয় বোমা আক্রমণ সমর্থন করি কিনা প্রায় সকলেই এই আশঙ্কাজাত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর দেওয়া আমার মনে হইয়াছিল অনাবশ্যক। তালাল আসাদের লেখাতেই বরং ইহার উত্তর খোঁজা যাইতে পারে। জ্ঞানী সমালোচকদের জিজ্ঞাসার জওয়াব খোদ তালাল আসাদই উত্তম দিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। এক কথায়, প্রশ্নটা সমর্থনের বা বিরোধের নহে, উত্তরটাই অর্থের।

তালাল বলিয়াছেন তিনি নিজেও তাঁহাদেরই দলে যাঁহারা যুদ্ধে ব্যবহৃত সাধারণ বা গুচ্ছ (cluster) বা নিশ্ছিদ্র (carpet) প্রভৃতি বোমার তুলনায় আদমবোমায় বেশি শিহরণ বোধ করেন। শিহরণ বা ইংরেজি 'হরর' কথা দিয়া তিনি এমন কোন প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছেন যাহা ঠিক আতঙ্ক নহে।

আর আতঙ্ক বলিতে ‘ভয়’ নামক যে অনুভূতির চরম প্রকাশ চিহ্নিত হয় সেই ভয়ও ঠিক নহে। সুতরাং সমর্থনের প্রশ্নই উঠিতেছে না।

পার্থক্যের মধ্যে, তালাল আসাদ আর দশ পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ বা প্রাচ্য বিশারদের মতন নিতান্ত সমর্থন করি না বা নিন্দা করি বলিয়া তুষ্ট থাকিতে চাহেন না। পশ্চিমা পণ্ডিতদের এক বড় অংশই আত্মহত্যা বা আদমবোমার নিন্দা করিয়া বলেন এই বোমাবাজি কাজটি যাহারা করে তাহারা সভ্য নহেন, তাহারা ‘অসভ্য’ (বা বড়জোর ‘বর্বর’)। অর্থাৎ আদমবোমা ব্যাপারটি সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যকার সংঘর্ষ। শুনিতে ভালো লাগিবে না বিধায় মধ্যে মধ্যে তাঁহারা ‘সভ্যতার সহিত সভ্যতার সংঘাত’ বা এই জাতীয় কিছু কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তালাল তাঁহাদের নিকুচি করেন।

পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এক বড় অংশ একই সঙ্গে এই কথাও বলেন যে আত্মহত্যা বোমা কেবল বিশেষ এক সভ্যতার—যাহার নাম এক্ষণে এসলামি সভ্যতা—অন্তর্গত সত্য। তালাল আসাদ এই মতের পোষকতা করেন না। তিনি মনে করেন আদমবোমা কোন ধর্ম বা সভ্যতাবিশেষের অন্তর্গত সত্য নহে, ইহার গোড়া দেখিতে হইবে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে। যতদিন আমরা ইহা বুঝিতে না পারিব ততদিন আমরা ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইব না।

ত্রাসনীতি ও আদমবোমার ত্রাসনীতি—এই দুই প্রশ্নের গোড়ায় একই পদ্ধতি কাজ করিতেছে। সকলেই প্রশ্ন করিতেছেন: বোমারুর ব্রত, মতলব বা প্রবর্তনাটি কী বস্তু। তাহারা কী কারণে বা কোন অকারণে এহেন গর্হিত কাজে পৃথিবী নোংরা করিতেছে? তালাল আসাদ তাঁহার তিন নম্বর বক্তৃতায় সেই প্রশ্ন সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন: প্রশ্ন কেবল বোমারুর মতলব সন্ধানের মধ্যে সীমিত রাখায় ফল হইতেছে না। প্রশ্ন করা উচিত আমাদের মধ্যে কেন এই শিহরণ জাগিতেছে? কেন আমরা যাঁহারা বোমার খবর শুনি বা ছবি দেখি তাঁহারা এমন করিয়া কাঁপিয়া উঠি? আসাদের ধারণা, এই প্রশ্নটিও যদি একই সঙ্গে না করা হয় তো ঘটনার পুরা ছবি ধরা পড়িবে না।

তালাল আসাদ দ্বিতীয় এয়ুরোপীয় যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ কিংবা বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সকল জায়গা হইতে উদাহরণ সমবায় করিয়া দেখাইতেছেন শিহরণ নামক প্রতিক্রিয়ার দুই পর্ব। প্রথম পর্ব যখন ঘটনা ঘটে তখনকার। ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহাকে সচরাচর বলে অবাক কিংবা হতবাক হওয়া। পরে যখন সেই ঘটনার স্মরণ কিংবা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হয় তখন ঘটে দ্বিতীয় পর্ব।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই শিহরণের কারণ খুঁজিয়াছেন ঘটনার আকস্মিকতার মধ্যে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন বিস্ফোরণের মধ্যে। আবার কেহ কেহ ইহার কারণবীজ খুঁজিয়াছেন আক্রান্ত আর আক্রমণকারীর রক্তমাংস একসঙ্গে জড়াজড়ি করার ঘটনার মধ্যে। ১৭ শতকের ইংরেজ মহাকবি জন মিল্টনও এই জড়াজড়ি দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিহরণ হয় নাই। (মিল্টন ১৯৮২: ৮৪) এই শিহরণের উৎস বা শিকড় ব্রিটিশ পণ্ডিত জ্যাকুলিন রোজ (Jacqueline Rose) সন্ধান করিয়াছিলেন এই নৃশংস মিলনের ভিতর। প্রচলিত যুদ্ধের নৃশংসতা হইতে এই নৃশংসতার একপ্রস্ত পার্থক্য শ্রীমতি রোজ দেখিয়াছিলেন খোদ আক্রমণকারীর পরিকল্পিত মৃত্যুর মধ্যে। দুঃখের মধ্যে, তিনিও সেই তদন্ত সম্পূর্ণ করেন নাই। (রোজ ২০০৪; দেখুন, আসাদ ২০০৭: ৬৫-৬৭)

১

তালাল আসাদ মনে করেন জ্যাকুলিন রোজের পরিত্যক্ত প্রথম প্রশ্নের পথেই সত্যের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীমতি রোজের দ্বিতীয় প্রশ্ন সেই পুরাতন পথে ফিরিয়া যাওয়া মাত্র। নিজেকে বাঁচাইয়া শত্রু নিধন করিবার তুলনায় নিজের প্রাণ দিয়া শত্রু সংহার করা কেন নীতির বিচারে নিকৃষ্টতর গণ্য হইবে? ইহাই ছিল শ্রীমতি রোজের দ্বিতীয় প্রশ্ন। আসাদ দেখিতেছেন, ইহার মর্মকথাও অপরাপর পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নের অন্যথা নহে: আত্মহত্যাকারীর নৈতিক অবস্থান, তাহার পাপ, তাহার অপরাধ, তাহার বর্বরতা বা অসভ্যতার পরিমাপ জানাই ইহার নিহিত উদ্দেশ্য।

অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটনার সাক্ষী বা দর্শক যে তাহার মনের ভাব কোন অবস্থায় থাকে জানিবার বিষয় তাহাই। হিরোশিমা কি নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফুটিয়াছিল কোন পূর্বঘোষণা ছাড়া। আজও দুনিয়ার এই দেশে সেই দেশে মাটিতে পুঁতিয়া রাখা মাইন শত শত মানুষ, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে, পঙ্গু কিংবা হত্যা করিতেছে। তাহাতেও বিপুল শিহরণ ঘটে। কিন্তু তাহার তুলনায় আদমবোমার শিহরণ অধিক কেন?

আরো প্রশ্ন করিতে হয়। কালো মানুষ কালো মানুষকে আদমবোমায় আঘাত করিলে—যেমনটি শ্রীলঙ্কায় তামিল ও সিংহলিদের যুদ্ধে হইতেছে কিংবা ঘটিতেছে এরাকি স্বাধীনতাকামীদের সহিত সেই দেশের মার্কিন সহযোগীদের সশস্ত্র সংঘাতে—পশ্চিম জগতের মানুষজন তেমন শিহরণ বোধ

করে না। অথচ অন্য সময়—যখন কালো মানুষের দল এয়ুরোপের কোন কোন যোদ্ধা কিংবা এয়ুরোপীয় বংশের কাহাকেও হামলা করিলে—তাহারা ঢের বেশি শিহরিত হয়।

কিন্তু কেন? পরদেশ দখল করিয়া শাসন ও শোষণ করিবার ইতিহাসেই ইহার গোপন কথা নিহিত আছে—তালাল আসাদের এই কথা সত্য। তবুও আসাদের প্রশ্নের সত্যটা সত্য কেন সেই রাহা এইখানে হইল না।

আদমবোমারু নিজেও মারা যায়। ইহাও সত্য কথা। মানুষের মৃত্যু মাত্রই মানুষের হৃদয়কে ব্যথিত করিবে। কিন্তু আদমবোমায় যে শিহরণ তাহার তুলনা সাধারণ মৃত্যু দিয়া হইতেছে না। উদ্বেগ ও রাগে, উৎকণ্ঠা ও ক্রোধে ইহার ব্যাখ্যা শেষ হইবে না। তাহা হইলে সন্ধান করিতে হইবে আত্মহত্যা করিয়া হত্যা করিলে আমরা যে একটু অধিক কাতর হইয়া পড়ি তাহারই বা কারণ কী? আদমবোমারুর সহিত এইখানে কি আমাদের অন্তরের কোথাও কোন যোগসাজশ আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিয়া তালাল আসাদ দুই দফা প্রস্তাব হাজির করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব: আদমবোমারুর সহিত আমাদের যোগাযোগ দুই জায়গায়। আমরা যাঁহারা আধুনিক এয়ুরোপের নানা রাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যাঁহারা ভাষায়, সংস্কারে, আচারে এয়ুরোপীয় হইয়া উঠিয়াছি তাঁহারা অনেকেই নিজেদের বলি লিবারেল, সেকুলার কিংবা মডার্ন। এই লিবারেল মানে হইতে পারে স্বাধীনতাবাদীও। 'উদারনৈতিক' কথাটার তুলনায় ইহা বরং মূলের অধিক অনুগামী। বাংলায় আমি ইহারই তর্জমা প্রস্তাব করিলাম 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী'।

আমরা কি কথায় কথায় বলি না, **যে কোন মূল্যে** আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিব? যে কোন মূল্যে গণতন্ত্র রক্ষার কথাও শোনা যায়, কেহ কেহ স্ব স্ব ধর্ম রক্ষার কথাও প্রচার করেন। যে কোন মূল্যের কথা আসে কেন? আসে চরম মূল্য অর্থে। এই চরম মূল্যেরই অপর নাম জীবন। নিজের জীবন দান করিয়া দেশরক্ষার শপথ বর্তমান যুগের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষই লইয়া থাকেন।

অর্থাৎ স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে জীবন দেওয়া জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যবহার, ইহাই আমরা নিত্য বলিতেছি। যুদ্ধে আমার জীবন দান এক প্রকার নিশ্চিত ব্যাপার। জাতির বা দেশের প্রয়োজনে (কেহ কেহ বলিবেন আদর্শের প্রয়োজনে) জীবন দিতে যিনি কার্পণ্য করেন না তাঁহাকেই আমরা শহিদ, বীর বা বীরশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করি। তাই না!

আদর্শটা যাহাই হউক, তাহা সঙ্গত না বিসঙ্গত সেই তর্ক আপাতত স্থগিত রাখিয়াও বলা যায়, জীবনদানের বৈধতা আমাদের অগোচর নহে। আদমবোমারুর কাজে আমরা কি আমাদেরই ভিতরের পরিচয়টা প্রকাশিত হইতে দেখি না? আমাদের শিহরণের গোপন কারণ কি ইহাও হইতে পারে না? এই প্রশ্নেরই নাম আমি রাখিলাম: তালাল আসাদের প্রথম প্রস্তাব।

আধুনিক, ইহলৌকিক, স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী নাগরিকের জন্য দেশ জাতি রাষ্ট্র আদর্শ প্রভৃতি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করা তুচ্ছ জিনিস। ইহা তিনি নিজে করিবেন স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু অন্যেও যদি একই কাজ করে, একই পথ ধরে তবে তাঁহার আতঙ্ক শিহরণে পরিণত হয়। যাহাকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়া প্রকাশ পায়। এই ধরা পড়িয়া যাওয়ার জন্যই কি তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন?

ধরা পড়িয়া যাওয়া ব্যাপারটির আর একটি অর্থও কিন্তু আছে। দেশ জাতি প্রভৃতির জন্য আত্মদানে আধুনিক মানুষ কসুর করে না। করিলে তাহার স্বাধীনতা কোথায় থাকে? অথচ একই সঙ্গে আধুনিক মানুষ দাবি করে: ধর্ম প্রভৃতি সংস্কার হইতেও তাহারা স্বাধীন। তাহাদের স্বাধীনতা পারলৌকিক নহে, ইহলৌকিক। যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা রক্ষার শপথ করিবার পর তাহাদের এই দাবি যে বেশ অসার আত্মপ্রতারণা তাহাও ধরা পড়িয়া গেল। তলে তলে তাহাদের আবেগ আগের দিনের ধর্মীয় বা পৌরাণিক আবেগ হইতে মোটেও স্বাধীন কিংবা স্বতন্ত্র হয় নাই—এই সত্যে সন্দেহ থাকে না।

যাহাকে বলে আদমবোমা তাহা আধুনিক মানুষেরই নেমেসিস। আর আদমবোমারু সেই সত্যই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সেই জন্যই কি আমরা—আধুনিক ইহলোকবাদী স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীরা—শিহরিয়া উঠি?

আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায় ও পৌরাণিক ধর্ম-ব্যবসায় একসূত্রে গাথা এহেন দাবি তালাল আসাদ সরাসরি করেন নাই। তবে তিনি দাবি করেন আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের গোড়ায় যে সকল স্রোতস্বিনী জলসিঞ্চন করিয়াছে—আজও করিতেছে—তাহার মধ্যে, বিশেষ পশ্চিম জগতে, এয়াহুদি-নাসারা ধর্ম-ব্যবসায়ের ধারাই অধিক কার্যকর। আদমবোমায় আমরা যেভাবে কাঁপিয়া উঠি তাহার অন্যতম সূত্র এয়াহুদি-নাসারা ধর্মধারায় পাওয়া যায় আর এই ধর্মধারায় তাহা অনুমোদন লাভ করিয়াছে স্ববিরোধী আকারে। ইহাই তালাল আসাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ফলে আমরা বলিতে পারি আদমবোমারুর পাপের মধ্যে এই পাপও আছে যে সে এয়াহুদি-নাসারা ধর্মের অনুসারীদের মনে করাইয়া দিতেছে তাহাদের

ধর্মের ভিত্তিস্থলেও একই ঘটনা বর্তমান। রক্তমাংসের জড়াজড়ি নয়, আত্মায় আত্মায় এই জড়াজড়িই কি সেই নিহিত কারণ যাহার কথা বিস্মরণের গর্ভ হইতে স্মরণপথে উদিত হইলে স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীর শিহরণ ঘটে?

আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের ভিত্তিতে যে জীবনবিরোধী আত্মদানের নীতি নিত্য বর্তমান, প্রাচীন এয়াহুদি-নাসারাদি ধর্মেও সেই একই জীবনবিরোধী আত্মদান নীতির প্রাবল্য। আত্মহত্যাকারী বোমারু সম্ভবত সেই কথাই আমাদের মনে করাইয়া দিতেছে। যাঁহারা বলেন আত্মহত্যাকারী বোমাবাজ জঘন্য সন্ত্রাসবাদী আর স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহারা ন্যায়যোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা তাঁহাদের প্রস্তাবের তলায় মাটি তাহা হইলে থাকে কোথায়?

তৃতীয় ওয়েলেক লাইব্রেরি বক্তৃতায় তালাল আসাদ প্রশ্নের মুখ এই দিকেই ঘুরাইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মামলা ন্যায়নিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী বনাম জঘন্য সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে নহে। সত্য ঘটনা বরং উল্টাই। আদমবোমা কথাটা নতুন শোনাইলেও শোনাইতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা তো অনেক অনেক দিন আগে হইতে চলিয়া আসিতেছে। আদমবোমারুকে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা বলিতে অনেকেরই আপত্তি। তাই আসাদ পাল্টা জিজ্ঞাসা করিতেছেন: আধুনিক যুগের স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী রাষ্ট্র ও ইহার মনীষীবর্গ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন আদমবোমাবাজি তাঁহাদেরও বংশ-পরম্পরার অংশ বা উত্তরাধিকার নহে?

এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিবার সাধ্য যেহেতু কাহারও নাই, সঙ্গত কারণেই সিদ্ধান্ত হইবে সমস্যা খোদ স্বাধীনতা-ব্যবসায় অর্থাৎ লিবারেলিজমের মধ্যেই লুকাইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ইহার সমাধান।

অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজমান না থাকিলে স্বাধীনতার সহিত দাসপ্রথা, সার্বভৌমত্বের সহিত পররাজ্য-গ্রাসনীতি, ঔপনিবেশিক শাসন কেমন করিয়া সহাবস্থান করিতে পারে? এয়ুরোপে যে নরঘাতক নীতির জন্য জার্মানির আর্যব্যবসায়ী হিটলার মানবজাতির অভিসম্পাত আজি অবধি কুড়াইয়া যাইতেছে, সেই একই নীতির অধিক গিয়াও ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, মার্কিন ঔপনিবেশিক নীতি প্রভৃতি কি করিয়া বাহবা পাইতে পারে? কি করিয়া স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের নামে হাততালি লইতে পারে?

স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের একমুখে আছে স্বাধীনতার বুলি, কিন্তু তাহার পায়ের নিচে দাবানো সারা পৃথিবীর কোটি কোটি পরাধীন, অর্ধ-পরাধীন মানুষ।

এয়ুরোপ যাহাদের নরাধম-জ্ঞানে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়াছিল আজও তো তাহারা পূর্ণ মুক্ত হয় নাই।

১৯৪৭ সনের ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে আমরা যে যুগের সূচনা দেখিয়াছি সেই যুগকে বলে পরাধীনতাবসানের যুগ (age of decolonization)। কিন্তু তাহার এক বছরের মাথায় ফিলিস্তিনে নতুন করিয়া পরাধীনতার যুগ শুরু হইল কি করিয়া? (আহমদ ২০০৬/ক) স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। ইহা তাহার অকাট্য প্রমাণ।

তালাল আসাদের প্রস্তাব হইতে আমরা এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পথ পরিষ্কার করিতেছি। আমরা প্রাচীন ধর্ম হইতে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব সর্বত্র দেখি একই কবিতা—আত্মহত্যা, অমীমাংসিত আত্মহত্যা। ইহা কি অধিকার, না কর্তব্য? এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই।

২

হজরত এব্রাহিমের বংশধর তিন ধর্মের প্রত্যেকটিতেই বলা হইয়াছে আত্মহত্যা পাপ বটে। মানুষকে জীবন দেওয়া হইয়াছে তাহা যাপন করিবার জন্য। জীবন যিনি দিয়াছেন লইবার সর্বস্বত্বও তিনিই সংরক্ষণ করিতেছেন। নিজ জীবনের উপর মনুষ্য-সন্তানের সার্বভৌমত্ব কোন ধর্মই স্বীকার করিবে না। কিন্তু ঘোর অন্যায়ের প্রতিদানে মনুষ্যের জীবন লইবার হক সৃষ্টিকর্তার আছে। সেই সুবাদে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ ধর্মমণ্ডলি বা আধুনিক রাষ্ট্রও জীবন লইবার বা লঘু-গুরু শাস্তি দান করিবার হক রাখে। বর্তমান যুগের ভাষায় বলা যায় নাগরিকের জীবনের উপর রাষ্ট্রের হক আছে। দুঃখের মধ্যে, শুদ্ধ নাগরিকেরই হক নাই—থাকিতে পারে না।

সেই কারণেই হয়তো বা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন অবস্থায় যেন আত্মহত্যা না করিতে পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধরত সৈনিকেরও আত্মহত্যার অধিকার নাই, কালব্যাধিগ্রস্ত মরণপথযাত্রীরও নাই সেই অধিকারভোগের অধিকার। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ ব্যক্তির শাস্তি হইবে এক বৎসর কারাদণ্ড—বাংলাদেশে কার্যকর দণ্ডবিধিতে এহেন তথ্য পাওয়া যাইবে।

১৮৩৮ সনে প্রকাশিত ভারতে ব্রিটিশ দণ্ডবিধির এক আদি খসড়ায় (ব্রিটিশ) ভারতীয় 'আইন কমিশন' প্রস্তাব করিয়াছিলেন আত্মহত্যার সহায়তা করিলে ক্ষেত্রবিশেষে (১২ বছরের নিচের ব্যক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে) মৃত্যুদণ্ড ও

অন্যান্য ক্ষেত্রে ২ বছর হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান করিতে হইবে। (দি ইন্ডিয়ান ল কমিশনার্স ১৮৩৮: ধারা ৩০৬–৩০৭)

এক কথায় মৃত্যু অভিপ্রেত নহে, তবে কর্তৃপক্ষের আদেশে বা অনুমতিক্রমে কিংবা উৎসাহে মানুষের প্রাণ দেওয়া কর্তব্য।

ঐদিকে আদমবোমারু প্রভৃতি আত্মহত্যাকারী ধর্ম বা রাষ্ট্র যাহা অনুমোদন করে না সেই কাজ করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকে। হয়তো ইহাই তাহার আসল পাপ। কর্তৃত্বহীনের কর্তৃত্ব গ্রহণ মানিয়া লওয়া যায় না। একটুখানি আবেগ-নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলেই ধরা পড়িবে সমস্যা প্রাণ বা মৃত্যু লইয়া যতটা নহে, তাহার অনেক বেশি সেই প্রাণদান বা মৃত্যুবরণের শর্ত বা পরিস্থিতি লইয়া। তাহা হইলে সেই শর্ত বা পরিস্থিতিই বা কেন আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে না?

তালাল আসাদ এই নিয়মের অতিক্রম, ব্যতিক্রম বা ব্যভিচারও দেখাইয়াছেন এক জায়গায়। প্রাচীন গ্রিসের জগতে আত্মহত্যা পাপ বলিয়া গণ্য হইত না, আপন প্রাণ আপনি লওয়াকে এমনকি অপরাধও বলা চলিত না। পার্থক্যের মধ্যে, এই অধিকার সীমিত হইত শুদ্ধ উচ্চবাক বা এলিট শ্রেণীর ভিতর। দাসদিগকে আত্মহত্যার হক দেওয়া বুদ্ধির কাজ বিবেচিত হয় নাই।

পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত আত্মহত্যার ঘটনা মহাত্মা সক্রাতেসের বিষপানে মৃত্যুবরণ। সকলেই ইহার কথা জানিবেন কিন্তু ইহাকে আত্মহত্যা বলিয়া মানিবেন কিনা সন্দেহ। বলিবেন ইহা তো বিচারে প্রদত্ত দণ্ড। ইহার অন্যথা কী হইতে পারিত? জল্লাদের হাতে মৃত্যু।

জার্মান মনীষী নিৎসে বলিয়াছেন সক্রাতেসের এই আত্মহত্যা গর্হিতকর্ম। কেন? শুদ্ধ আত্মহত্যা বলিয়া নয়। হত্যা বা আত্মহত্যায় নিৎসের আপত্তি নাই। তাঁহার আপত্তি অন্যত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া হার মানায়। বাহিরের শক্তির কাছে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেওয়ার পক্ষ তিনি লইবেনই না। এই নীতি উচ্চবাক বা এলিট নীতি হইতে পারে না। একই যুক্তিতে নিৎসে আলায়হেস সালাম হজরত ইসার বেহাত আত্মহত্যাও অনুমোদন করিবেন না। আত্মসমর্পণই নিৎসের মতে দোষের কাজ, আত্মহত্যা কিংবা মৃত্যু নহে।

অথচ হজরত ইসার ধর্ম যাঁহারা দুনিয়াজোড়া অনুসরণ করেন তাঁহারা এই ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা দিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস পবিত্র। কারণ হজরত ইসা আর দশজনের মতন মানুষ নহেন। তিনি মাবুদের একমাত্র ঔরসজাত পুত্র অর্থাৎ পবিত্র। অথচ প্রকাশ্য নির্যাতনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ

মনুষ্য-সন্তানের মতন তাঁহারও রক্ত ঝরিয়াছে। আর দশ মানুষের রক্তের মতন তাঁহারও রক্ত লাল এবং বহমান ছিল।

হজরত ইসা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যাহারা নাসারাধর্মের বেগানা তাহাদের নিকট ইহা বিশেষ নতুন কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু নাসারামাত্রই জানেন অপ্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে হইলেও ইহা এক প্রকার আত্মহত্যাই ছিল। হজরত জানিতেন তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। তিনি তাহা বন্ধ করিবার বা তাহা হইতে পলাইবার চেষ্টা করেন নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে। হত্যাকারীদের তিনি সহায়তাও করিয়াছেন। সেই অর্থেই ইহাকে পরোক্ষ বা বেহাত আত্মহত্যা বলা সঙ্গত। নিৎসে ইহারও নিন্দা করেন একই কারণে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতেছে: হজরত ইসা কেন আত্মহত্যায় লিপ্ত হইলেন? নিজেকে অকুতোভয় প্রমাণ করিবার জন্য? তাঁহার মতন মহাত্মা ব্যক্তির জন্য ইহা বাহ্যবস্তু মাত্র। প্রয়োজন ছিল না। নাসারা ধর্মতত্ত্ব অনুসারে মহাত্মা ইসার মৃত্যু মোটেও মৃত্যু নহে, স্বর্গলোকে মানে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনস্বরূপ। কিন্তু তাঁহারাও অস্বীকার করেন না তিনি মরিয়াছেন মানুষরূপেই—মানুষের হইয়া। মানবজাতির মুক্তির সোপানস্বরূপ তাঁহার মৃত্যুকে দেখাইয়া থাকেন নাসারা পুরাণলেখকগণ।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি নাসারা পরম্পরায় মৃত্যুর অর্থ দুই। মানুষ পাপ করিয়াছে তাই মৃত্যু তাহার প্রাপ্যদণ্ড। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ইহাই প্রথম অর্থ। মৃত্যু পাপেরই ফল।

মৃত্যুর দ্বিতীয় অর্থ মহাত্মা ইসার মৃত্যুতে প্রাপ্তব্য। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আর সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পাপে মৃত্যু নয়, মৃত্যুতেই পাপমুক্তি। মহাত্মা ইসা পবিত্র—শুদ্ধ এই ধারণার ভিত্তিতে আমরা আবিষ্কার করিতেছি তাঁহার মৃত্যু তাঁহার পাপের ফল নহে, অন্যের (অর্থাৎ মানবসমষ্টির) পাপের যুগপৎ ফল ও প্রায়শ্চিত্ত।

তালাল আসাদ দেখাইতেছেন বর্তমান যুগের ইহলৌকিক মানবতন্ত্রও (যাহাকে এয়ুরোপে নাসারাধর্মের উত্তরাধিকারী আদর্শ বলা যায়) এই স্ববিরোধ বুকে ধারণ করিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল এবং এই দুই পায়েই খাড়া আছে। বিশেষ আদর্শ বা জীবনধারা টিকাইয়া রাখিতে হইলে নাগরিক-সৈনিককে প্রয়োজনে আপন জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে—আধুনিক রাষ্ট্র এই দাবি ছাড়িলে দাঁড়াইবার জায়গাই পাইবে না। রাষ্ট্রের জন্য আত্মত্যাগ স্বরূপ মৃত্যু স্বাগত। ইহাকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলা ছাড়া উপায় কি?

অথচ এয়ুরোপের যুক্তরাষ্ট্র (European Union) সহ অনেক আধুনিক রাষ্ট্র আজ দাবি করিতেছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আইনসঙ্গত কাজ হইতে পারে না।

কারণ কোন মানুষের পক্ষেই হাজারকরা এক হাজার ভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইতেছে সত্যি সত্যি তাহা তাহার প্রাপ্য কিনা। মানুষের ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কথা, যদি কখনো প্রমাণিত হয় যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহা সঠিক হয় নাই, তখন মড়াকে আবার জিয়াইয়া তোলার কোন পথই থাকে না।

যাহারা গোঁড়া নাসারা ধর্মাবলম্বী নহে, এমনকি কোন ধর্মেরই তাঁবেদার নহে, যাহারা ইহলোকের বরপুত্র, মানবজাতির ঝাণ্ডাবহ, তাহারাও কবুল করিয়া থাকে নির্দয় মৃত্যুদণ্ডের তুলনায় মানুষকে অনুতাপ অনুশোচনার সুযোগ দেওয়াই বেহতর—মানুষ নীতিশিক্ষার মধ্যবর্তিতায় নিজ নিজ আত্মার শুদ্ধি ও শুচিসাধন করিতে পারে। এই বিশ্বাসের সহিত ধর্মধারাসূত্রে আগত মানবমুক্তির ধারণার আত্মীয়তা আবিষ্কার করিতে হইলে বেশি দূরকল্পনার আশ্রয়ও লইতে হয় না।

অসংখ্য সংস্কার-ব্যবসায়ী বলিয়াছেন মহাত্মা ইসার যন্ত্রণার সহিত একালের কোন পাপী-তাপীর অনুতাপ তুলনীয় নহে বটে। কিন্তু কেহ যদি সত্য সত্য অনুতাপ করিয়া উৎকণ্ঠায় ভোগে তবে তাহা হইতে ধরিয়া লওয়া যায় সত্যি অনুশোচনা হইয়া গিয়াছে—উৎকণ্ঠাতেই শোচনা, উৎকণ্ঠাই শোচনা নহে।

মহাত্মা ইসার ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যু স্বর্গেই পরিকল্পিত। তাহাতে মানবজাতির পাপের কারণে একজন নিরপরাধ, মাসুম মনুষ্যের মৃত্যুর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর বিনিময়ে মানবজাতি এমন এক ভয়াবহ উপহার পাইয়াছে যাহা ভাবিলেও শিহরণে হাত পা অবশ হয়। এই উপহার বা পুরস্কারের নাম অনন্ত জীবন। এই চরম পুরস্কারের পরম মূল্য সত্যি বড় নিষ্ঠুর, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত এই শয়তানসুলভ হত্যাকাণ্ড।

মানবজাতিকে যে পরম মূল্য গুণিয়া দিতে হইল তাহা খোদ শয়তানকেও লজ্জা দিতেছে। মহাত্মা ইসার সহিত তাঁহার শিষ্য এয়াহুদা (Jahuda) সরাসরি বেইমানি করিলেন আর তিনি নিজেই তাহা সহযোগ করিলেন। *পবিত্র ধর্মপুস্তকের* নতুন নিয়মে তাহার বিবরণ পরিষ্কার। 'যোহন লিখিত সুসমাচার' বলিতেছেন:

> এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে। শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয় বলিলেন। তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম

করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তখন শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে? তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে? যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটীখণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ইস্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন। আর সেই রুটীখণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা করিতেছ, শীঘ্র কর। কিন্তু তিনি কি ভাবে তাহাকে এ কথা কহিলেন, যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাহা বুঝিলেন না; যিহূদার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ কেহ মনে করিলেন, যীশু তাহাকে বলিলেন, পর্ব্বের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক কিনিয়া আন, কিম্বা সে যেন দরিদ্রদিগকে কিছু দেয়। রুটীখণ্ড গ্রহণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল; তখন রাত্রিকাল। (*পবিত্র বাইবেল*, 'যোহন লিখিত সুসমাচার,' ১৩: ২১–৩০)

এই বর্ণনায় যাহা চোখে পড়িবার মতন কথা তাহা এই: '*আর সেই রুটীখণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।*' এই মহান নাটকের অপরার্থ এই যে চরম দুষ্ট ও পরম অনিষ্ট এক হইয়াই মাত্র মানবজাতির হিতের ইষ্ট পথ খুলিতে পারিল।

মহাত্মা ইসাকে যে অতুলনীয় পীড়া দিয়া হত্যা করা হইল, নিষ্ঠুরতা শুদ্ধ তাহাই নহে। তাঁহার এই বেদনাদায়ক, উৎপীড়িত মৃত্যুতে যাহারা নির্বিকার থাকিতে পারে তাহাদের নির্বিকারত্ব-পাপে আরো নিষ্ঠুরতা বর্তমান। ক্রুশের কাঠে পেরেকে পিষিয়া মারায় যত নহে তাহার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুরতা দেখিতেছি মনুষ্য জাতির নিস্পৃহতায়। তাহাদের বেপরোয়া ভাবে।

মহাত্মা ইসা প্রাণ দিয়াছিলেন শুদ্ধ এয়াহুদি জাতিগোষ্ঠীর নিমিত্ত নহে, গোটা মানবজাতির জন্য। ইহাই ইসার সর্বজনীন ভাব। একই সঙ্গে 'মানব' পদবাচ্য সকলের জন্য এই প্রাণোপহার দিয়া তিনি ইহাও প্রমাণ করিলেন শুদ্ধ আত্মহত্যাকারী প্রাণদানের মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি—তাহার ইষ্টলাভ—সম্ভব। এই প্রাণদান একাধারে নিষ্ঠুরতার, অন্যাধারে নির্বিকার উদাসীনতার চিহ্নও বহন করিতেছে। প্রাণে ধিক্কার জাগায় এমন প্রাণদানই প্রাণ দানের পূর্বশর্ত।

আধুনিক যুগের মানব-ব্যবসায়ী (humanist) সংস্কার অনুসারে সেই পুরাতন ধর্মীয় উন্মাদনা হইতে একালের মানবজাতি স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু তালাল আসাদ দেখাইতেছেন, এই দাবিও গুজব বৈ নহে। দয়ার্দ্র প্রাণের সলিলে চরম নিষ্ঠুরতার 'রুটীখণ্ড' আজও কম ডোবানো হইতেছে না। মনুষ্য-সন্তানকে পশুর মতন হত্যা করাকে একই সঙ্গে বলা হইতেছে জঘন্যতম শয়তানি এবং পরম মঙ্গল।

উদাহরণ হিসাবে আধুনিক রাষ্ট্রমণ্ডলির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা পাড়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের দেশনায়কগণ এই জাতীয় কথা হরহামেশা বলিতেছেন, হজরত ইসার আত্মত্যাগের সহিত মার্কিন সেনাবাহিনীর হত ও আহতদের তুলনা নিতুই পাঠ করিতেছেন। যথা:

> মানবজাতি যাহাতে করিয়া স্বর্গরাজ্য পাইতে পারে তাহার নিমিত্ত যিশুখ্রিস্ট আপন প্রাণ ক্রুশকাঠে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আর অদ্য রাত্রিবেলা আমরা পরম পবিত্রতার সহিত ঘোষণা করিব মানবজাতির মুক্তি অর্জনের জন্য, বিশ্ব জুড়িয়া মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার খাতিরে পৃথিবীর যে কোন জাতি পরম আত্মত্যাগ স্বীকারের যে চূড়ান্ত করিয়াছে আমরাও তাহাই করিতেছি। (গেম্বল: ২০০৩; দেখুন, আসাদ ২০০৭: ৮৭)

জাতির স্বার্থে আত্মোৎসর্গের গল্প একেবারে নতুন নহে। আত্মোৎসর্গের শেষ সর্গে মানবজাতি এখনো পৌঁছে নাই। সভ্যতা বিস্তারের (civilizing mission) বর্তমান পর্বে শুদ্ধ 'মুক্তি ও স্বাধীনতা'র নাম চলিতেছে। কোথাও কোথাও ইহা নাম ধারণ করিয়াছে 'গণতন্ত্র'। পার্থক্যের মধ্যে ইহাই।

৩

তালাল আসাদের অনিবার্য প্রস্তাব অনুসারে নাসারাধর্মের এই ঐতিহ্য, এই উত্তরাধিকার আধুনিক মানব-ব্যবসায়ী রাষ্ট্রও পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছে।

আত্মোৎসর্গ, রক্তপাত এবং প্রাণদণ্ড—এইসব বস্তু একালের দুনিয়াদারি করা স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীগণ মোটেও পছন্দ করেন না। এইগুলি, তাঁহারা মনে করেন, স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের আগের যুগের নাসারাধর্মের বৈশিষ্ট্য মাত্র। অথচ দেখা যাইতেছে গর্হিত, পরিত্যাজ্য এই সমস্ত বস্তু অধুনাতম স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীগণের জননপর্বেই পূর্ণমাত্রায় জড়াইয়া আছে। মাত্র ন্যায়যুদ্ধের কথা হইতেছে না, সর্বত্রই দেখা যায় পরম রক্তারক্তির সহিত গা জড়াইয়া আছে চরম কোমলতা।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের কবি বলিয়া যেসব কবি সুবিদিত সেই কবিদের কবিতায়ও চরম স্নেহের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে কেবল তখনই যখন কোমল মনের সহিত 'দরকার হয় হত্যা করিব' ধরনের কঠোরতা যোগ হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আছেন রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke), সিগফ্রিড সাসুন (Sigfried Sassoon), উইলফ্রেড ওয়েন (Wilfred Owen), রবার্ট গ্রেবস (Robert Graves) প্রমুখ। একালের বহুল পরিচিত রাষ্ট্রীয়

প্রচারের—যে কোন মূল্যে দেশরক্ষার—প্রাঞ্জল অর্থ আর কিছু নয়: আত্মোৎসর্গ, রক্তপাত ও প্রাণদণ্ড।

দুঃখের মধ্যে নাসারাধর্মের মধ্যযুগ হইতে স্বাধীনতা-ধর্মের অনন্তযুগ পর্যন্ত একই স্ববিরোধ অমীমাংসেয় অবস্থায় পড়িয়া আছে। মীমাংসার কোন সংকেত এখনো পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। স্ববিরোধের এক মাত্রায় জীবনের প্রতি মমতা দেখানো কর্তব্য, অন্য মাত্রায় যে কোন মূল্যে (মানে হত্যা ও আত্মহত্যাসমেত) এই জীবন বিয়োগ করাও কর্তব্য। দুই কর্তব্যের দোলাচলে আধুনিক স্বাধীনতার-ব্যবসায় আজও আগাইয়া চলিয়াছে। ইহার প্রকাশ স্বভাবতই নানাবিধ হইয়াছে।

৪

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেচাকেনার সাদা ও কালো বাজারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তালাল আসাদ। জীবন কখন শেষ হইল আর কখন হইল না, তাহাও কিন্তু জীবন-ধারণকারীর সিদ্ধান্ত নহে। আইনের অর্থাৎ রাষ্ট্রের এখতিয়ার আছে তাহা নির্ধারণ করার। চক্ষু, কিডনি প্রভৃতি অঙ্গ যাঁহারা দান করেন তাঁহারা কেহ কেহ জীবিতাবস্থায়ও তাহা করিয়া থাকেন। আবার এইসব জিনিস মরণোত্তর দান করিবার পথ একটা আছে। এইসব দান গ্রহণ করিবার মত যত সংস্থা রহিয়াছে তাহারা সকলেই 'জীবনদান' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে—বিশেষ পশ্চিম জগতের নাসারা ধর্মধারার প্রভাবাধীন সমাজে—হজরত ইসার 'জীবনদান' স্মরণপথে উদিত না হইয়া পারে কি? ইহার সহিত জীবিত মনুষ্যের অঙ্গদানের কী সম্বন্ধ? টাকা নামক বাহ্যবস্তুরই বা কী যোগাযোগ ইহার সঙ্গে? সেই প্রশ্ন না তুলিয়াই তাঁহারা আগাইয়া যাইতেছেন বীরদর্পে।

তালাল আসাদ আগের দুই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন এয়াহুদি-নাসারা সভ্যতার সহিত এসলামি সভ্যতার দ্বন্দ্ব বলিয়া যাঁহারা বর্তমান বিশ্বের প্রধান দ্বন্দ্বের পরিচয় জাহির করিতেছেন তাঁহারা ভুল করিতেছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন: আসল দ্বন্দ্ব সেখানে নহে, দ্বন্দ্ব খোদ এসলামেরই অন্দরমহলে। সেখানে দুই ধরনের মুসলমান আছে। এক দল আধুনিক ও স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী, আর দল উন্মাদ। স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী দলের সহিত উন্মাদনার বেপারি দলের সংঘাতই বর্তমান দুনিয়ার প্রকৃত সংঘাত।

আসাদ কিন্তু এই রোগ নির্ণয়ের সহিতও ঐকমত্য পোষণ করিতেছেন না। তিনি মনে করেন বর্তমান যুগের নেতৃত্বে রহিয়াছে পশ্চিম জগৎ।

তাঁহারাও অন্তর্দ্বন্দ্বমুক্ত নহেন। পরম মমতার সহিত চরম নিষ্ঠুরতার একটা বিবাদ তাঁহাদের মধ্যেও আছে। সেই বিবাদের রসায়নে স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীর মন যখন দিশাহারা হয় তখন তাহার নাম দাঁড়ায় শিহরণ। এই দ্বন্দ্বের মালিকানা, এই শিহরণ প্রজননের শক্তি তালাল আসাদের মতে একান্তই পশ্চিম জাগতিক। ইহা আদৌ এজমালি নহে। চিনদেশে যুবকের দেহ শতখণ্ডে কাটিবার যে গল্প ফরাসি মনীষী জর্জ বাতায়ি (Georges Bataille) শোনাইয়াছেন তাহার সহিত এই শিহরণের যোগাযোগ সামান্য।

শিহরণ কথাটার অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম। তবে পশ্চিম জগতের মনীষীবৃন্দের পথ ধরিয়া আসাদ তাহার কুলজি নির্ণয় করিয়াছেন অনেকটা এইভাবে—অনেক দর্শক-শ্রোতার চোখ কানে তালা লাগে, তাহারা দেখে হঠাৎ কাণ্ড, নিমেষেই জীবন পরিণত হয় মৃত্যুতে, পরিচিত মানুষ হইয়া যায় অপরিচিত দ্রব্য, রক্ত ও মাংসের সমষ্টি।

ইহাতে যে অনুভূতি হয় তাহা কোন কোন মনীষীর মতে একাধারে বেদনার, দুঃসহ বেদনার, ও চরম আনন্দের। আনন্দ বা হর্ষটা ক্ষণস্থায়ী হইলেও আছে। লোমহর্ষক কথাটার মধ্যে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট। কাজে কাজেই এক ধরনের অসহায় শিহরণ হয়। ইহার উৎস অজানা হইলেও গতি স্পষ্টই সামনের দিকে। এই ঘাতক বলপ্রযোজকের বিরুদ্ধে প্রাণ-মন-দেহ একযোগে ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ পোষণ করিবে ইহাই স্বভাবধর্ম-সঙ্গত।

কিন্তু ঘাতক তো সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বা পরমপ্রাপ্য মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করিল। তাহাতে তো ক্রোধের উপশম হইবার কথা। কিন্তু হয় না তো!

ইচ্ছা হয় অপরাধ ও শাস্তি যেন আলাদা থাকে। ঘাতক আদমবোমারু সেই ইচ্ছাপূরণের পথও বন্ধ করিয়া যায়। ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বিধানের হকও সে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইবার পথ পায়। ইহাতে রাষ্ট্রের প্রতিশোধ গ্রহণের যে শক্তি তাহাকেও একই ক্রিয়ার মধ্যবর্তিতায় অবশ বা পরাস্ত করা হইল বৈ কি!

একালের প্রতিশোধগ্রহণ ক্রিয়াটি প্রতিশোধ (revenge) শব্দে পরিচয় পায় নাই। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মুখ হইতে আমরা শুনিতে শুরু করিয়াছিলাম নতুন শব্দ 'প্রতিদান' (retribution)। অপরাধ যদি হয় মৃত্যু ঘটানোর ক্রিয়ায় তবে শাস্তি হইবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মধ্যবর্তিতায়। ইহাই শাস্ত্রসম্মত। দুইটাই প্রাকৃতিক ঘটনাস্বরূপ এক, কিন্তু সামাজিক ঘটনাস্বরূপ

অন্য অন্য। হত্যা করা পশুসুলভ অপরাধ, অন্যায় আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত ও মনুষ্যসুলভ শাস্তি মাত্র।

ফরাসি এমিল দুর্খাইম বলিতেন শাস্তি মাত্রই প্রতিশোধের আবেগ হইতে জন্ম লইয়াছে, জনচিত্তে যে ক্রোধ জাগে তাহার নিরসন করিবার জন্যই সকল শাস্তি উপশমস্বরূপ দান করিবার কথা। যখন অপরাধ ও শাস্তির ক্রম নষ্ট হইবার উপক্রম ঘটে তখন প্রতিশোধ কথাটার কোন অর্থই থাকে না।

আদমবোমারুর অন্যতর অপরাধ এইখানেই। প্রাণের বদলে প্রাণ, নাকের বদলে নাকের যে গণতান্ত্রিক নীতি সে তাহাই অকার্যকর করিয়া তোলে। এমনকি প্রাণের বদলে ক্ষমা করিবার যে সন্তুষ্টি তাহার সুযোগও থাকে না আদমবোমার ঘটনায়। ইহাও কি শিহরণের অন্যতম শিকড়?

৫

তাহা হইলে কী দাঁড়াইল? তালাল আসাদ কয়েকটি কারণ এক জায়গায় করিয়া দেখাইয়াছেন আদমবোমার অভিজ্ঞতা আধুনিক ইহলৌকিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী পশ্চিম জগতকে একাধিক জায়গায় হতাহত করিয়াছে। প্রথম জায়গায় অর্থাৎ রাষ্ট্রের এখতিয়ার বা আইনসঙ্গত ক্ষমতায় সে হাত দিয়াছে। তাই আদমবোমার শিহরণ হইয়াছে অনন্য। সমরক্ষেত্রে প্রাণদান বা প্রাণগ্রহণ লইয়া কোন শিহরণ নাই—থাকিলে বড়জোর বেদনা আছে। কারণ এই দান ও গ্রহণ উভয় ক্রিয়াই বৈধ। বিধিসম্মতি বা ধর্মসঙ্গতি (legitimacy) এখানে একই কথার এপিঠ ওপিঠ বৈ নহে।

যতই বেদনাদায়ক, যতই ভয়ানক হউক যুদ্ধে মৃত্যুবরণই সঙ্গত, সুতরাং তাহা শিহরণমুক্ত। যুদ্ধ বৈধ কেন? বৈধ কারণ মানবের মাঝে আমাদের জীবনধারা, আমদের ধর্মবিশ্বাস, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বাঁচাইতে হইলে মরিতে হইবে সুন্দর ভুবনে। জাতি ও রাষ্ট্রের বিধানের বাহিরে প্রাণ দেওয়া বা নেওয়া কোনটাই প্রার্থনীয় বা সমর্থনীয় হইতে পারে না। গোড়ার কথা এই।

দুই নম্বর কথা, আদমবোমারু অপরাধ করিবার পর শাস্তি দেওয়ার কোন জায়গাও রাখে না। এই জায়গায় সে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিশোধ কিংবা প্রতিদান লইবার ক্ষমতাই জব্দ করিয়া বসে। ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের মধ্যে ব্যবধান রহিত করিয়া দেওয়াও আরেক দফা অপরাধ। অথচ এই ব্যবধান বজায় রাখার উপরই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের সকল পরিচয়কাণ্ড।

তিন নম্বর জায়গাটিও আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় আনিয়াছি। সকল মানুষই মরণশীল কিন্তু মানবজাতির জীবনকে আমরা অনন্ত বলিয়াই মানি। জানি আর না-ই জানি, অন্তত বিশ্বাস করি। মরজীবন ও অনন্ত জীবনের মধ্যে সমর একটা আছে। তাহাই রাষ্ট্রের মধ্যে মূর্ত হইতে চাহে। রাষ্ট্র অমর বলিয়া দাবি করিতে না পারিলে মরের জীবন দাবি কি করিয়া করিতে পারিত? তাই আমরা একদিকে সমস্ত জীবনই পবিত্র ও অবধ্য বলিয়া দাবি করি, আবার পরক্ষণেই জীবন দিবার আহ্বান জানাই। জানাই কী করিয়া? আইনের কোন শর্ত লঙ্ঘন না করিয়া, কোন অঙ্গকে টুস্‌কিটি পর্যন্ত না মারিয়া কী করিয়া জানাই? রাষ্ট্র অমর না হইলে আমরা কি করিয়া একই মুখে দুই কথা বলিতাম? ব্যক্তি স্বাধীন এবং সকলে আইনের অধীন এই দুই কথাই যুগপৎ সত্য। ইহা বলিতে কোন কপটতা নাই—কিন্তু দুই কথা একই সঙ্গে সত্য হয় কী করিয়া?

স্বীকার করিতে দোষ নাই: এই বিবাদসমষ্টি বর্তমান আছে। শুদ্ধ আছে বলিলেই হইবে না। এই সকল বিবাদ লইয়াই স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতা বা রাজশক্তি যে সত্য ধারণ করে তাহার গোড়ায় আঘাত করিতেছে আদমবোমা। তাহার আঘাতে রাষ্ট্রের অস্থি-মজ্জা-কশেরুকা উড়িয়া যাইতেছে। আদমবোমায় যে জীবনদান ও গ্রহণের নাট্য চলে তাহার অর্থও অমীমাংসেয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই ঘটনার প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ও সমবায়-মৃত্যু ক্ষমার অযোগ্য প্রতিভাত হইতেছে। বৈধতা ও অবৈধতা, অপরাধ ও শাস্তি, জীবন ও রাষ্ট্রের ভেদরেখাটুকু মুছিয়া যাইতেছে। মুক্তির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইতেছে।

পরিশেষে, তালাল আসাদ দেখাইতে চাহেন, আরো একপ্রস্ত পরিণামদারুণ ঘটনা ঘটে। ইহা বিশেষ করিয়া এয়াহুদি-নাসারা পরম্পরা হইতে আগত মানবগোষ্ঠীর জন্য দুর্বহ ভারস্বরূপ। হজরত ইসার প্রাণদানকে অনন্ত জীবনের মূল্য বলিয়া মানিয়া লইবার একটা যুক্তি আছে। অনন্ত মৃত্যুর মূল্য বলিয়া কোন প্রাণদান মানিয়া লইবার তো কোন সান্ত্বনা নাই—হোক না তাহা আদমবোমারুর প্রাণ।

আদমবোমাবাজকে আপনি যদি মানবেতর পশু বা ঐ রকম অশ্লীল কোন গালিগালাজ দিয়া শান্তি পাইতে আগ্রহীও হইলেন হয়েন গিয়া। সে যাহাদিগকে মারিল তাহাদের মনুষ্যত্বের কী হইবে? তাহারা কেন মরিল? মানবজাতির পাপের জন্য? তাহা হইলে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নতুন নিয়ম কি বৃথা যাইবে? তিনি কি আমাদের সকলের পাপের জন্য প্রাণদান করেন নাই?

এয়াহুদি জাতিভুক্ত এয়ুরোপীয় মনীষী ফ্রানৎস কাফকা বলিয়াছেন জীবনের অর্থ স্রেফ মৃত্যু, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সত্য এয়াহুদি-নাসারাদি হজরত এব্রাহিমের ধর্মে কল্পনাও করা যায় কি? নিরপরাধের মৃত্যুর মধ্যবর্তিতায় আমরা সকল মৃতকে আবার প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিব। এই বিশ্বাস যদি বজায় রাখিতে হয় তো কবুল করিতে হইবে, আত্মহত্যাকারী আদমবোমারুটিও সেই প্রেম পাইবার অধিকারী। তাহা কি সম্ভব?

ইহাও যদি সম্ভব হয় তো বলিতে হয় কি ঘাতক, কি শিকার, কি নিছক পথচারী সকলেই বোধ করি অপরাধী। সকলেই বোধ করি একই প্রতিকারহীন অপরাধ করিয়াছে।

তালাল আসাদ, সবশেষে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আদমবোমার আসল ঘটনা কি মরায়, কি মারায়, কি মরিয়া মারায়—কোনটাতেই পাইবেন না। দুনিয়াবি আধুনিক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীরা যাহা প্রাণপণে লুকাইতে চাহেন আদমবোমাবাজ তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়। শিহরণের ইহাই বোধ করি সবচেয়ে নিগূঢ় কারণ।

আদমবোমারুর অভিযান মনে হয় অনন্ত স্বাধীন। প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাধীন থাকিয়া কোন মানুষই নিজের অন্তস্তলের বিকাশ ঘটাইতে পারে না। আদমবোমারু সেই অসম্ভবের পায়েই আত্মনিবেদন করে। আধুনিক পৃথিবীর স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের এই গোপন বিবাদ ক্ষণকালের জন্য বে-আবরু করিয়া মরিয়া যায় আদমবোমারু। তাহার এই অন্তহীন স্বাধীনতার অলীক আবদার প্রকৃত প্রস্তাবে একালের স্বাধীনতা-ব্যবসায়েরই অকথিত বিলাস। সেই অর্থে কি বলা যায় না আদমবোমাবাজিও বর্তমান পৃথিবীর মাপে এক প্রকার স্বাধীনতা-ব্যবসায়?

এই প্রশ্নেই শেষ হইয়াছে তালাল আসাদের শেষ বক্তৃতা। আমাদের মামলা ন্যায়যোদ্ধা বনাম দুষ্ট সন্ত্রাসীর মামলা নহে। তিনি প্রস্তাব করিতেছেন, 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী' বনাম 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী'র মামলা হইলেই তাহা ভালো হইত।

৬

তালাল আসাদের পরামর্শ কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য তাহা বিচার করিতে আরেকটি মামলা আমাদের খানিক সহায় হইবে। পাঠিকা নিজেই বলিবেন। এই ঘটনার নায়ককে কি আমরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী ন্যায়যোদ্ধা' বলিব নাকি বলিব 'জঘন্য বোমাবাজ সন্ত্রাসবাদী'?

ঘটনার সূত্রপাত পুরানা ফিলিস্তিন রাজ্যে। এসরায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা আরো একবার করিলে সদাপ্রভু চল্লিশ বৎসর তাহাদিগকে ফিলিস্তিনি জাতির হাতে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়ের কথা। তৎকালে দানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সরানিবাসী মানোহ্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে অনেক দিন তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই। পরে তাঁহাদের এক সন্তান হইলে তাঁহার নাম শিমশোন (ইঙ্গভাষায় স্যামসন) রাখা হয়।

শিমশোন সদাপ্রভুর দয়ায় জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শক্তি অমিত হয়। তিনি ফিলিস্তিনিদের অনেক অনিষ্ট করেন। তাঁহার সর্বশেষ ফিলিস্তিনি প্রণয়িনীর নাম ছিল দলীলা। একদিন তিনি দলীলার অনুনয়ে হার মানিয়া তাহার কাছে নিজের অমিত শক্তির গোপন কথা প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, 'আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর ওঠে নাই, কেননা মাতার [গর্ভ] হইতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় (উৎসর্গিত); ক্ষৌরি হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্বল হইয়া অন্য সকল লোকের সমান হইব।'

গোপন তত্ত্ব ফাঁস হইবার ফলস্বরূপ শিমশোন একদিন ধরা পড়িলেন। ফিলিস্তিনিরা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিল, বন্দি অবস্থায় তাঁহার মাথায় চুল আবার গজাইল কিন্তু ইহার অর্থ ফিলিস্তিনিরা ধরিতে পারে নাই। একদিন তাহারা অন্ধ শিমশোনকে মজা করিবার জন্য তাহাদের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে লইয়া আসিল। তাঁহাকে কৌতুক করিতে ডাকিল। ধর্মপুস্তক লিখিতেছেন:

> ...তাহারা স্তম্ভ সকলের মধ্যে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল। পরে যে বালক হস্ত দিয়া শিম্‌শোনকে ধরিয়াছিল, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দেও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও; আমি উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইব। পুরুষে ও স্ত্রীলোকে সেই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, আর পলেষ্টীয়দের [ফিলিস্তিনিদের] সমস্ত ভূপাল সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী পুরুষ *প্রায় তিন সহস্র লোক* শিম্‌শোনের কৌতুক দেখিতেছিল। তখন শিম্‌শোন সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই একটী বার আমাকে বলবান করুন, যেন আমি পলেষ্টীয়দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্ত একেবারেই প্রতিশোধ দিতে পারি। পরে শিম্‌শোন, মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার ছিল, তাহা ধরিয়া তাহার একটীর উপরে দক্ষিণ বাহু দ্বারা, অন্যটীর উপরে বাম বাহু দ্বারা নির্ভর করিলেন। আর পলেষ্টীয়দের সহিত আমার প্রাণ যাউক, ইহা বলিয়া শিম্‌শোন আপনার সমস্ত বলে নত হইয়া পড়িলেন; তাহাতে ঐ গৃহ ভূপালগণের ও যত লোক ভিতরে ছিল,

সমস্ত লোকের উপরে পড়িল; এইরূপে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করিয়াছিলেন, মরণকালে তদপেক্ষা অধিক লোককে বধ করিলেন। (*পবিত্র বাইবেল*, 'বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ,' ১৬: ২৫–৩১; বাঁকা অক্ষর বর্তমান লেখকের)

কাকতালীয় মনে হইতেছে এই সংখ্যা—হতের সংখ্যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে নব্য ইয়র্ক নগরীর বিশ্বব্যবসায় ভবনে নিহতের সংখ্যার কাছাকাছি। আসাদ কহিতেছেন হতাহতের সংখ্যাটাই আসল ঘটনা নহে, জীবিতরা এই ঘটনার কোন অর্থ করিতেছেন তাহাতেই পাওয়া যাইবে সত্য ঘটনা। শিমশোনের উদ্দেশ্য বা মতলব লইয়া ধর্মপুস্তক বেশি জায়গা খরচ করেন নাই। তাঁহারা লিখিয়াছেন শুদ্ধ এই কথা: 'পরে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া সরা ও ইষ্টায়োলের মধ্য-স্থানে তাঁহার পিতা মানোহের কবরস্থানে তাঁহার কবর দিল। তিনি বিংশতি বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিলেন।' (*পবিত্র বাইবেল*, 'বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ,' ১৬: ৩১)

হাল জমানার এসরায়েল রাষ্ট্রে শিমশোনের গল্প বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। সেখানে তাঁহাকে বলা হয় 'দুর্ধর্ষ এয়াহুদি'। শুদ্ধ তাহাই নহে, ব্রিটিশ দখলভুক্ত ফিলিস্তিনে বলপূর্বক এয়ুরোপীয় কায়দায় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক রাষ্ট্রের নামও রাখা হইয়াছে এসরায়েল। ফিলিস্তিনে এয়াহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাহিনীকে এই দুনিয়ায় এয়াহুদি জাতির মুক্তিলাভের রূপকল্পস্বরূপ প্রচার করিবার জন্যও এই শিমশোন গল্পটি বয়ান করা হইয়া থাকে। ১৯২৭ সনে জিয়েব ইয়াবোতিনস্কি (Ziev Jabotinsky) নামে পরিচিত জনৈক জায়নপন্থী নেতা এক আধুনিক উপন্যাস লিখিয়া এই কাহিনীর সমকালীন রূপও প্রচার করিয়াছিলেন।

হজরত ইসার অনুসারীদের মধ্যেও এই গল্পটা নানাভাবে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে নৈতিক আত্মশুদ্ধির গল্প হিসাবে পড়িতেছেন। শিমশোন খানিক ইন্দ্রিয়কাতর ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মপুস্তকেই তাহার বিবরণ পাই। তিনি মা-বাবার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ফিলিস্তিনি জাতির মধ্যে মনোহরা কন্যা দেখিতে পাইতেন। সেই দোষেই তাঁহার বন্দিত্ব, দাসত্ব ও অন্ধত্ব।

কিন্তু আধুনিক বিপ্লবী খ্রিস্টান, ১৭ শতকের ইংরেজ কবি মিল্টনও তাঁহার শেষ বয়সে অন্ধাবস্থায় নিজেকে শিমশোন ভাবিয়াছিলেন এবং রাজতন্ত্রী বদমায়েশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিমশোনের মতন জয়ী হইবার আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন শিমশোনের কঠিন নৈতিক রূপ। বাংলাদেশের কবি মহাত্মা শামসুর রাহমানও এই রূপের অন্যথা দেখেন নাই। (রাহমান ২০০৯: ১০৫–০৭; দেখুন, সংবর্ধনা ৩) বিস্ময়ের কি

আছে, এই নীতির পরাকাষ্ঠাকেই একালের এসরায়েল রাষ্ট্রের মুক্তির প্রতীক গণ্য করা হইতেছে।

কি বিচিত্র এই দুনিয়া! শিমশোনের আত্মদানের মধ্যবর্তিতায় এসরায়েল-সন্তানগণ ফিলিস্তিনিদের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মুক্ত করিয়া তিনি তাহাদের আবার বন্দিও করিয়াছিলেন। ইহা জানিয়াও না জানিবার ভান করা ছাড়া এসরায়েল-সন্তানদের এখন অন্য উপায় কোথায়?

এই অসহায়তার কথা মধ্যে মধ্যে গোপনে প্রকাশিত হয়। যেমন এসরায়েল রাষ্ট্রের গোপন পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের নাম রাখা হইয়াছে 'শিমশোন কৌশল' (The Samson Option)। হাতের তালুর সমান সামান্য ভূ-ভাগে এই পথ গ্রহণের অর্থ মানে অকল্পনীয়ের জয়ধ্বনি করা—দুশমনের সঙ্গে সঙ্গে 'আমারও প্রাণ যাউক' বলিয়া ওঠা।

দুঃখের মধ্যে, বর্তমান এসরায়েল রাষ্ট্রে এই কৌশল আমল করিবার লোকও কম নাই। কথা সেই লোকদের লইয়া নহে। আমাদের কালের স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীগণ যে বলেন: **যে কোন মূল্যে** আমাদের জীবনধারা বাঁচাইতে হইবে—শিমশোনের পথও কি সেই মূল্য তালিকারই অন্তর্গত নহে?

পাঠিকা বলিবেন, আমাদের সুন্দর স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীও কি এই হিসাব মাফিক এক ধরনের আদমবোমারু নহেন?

....

যাঁহার াদমবোমা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

§

সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতা

> Hegemony entails the dominance of a given discourse even among those who are not its beneficiaries. It is the cultural arm of imperialism.
>
> যে ভাবধারায় আপনার স্বার্থ নাই সেই ভাবধারার সম্মুখে আপনিও যখন নতি স্বীকার করেন তখন বলিতে হইবে সেই ভাবধারার আধিপত্য কায়েম হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ এমনই।
>
> — একবাল আহমদ (২০০৬/ক: ২৩১)

জাতীয় কবিতা পরিষদের আমন্ত্রণ পাইয়া আমার মনে হইয়াছিল আরেকবার জন্মগ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ পাইয়াছি। কিন্তু লিখিতে বসিয়া টের পাইলাম এই কাজ অতিশয় কঠিন—পাণিগ্রহণের চেয়ে কম কঠিন নহে। কথাটা খুলিয়া বলিব।

আর যে অপবাদই কবিদের দেওয়া যাউক না কেন তাঁহারা বড় সহনশীল এই অপবাদ কেহ দিতে পারিবেন না। কবিরা সমালোচনা ব্যবসায়ীদের কত সহ্য করিতে পারেন তাহা আমার জানা নাই। স্মরণ করুন খোদ জীবনানন্দ দাশের বাক্য। সমারূঢ় সমালোচককে তিনি বরং কবিতা লিখিয়া দেখিবার রূঢ় উপদেশই দিয়াছিলেন। কবিরা শুদ্ধ স্বজনের সমালোচনা শুনিতে প্রস্তুত, তাহার অধিক শুনিবেন না।

ইচ্ছায় হই আর অনিচ্ছায় হই, আমি সমালোচনার আদার বেপারি। একদা কবিযশোপ্রার্থীদের সঙ্গে কিছু সময় আমিও কবিতা-জাহাজের খবর লইয়াছিলাম। এই কথা স্বীকার করিতে দোষ নাই। সেই সুবাদে কিনা

জানি না: কবিদের সমালোচনা করিবার খানিক অধিকার আমিও হয়তো অর্জন করিয়াছি।

তদুপরি শুনিয়াছি একালের আরবি প্রবাদে আরো একটা কথা চালু আছে। *কুল্লু মান কানু আরাবুন ফি লোগাতিহিম, ওয়া সাকাফাতিহিম, ওয়া ওয়ালাইহিম ফা হুম আল-আরাব*। অর্থাৎ যে তাহার বাক্যে, আচারে এবং বাসনায় আরব সে-ই আরব। (আহমদ ২০০৬/ক: ৩৭৭)

বাক্যে, আচারে এবং বাসনায় যে কবি সে-ই কবি। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে, আমি কবিদের সমালোচনা করিবার অধিকার খানিক অর্জন করিয়াছি কথাটা মনে হয় একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

১

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তঃপাতী গিনি বিসাউ ও সবুজ অন্তরীপ দ্বীপপুঞ্জ (Guinea Bissau and Cape Verde Islands) নামক দেশের নেতা মুক্তিসংগ্রামী ও তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা আমিলকার কাব্রাল (Amilcar Cabral) তাঁহার দেশ স্বাধীন হইবার দুই বৎসর আগে—১৯৭৩ সনের ২০ জানুয়ারি তারিখে—সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগিজ সরকারের লেলাইয়া দেওয়া গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। তাহারও কয়েক বৎসর পূর্বে—১৯৭০ সনে—এক বক্তৃতায়, উত্তর আমেরিকার কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বলিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা অনেক বিষাদসিন্ধুই রচনা করিয়াছে। এইসব সিন্ধুর মধ্যে বিষন্নতম সিন্ধুর নাম জার্মানির জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক (ওরফে নাৎসি) দল। (কাব্রাল ১৯৭৩: ৩৯)

অনেকেই হয়তো বলিবেন, ইহা এমন কি নতুন কথা হইল? কাব্রাল বলিয়াছিলেন: নাৎসিরা মরে নাই, সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই তাহারা বাঁচিয়া আছে। নতুন কথা সম্ভবত ইহাই।

কাব্রালের কয়েক বৎসর আগে—১৯৫০ সনের দশকে—ফরাসি দখলাধীন মার্তিনিক রাজ্যের নেতা, কবি ও মুক্তিসংগ্রামী এমে সেজার (Aimé Cesaire) এই কথাই অন্য কায়দায় বলিয়াছিলেন। নাৎসিনেতা হিটলারের পাপ মার্জনার অতীত—ইহা সকলেরই জানা আছে। তবে তাঁহার মতে, সকলের আরো জানা দরকার, ২০ শতকের সুশীল মানবদরদী ও অতি খ্রিস্টান এয়ুরোপীয় বুর্জোয়া ভদ্রলোকটির ভিতরেও একটা করিয়া হিটলার বাস করিতেছে।

হিটলারকে বুর্জোয়া ভদ্রলোক ঘৃণা করেন কী কারণে, জানেন? হিটলার মানুষের অবমাননা করিয়াছে বলিয়া নহে। হিটলারকে খ্রিস্টান বুর্জোয়া দুনিয়া ঘৃণা করে মানুষের অবমাননাকে সে সাদা মানুষের সীমানা পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে বলিয়া। হিটলারের আসল অপরাধ তাহা হইলে আর কিছুই নহে। এতদিন যাবৎ এয়ুরোপের খ্রিস্টান বুর্জোয়া জাতি আলজিরিয়ার আরব, হিন্দুস্তানের কুলি আর আফ্রিকার নিগ্রোদের জন্য যে দণ্ড, যে শাস্তি, যে মারধর একপাশে চিহ্ন দিয়া মওজুদ করিয়া রাখিয়াছিল সেই মারধরই আডলফ হিটলার খোদ এয়ুরোপ মহাদেশে টানিয়া আনে। (সেজার ২০০০: ৩৬)

এয়ুরোপের মহাযুদ্ধ বাধিয়াছিল—কে না জানে—পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের উপর, বেশির ভাগ মানুষের উপর এয়ুরোপীয় নানান পরাশক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠার লড়াই আকারে। এই সর্বোয়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রথম ভাগে—১৯১৮ সন নাগাদ—নব্য পরাশক্তি জার্মানি পরাজিত হয় বলিয়াই ইহার দ্বিতীয় ভাগে জার্মানির মানুষ হিটলারের নাৎসি দলকে ক্ষমতায় চড়ার সুযোগ দেয়। এই দ্বিতীয় ভাগের যুদ্ধে খোদ হিটলারের পরাজয় হইলেও সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় হইয়াছে—এমন কথা বলার উপায় পাওয়া যায় নাই। উদাহরণ দিয়া বলিতেছি: যখন ব্রিটেন ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি ছাড়িয়া যাইতেছে, ঠিক তখনই স্বাধীনতার নাম দিয়া তাহারা ফিলিস্তিনে নতুন এয়ুরোপীয় উপনিবেশ—এসরায়েল রাষ্ট্র—বসাইতেছে।

অনেকখানি অভিনব কায়দায়, সন্দেহ নাই। তবু পরদেশদখল মানে পরদেশদখলই। আর উপনিবেশ মানে তো উপনিবেশই। (আহমদ ২০০৬/ক: ২৯৮–৩১৭)

ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই শুরু হইল তথাকথিত ঠাণ্ডা যুদ্ধ। ১৯৫৫ সনের জোট নিরপেক্ষ বান্দুং মেলার সময় এয়ুরোপীয় সাংবাদিকরা 'তৃতীয় বিশ্ব' নামক নতুন একটা কথা চালু করিয়া দিলেন।

'তৃতীয় বিশ্ব' কথাটার মধ্যেও অভিনব এক লুকাচুরি লুকাইয়া ছিল। এতদিনে বিশ্ব যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও পরাধীন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহার সত্যকথাটি এই অলঙ্কারের আড়ালে চাপা পড়িয়া গেল। ১৯৯১ সন নাগাদ সাবেক রুশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর—এতদিনে—স্পষ্ট হইতেছে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগেও বিশ্ব তিন ভাগে নয়, মূলত দুই ভাগেই ভাগ করা ছিল। এতক্ষণে ইহারই ডাকনাম দাঁড়াইয়াছে: উত্তর ও দক্ষিণ।

পৃথিবীকে আমরা যাহার যেমন ইচ্ছা দুই কেন, দুইশ ভাগেও ভাগ করিতে পারি। আমি সেই ভাগাভাগিতে আগ্রহ পোষণ করি না। আমার আবেগ

অন্যত্র। বেশি পিছনে নাই বা গেলাম, অন্তত খ্রিস্টানি পঞ্জিকার ১৮ শতক পর্যন্ত গেলেই দেখিতে পাই তখন হইতেই বিশ্ব এক হইয়া গিয়াছে। এই খবর আমার শ্রবণ-প্রতিবন্ধী দুই কানে পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। নহিলে ১৯ শতকের গোড়ায় জার্মান মনীষী এয়োহান ফন গ্যেটেই (Johan von Goethe) বা কেন বিশ্বসাহিত্যের (*Weltliteratur*) ধুয়া তুলিতে যাইবেন? নানান দেশের নানান ভাষার ভেদ কাটিয়া বিশ্বসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা টের পাইতে না পাইতেই ফের দেখিতেছি: শুদ্ধ অধীন প্রজার দেশে নহে, স্বাধীন রাজার দেশেও একই দুনিয়া আবার—নতুন করিয়া—দুই দুই ভাগে ভাগ হইতে চলিয়াছে।

আমার কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজনে আর জায়গার অভাবে মাত্র দুই জন কবির দুইটা কবিতা খুলিয়া দেখাইতেছি। উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা কী বস্তু আর ইহাকে কবিরাও বা কেমন করিয়া দেখেন তাহা নির্ণয় করা। অধিক করিতে পারিতাম তো দেখিতাম কবিরা যাহা দেখিতেছেন আমরা তাহা অনেক সময় দেখিতেই পাই না।

শুদ্ধ মনে রাখিবেন, সাম্রাজ্যবাদ কথাটা গালিও নহে, হেঁয়ালি তো কখনোই নহে। বিশেষ দেশের নীতিবিশেষও নহে। সাম্রাজ্যবাদকে ধর্মের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগে এক দেশের রাজা অন্য দেশ জয় করিলে তাঁহার 'সাম্রাজ্য' গড়া হইত। নয়া জমানায় এক দেশের হাতে আর দেশ ধরা পড়িলে লোকে 'সাম্রাজ্যবাদ' কথাটা যোগ করে। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর আছে। যাহা আছে তাহাও সামান্য কথা নহে। পরদেশদখল ব্যবসায়ের অন্দরমহলে এই অসামান্য পরিবর্তনটা ঘটিয়া গিয়াছে খ্রিস্টের ১৯ শতকে।

জনৈক কনরাড শ্মিট (Conrad Schmidt) বরাবর ১৮৯০ সনের ২৭ অক্টোবর তারিখে লেখা এক পত্রযোগে জার্মান মহাত্মা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এই পরিবর্তনের কথাটাই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ান অনুসারে, ১৮০০ সালের আগে এয়ুরোপের নানান পরদেশ-মালিক বা ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশ হইতে কি করিয়া সস্তায় মালামাল আমদানি করা যায় সেই ফিকির সন্ধান করিতেছিলেন। শিল্প-কারখানার বিপ্লব তাঁহাদের এই পথ হইতে সরাইয়া নতুন পথে ঠেলিয়া দিল। আনুমানিক ১৮০০ সালের পর তাঁহারা যাঁহার যাঁহার দেশের শিল্প-কারখানার পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের স্বার্থে তাঁহার তাঁহার ঔপনিবেশিক বাজার রক্ষা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। (মার্কস ও এঙ্গেলস ১৯৭৫: ৩৯৭–৯৮; হাবিব ২০০৭: ৫৮–৫৯)

কার্ল মার্কস তাঁহার যৌবনের এক সাংবাদিক রচনায় এই অর্থে ১৮১৩ সালকেই সাম্রাজ্যবাদের সূচনাকাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কারণ ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজ পূর্ব ভারত কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করিয়া ভারতের বাজারে ব্রিটেনের কারখানায় তৈরি সকল পণ্যের প্রবেশাধিকার অবাধ করিয়া দেওয়া হয়। সকলেই জানেন, এই ব্রিটিশ আইনের নাম ১৮১৩ সালের সনদ আইন।

ইহার ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্প-কারখানা ধ্বংসের পথও খুলিয়া যায়। *পুঁজি* প্রথম খণ্ডে কার্ল মার্কস ব্রিটিশ আইনসভার দোহাইযোগে বলিয়াছিলেন ভারতীয় তাঁতির হাড্ডি জমিয়া হিন্দুস্তানের পথপ্রান্তর সাদা হইয়া গিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদ-ধর্মেরই অপর নাম ২০ শতকের কোন কোন বিলিতি পণ্ডিত রাখিয়াছিলেন 'স্বাধীন বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ' (Imperialism of Free Trade)। অধীন দেশের পণ্য লুটিয়াই মাত্র এই সাম্রাজ্যবাদের সাধ মিটিল না। অধীন দেশের পণ্য তৈরির ক্ষমতাও সে লুটিয়া লইল। মহাত্মা আমিলকার কাব্রাল সাম্রাজ্যবাদ বলিতে পতিত দেশের পণ্য তৈরির ক্ষমতা নষ্ট করিতে সক্ষম এই শক্তিমত্তার কথাই নির্দেশ করিয়াছিলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে সেই প্রস্তাবই আমল করিতেছি মাত্র।

২

খ্রিস্টান পঞ্জিকার ১৮৪৭–৪৮ সনে মহান ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার (Charles Baudelaire) 'হাবিল ও কাবিল' (Abel et Caïn) নামে একটি ছোট্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জগদ্বিখ্যাত *আবিলের ফুল* (*Les Fleurs du mal*) কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। বিখ্যাত বাংলা অনুবাদক বুদ্ধদেব বসু তাঁহার গ্রন্থে এই কবিতাটি গ্রহণ করেন নাই। (বোদলেয়ার ১৯৮৬: ২২৯–৩০; দেখুন, সংবর্ধনা ১, ২)

কবিতাটির স্বাদ অল্পস্বল্প লইতে হইলেও খ্রিস্টান ও এয়াহুদি পুরাণের গল্পটা কম বেশি স্মরণ করিতে হয়। তাই আমি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (প্রকাশ *কিতাবুল মোকাদ্দস*) হইতে ইহার কিছু অংশ হাজির করিতেছি:

> পরে আদম আপন স্ত্রী হাওয়ার কাছে গমন করিলে তিনি গর্ভবতী হইয়া কাবিলকে প্রসব করিয়া বলিলেন, মাবুদের সহায়তায় আমি মানুষ প্রাপ্ত হইলাম। পরে তিনি হাবিল নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিলেন। হাবিল মেষপালক ছিল, ও কাবিল কৃষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কাবিল নজরানারূপে মাবুদের উদ্দেশ্যে ভূমির ফল

পেশ করিল। আর হাবিলও নিজের পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু ও তাহাদের চর্বি কুরবানী করিল। তখন মাবুদ হাবিলকে ও তাহার নজরানা কবুল করিলেন; কিন্তু কাবিলকে ও তাহার নজরানা কবুল করিলেন না; এই জন্য কাবিল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ন হইল। তাহাতে মাবুদ কাবিলকে বলিলেন, তুমি কেন রাগ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ন হইয়াছে? যদি সদাচরণ কর, তবে কি কবুল হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে গোনাহ্ দরজায় গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, কিন্তু তোমাকে তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিতে হইবে। আর কাবিল আপন ভাই হাবিলের সহিত আলাপ করিল, পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কাবিল আপন ভাই হাবিলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে কতল করিল। পরে মাবুদ কাবিলকে বলিলেন, তোমার ভাই হাবিল কোথায়? সে জওয়াব দিল, আমি জানি না; আমার ভাইএর হেফাজতকারী কি আমি? তিনি বলিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভাইয়ের রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে ক্রন্দন করিতেছে। আর এখন, যে ভূমি তোমার হাত হইতে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণের জন্য আপন মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি লানতী হইলে। ভূমিতে কৃষিকাজ করিলেও তাহা আপন শক্তি দিয়া তোমার খেদমত আর করিবে না; তুমি দুনিয়াতে পলাতক ও ভবঘুরে হইবে। তাহাতে কাবিল মাবুদকে বলিলেন, আমার অপরাধের ভার অসহ্য। দেখ, আজ তুমি ভূতল হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলে, আর তোমার দৃষ্টি হইতে আমি লুক্কায়িত হইব। আমি দুনিয়াতে পলাতক ও ভবঘুরে হইব, আর আমাকে যে পাইবে, সেই কতল করিবে। তাহাতে মাবুদ তাহাকে বলিলেন, এই জন্য কাবিলকে যে কতল করিবে, সে সাত গুণ প্রতিফল পাইবে। আর মাবুদ কাবিলের জন্য একটি চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তাহাকে পাইলে কতল করে।

পরে কাবিল মাবুদের খিদমত হইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্বদিকে নোদ দেশে বাস করিল। আর কাবিল আপন স্ত্রীর কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইয়া হনোককে প্রসব করিল। আর কাবিল একটি নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক রাখিল। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'পয়দায়েশ,' ৪: ১–১৭)

ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত রাঙ্গাইবার কাহিনী হিসাবে আমরা সচরাচর এই গল্পের ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। ইহাতে কিন্তু কয়েকটা জিজ্ঞাসার জবাব মিলিতেছে না। যেমন মাবুদ কী কারণে কাবিলের নজরানা গ্রহণ করিলেন না? আর আর দশ শাস্তির জায়গায় মাবুদ কেন তাঁহাকে শুদ্ধ পলাতক ও ভবঘুরে হইবার দণ্ড বিধান করিলেন? করিলেনই যদি তবে আবার তাঁহাকে নতুন নগর পত্তন করিবার তৌফিকই বা কেন দিলেন?

বিশেষ জ্ঞানীরা বলিতেছেন, এই পুরাণের সহিত আগের জমানার আরো একখানা পুরাণ মিশিয়া একাকার হইয়াছে। তাই আমাদের বোধের এই গণ্ডগোল। প্রথমে ছিল কাবিলের নগর-পত্তনের গল্প। সেখানে তিনি বীর বা

নায়ক ছিলেন। পরে ভ্রাতৃহত্যার গল্পটা জোড়া দিয়া তাঁহাকে পবিত্র ভূমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার ঘটনাকে বৈধতা দেওয়া হয়।

খেয়াল করিলে আরো দেখিবেন, কাবিল প্রথমে কৃষক ছিলেন। কিন্তু হিব্রু ভাষায় ক়াবিল শব্দের উচ্চারণ 'কায়িন' (Kayin), যাহার অর্থ কামার বা ইংরেজিতে যাহাকে বলে Smith, অর্থাৎ কারিকর। আর হাবিল শব্দের হিব্রু উচ্চারণ হেবেল বা এবেল (Hebel)। ইহার অর্থ 'এক ঝাপটা বাতাস'। পেশায় তিনি মেষপালক, অর্থাৎ ভবঘুরে। এই ঘটনায় গৃহস্থ ভবঘুরে হইল আর ভবঘুরে হইল গৃহস্থ। এক কথায় বিপ্লব ঘটিল। (বেলৎস ১৯৮৩: ৫৬–৫৭, ৬৮–৭০; আসিমব ১৯৮১: ৩৩–৩৪; *ইনসায়িট* ১৯৮৮; *জোনডেরবান* ১৯৬৭)

ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারকে যাঁহারা এতদিন নিছক রতিগ্রস্ত কবি কিংবা অমঙ্গলবোধের নবি ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন তাঁহারা বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদকে তিনি কতখানি সমার্থক মনে করিতেন। উদাহরণ দিয়া বলিব, বুদ্ধদেব বসু কিংবা আবু সয়ীদ আইয়ুব যদি জার্মান মহাত্মা বাল্টার বেনিয়ামিনের (Walter Benjamin) লেখা দুই-চারি পাতা পড়িবার সুযোগও পাইতেন কি লঙ্কাকাণ্ডটাই না হইত! (বেনিয়ামিন ২০০৬/খ: ৯; বেনিয়ামিন ১৯৯৭: ২২) আমাদের আলোচ্য 'হাবিল ও কাবিল' কবিতায় একই বোদলেয়ারকে দেখিতেছি অনশনবন্দি দুনিয়ার বঞ্চিত লাঞ্ছিত সর্বহারার কবি আকারে।

এক্ষণে একটুখানি বিশদ করিতেছি।

এই যুগের সাম্রাজ্যবাদ যে বিষাদসিন্ধুর অপর নাম সেই বিষাদসিন্ধুর তীরে যাহারা ভবঘুরে, পলাতক অর্থাৎ যাহাদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহাদেরই নাম প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা। এই সর্বহারাকে কবিজনোচিত কায়দায় 'শ্রেণী' না বলিয়া বোদলেয়ার বলিয়াছেন 'জাতি'।

কার জাতি আর? খোদ কাবিলের জাতি। মাবুদ এই কাবিলের জাতির উপর এতখানি নাখোশ কেন? বোদলেয়ারের বিচারে এই বিরোধ ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধমাত্র নহে। এই বিবাদ বোদলেয়ার বলিবেন দুই শ্রেণীর বিবাদ, যদিও তাঁহার ব্যবহৃত শব্দটি 'দুই জাতির বিবাদ'। এই প্রবন্ধে ইহাকেই আমি বলিয়াছি দুই বিশ্বের বিবাদ। শার্ল বোদলেয়ার লিখিয়াছেন:

হাবিলের জাত, ঘুমাও, পিয়ে যাও আর খাও
দিলখোশ মাবুদের মুখে মিঠা হাসি

কাবিলের জাত, দাও গড়াগড়ি দাও
পচা কাদায়, আর দাও নিজের গলায় ফাঁসি।

এই স্থলে দুই জোড়া মাত্র উদ্ধৃতি লিখিলাম। এই রকম ১৬ জোড়া কথা তিনি লিখিয়াছেন এই কবিতায়। এই যুগ সর্বহারার যুগ। যাহার নিজের গতর ছাড়া বেচিবার আর কিছুই নাই তাহাকেই সর্বহারা বলে। সেই সর্বহারাকেই বোদলেয়ার 'কাবিলের জাত' জ্ঞান করিয়াছেন।

হাবিলের জাত, ঘুমাও, পিয়ে যাও আর খাও
দিলখোশ মাবুদের মুখে মিঠা হাসি

কাবিলের জাত, দাও গড়াগড়ি দাও
পচা কাদায়, আর দাও নিজের গলায় ফাঁসি।

পুরা কবিতাটি আমি এই বইয়ের শেষে, সংবর্ধনা অংশে, জুড়িয়া দিয়াছি। (দেখুন, সংবর্ধনা ২) এইখানে শুদ্ধ এইটুকু বলিয়া রাখি, শেষমেশ বোদলেয়ার তাঁহার রায় ঘোষণা করিলেন। বলিলেন: হাবিলের জাত, একদিন তোদের মৃতদেহ এই দুর্গন্ধময় মাটির সার হইবে। আর কাবিলের জাতের কর্তব্য তাহাতেই শেষ হইবে না। যেদিন কৃষকের কাঠের ঠেলা লাঙ্গল আসিয়া হাবিলের জাতির তলোয়ার গুড়াইয়া দিবে সেদিন তাঁহাদের লজ্জা লুকাইবার জায়গাও থাকিবে না। আর কাবিলের জাতিকে তিনি এই উপদেশ দিলেন: যাও, উর্ধ্বলোকে আরোহন কর, আর খোদ মাবুদকে ছুঁড়িয়া মার এই দুনিয়ায়! (বোদলেয়ার ১৯৮৬: ২২৯–৩০)

৩

এক্ষণে আমার আলোচ্য দ্বিতীয় কবিতা। বাংলাদেশের শামসুর রাহমান তাঁহার *দুঃসময়ে মুখোমুখি* (১৯৭৩) বইয়ের একটা কবিতার নাম রাখিয়াছেন 'স্যামসন'। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতার অষ্টম সংস্করণেও পাওয়া যাইতেছে। শামসুর রাহমান শুদ্ধ গ্রিক পুরাণের সেবাকবি—ইহা পুরাপুরি সত্য নহে। এয়াহুদি পুরাণেও তাঁহার অনাস্থা নাই। 'স্যামসন' কবিতা ইহারই প্রমাণ। তবে এই এয়াহুদি কাহিনীর পাঠ তিনি ১৭ শতকের ইংরেজ মনীষী ও বিপ্লবী জন মিল্টনের হাত হইতে লইয়াছেন বলিলে বেশি বলা হইবে না। (মিল্টন ১৯৮২; আসাদ ২০০৭: ৭৫)

এই রকম লওয়ায় তিনি কখনোই কাঁচা ছিলেন না। প্রমাণস্বরূপ তাঁহার অনূদিত ফরাসি কবি পল এলুয়ারের (Paul Eluard) বিখ্যাত 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়। কয়েক পঙ্‌ক্তি বাদ দিলে অনুবাদকর্মটাকে মোটামুটি বিশ্বস্তই বলা চলিত।

ইংলন্ডের ১৭ শতকিয়া গোঁড়া (Puritan) খ্রিস্টান বিপ্লবী কবি জন মিল্টন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিশেষ পুরাতন নিয়মের বিধান কেমন করিয়া আপন করিয়া লইলেন তাহা লইয়া অনেক কথা হইয়াছে। শিমশোনকে এয়াহুদি জাতির মুক্তিদাতা বীরযোদ্ধা জ্ঞান করিয়াই তো কবি মিল্টন তাঁহার সহিত আপন আত্মা মিশাইয়াছেন। এয়ুরোপের সাহিত্যে ইহার ভাব অনেক দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে। 'গাজায় চক্ষুহীন' (*Eyeless in Gaza*) হৃতবল বীরের হইয়া আমাদের কবি শামসুর রাহমানও কম বিলাপ করেন নাই:

> ... এখন আমার কাজ
> ঘানি ঠেলা শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের। পদে পদে
> কেবলি হোঁচট খাই দিন-রাত্রি, তোমরা অটল মসনদে।
> (রাহমান ২০০৯: ১০৬; দেখুন, সংবর্ধনা ৩)

লন্ডনে রাজা ২ নং চার্লসের শাসনাধীন জন মিল্টন নিজেকে 'গাজায় চক্ষুহীন দাসমণ্ডলে যাঁতাপেষা' স্যামসনের নিকটাত্মীয় ভাবিবেন, ইহাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু স্যামসন যে আত্মহত্যা করিয়া বিজয় লাভ করিল সেই আত্মহত্যায় নির্বিকার থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

এই প্রশ্নের মুখে লা-জওয়াব জনৈক স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী ইংরেজ পণ্ডিত এক পর্যায়ে বলিয়াই ফেলিলেন: 'শেষ পর্যন্ত মিল্টন বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি জিতিয়াছেন—এই সত্যে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জিত নীতিশক্তি আর বুদ্ধিশক্তিরই জিত। *হারানো বেহেস্ত* (*Paradise Lost*) মহাকাব্যের কবি পরিচয়ে তাঁহার ফিরতি প্রতিষ্ঠার ঘটনায় এই সত্যই কায়েম হইয়াছে।' (প্রিন্স ১৯৮২: ১৩)

মিল্টনের 'বিবাদী স্যামসন' (Samson Agonistes) কবিতাটি কি গ্রিক ট্রাজেডি বা বিধির বিধানের সহিত তুলনীয়?[১] উত্তরে ২০ শতকিয়া ইংরেজ মহাত্মা স্যার রিচার্ড জেব (Sir Richard Jebb) কহিয়াছিলেন: কদাচ নহে। স্যামসনের চরিত্র খারাপ ছিল মানে তাঁহার চরিত্রে নারীদোষ বিশেষ ছিল। এই কথা তাঁহার স্বজাতীয় এয়াহুদিরাই বলিতেন। তাই একবার তাঁহারা তাঁহাকে হাত পা বান্ধিয়া শত্রু ফিলিস্তিনিদের হাতে সঁপিয়াও দিয়াছিল।

ইহাকে লোভ-লালসার দোষও বলা চলিত। সাধারণ খ্রিস্টান লোকজন তাঁহার দুর্ভোগের সহিত সচরাচর এই চরিত্রদূষণকে কারণ বলিয়া যোগ করেন। আমরা তাহাতে কি করিয়া আপত্তি করিব? কিন্তু জন মিল্টন তো এই

দিকটা উপেক্ষাই করিলেন। তা করুন। স্যামসনের করুণ মৃত্যুসংবাদ বহিয়া আনিবার পর দণ্ডায়মান সাংবাদিকের সমক্ষে কোরাস গ্রিক কায়দায় গাহিলেন:

Chorus

O dearly-bought revenge, yet glorious!
Living or dying thou hast fulfill'd
The work for which thou wast foretold
To *Israel*, and now ly'st victorious
Among thy slain self-kill'd,
Not willingly, but tangled in the fold
Of dire necessity, whose law in death conjoin'd
Thee with thy slaughter'd foes in number more
Than all thy life had slain before.

(Milton, 1982: p. 54, ll. 1660–68)

নিচে ইহার খসড়া বাংলা তর্জমা দিতেছি:

চড়াদামে কেনা প্রতিশোধ তুমি তবু গরীয়ান!
জীবিত কি মৃত করিয়াছ পালন
কর্তব্য তোমার, তোমার অপেক্ষায়
ছিল *এসরায়েল* এতদিন, আর এখন বিজয়ে শুয়ে আছ
আপন হাতের মৃতের সঙ্গী তুমি আত্মঘাতী
ইচ্ছায় কখনো হও নাই, নিদারুণ দরকারের ফাঁদে
পড়িয়াছ। ইহারই বিধানে জীবৎকালে যত না
করিয়াছ হত্যা তাহার অধিক করিলে
হত তুমি মরণের ক্ষণে
আর সেই শত্রুসঙ্গে তোমাকেও মাখিল এই বিধি।

কোরাসের গলার ঘরে এই স্বর কার স্বর? কে সে জন? জন মিল্টন না ঈশ্বর? একটু পরই আমরা দেখিব এই স্থির অবিনশ্বর স্বর আর কাহারো নহে, খোদ স্বাধীনতা-ব্যবসায়ীর স্বর ইহা। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে দুনিয়া আবারও শুনিল সেই স্থির স্বর। শামসুর রাহমান তাই আজও অমর।

বর্তমান যুগের এসরায়েল রাষ্ট্রে শিমশোন ওরফে স্যামসনকে দুর্ধর্ষ এয়াহুদির উদাহরণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। একালের মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি এসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের নাম রাখা হইয়াছে 'স্যামসন অপশন' (The Samson Option) বা স্যামসন কৌশল।

শামসুর রাহমান কোনদিন এই কথা জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিতে আমার বড় সাধ জাগে। (আসাদ ২০০৭: ৭৬)

ইহার মানেও আর কিছুই নহে: 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' দুঃখের মধ্যে, নিজেকে মারিয়া হইলেও শত্রু নিধন করিবার কৌশলের পারমাণবিক সংস্করণের নামই এসরায়েল রাখিয়াছে স্যামসন কৌশল। হাতের চেটোর মতন ছোট্ট এক টুকরা ফিলিস্তিন নামক দেশে এই বোমা ফাটাইলে আপন শত্রুর সঙ্গে খোদ এসরায়েলও ধ্বংস হইবে। এই অকল্পনীয় বর্বরতার সভ্য নামই দাঁড়াইতেছে দি স্যামসন অপশন।

বলা হয়তো বাহুল্য, এই নাম বা এই চিন্তার জন্ম মোটেও ২০০১ সনের ১১ সেপ্টেম্বরের পরে নহে, খানিক আগেভাগেই বটে। ১১ সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতী বোমারুদের আমরা যদি সঙ্গত কারণেই 'সন্ত্রাসবাদী' বলিয়া থাকি তবে স্যামসনকে আমরা কোন উপাধি দান করিব?

আজিকালি এসরায়েল রাষ্ট্রের পাঠ্যাপাঠ্য সকল বইতে স্যামসনকে স্বাধীনতা সংগ্রামী কিংবা মুক্তিযোদ্ধা বলিয়াই প্রশংসা করিতে দেখা যায়। শুদ্ধ এসরায়েল কেন, খোদ বিপ্লবী ইংরেজ কবি অন্ধ জন মিল্টনও শেষ বয়সে নিজেকে স্যামসন ভাবিতেন। বন্দি স্যামসনের চক্ষুযুগল শত্রু ফিলিস্তিনিরা উপড়াইয়া লইয়াছিল। আর মিল্টনও অন্ধ হইয়া গেলেন। মিল্টনের পথ ধরিয়া শামসুর রাহমানও কি তাহাই করিলেন? তাঁহারও চক্ষু গেল গেল! ১৯৭৩ সন নাগাদ তিনিও প্রকাশ করিলেন বীরগাথা 'স্যামসন'। ততদিনে বাংলাদেশ বিদেশি বন্দিশিবির হইতে স্বাধীন স্বদেশ হইয়া দাঁড়াইল। কবি গাহিলেন:

> ক্ষমতামাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা,
> তোমাদের হোমরা-চোমরা
> সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?
> মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,
> দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি? কত শক্তি
> সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেওতো আছে জানা। রক্তারক্তি
> যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
> করুক যতই পাত্র-মিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।
> (রাহমান ২০০৯: ১০৫-০৬)

স্যামসন শব্দটির হিব্রু মূল উচ্চারণ 'শিমশোন'। অর্থ 'সূর্যের সন্তান' বা ইহার কাছাকাছি কিছু। এসরায়েলি পুরাণ অনুসারে ফিলিস্তিনের একাংশের সমুদ্রতীরে যখন প্রাচীন ফিলিস্তিনি জাতি বসবাস করিত তখনো এয়াহুদি

জাতির মধ্যে রাজতন্ত্র তথা রাজার পদই চালু হয় নাই। তখন দেশনেতাদের কাজি (হিব্রু ভাষায় 'সোফেতিম') উপাধি দেওয়া হইত। আমাদের শিমশোন ওরফে স্যামসন ছিলেন কাজিগণের মধ্যে সর্বশেষ বা ১২ নম্বর। (আসিমব ১৯৮১: ১৪৮–৫৩; *ইনসায়িট* ১৯৮৮; *জোনডেরবান* ১৯৬৭)

জন মিল্টন কিংবা শামসুর রাহমান উভয়েই শিমশোনকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই দেখিয়াছেন। ১৭ শতকের ইংলন্ডে রাজতন্ত্রবিরোধী বিপ্লবের পরাস্ত অর্থাৎ বেহাত অবস্থায়, পুনরুদ্ধারপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের অধীনে—১৬৬৭ সনের পর কোন এক সময়—মিল্টন তাঁহার 'বিদ্রোহী স্যামসন' লিখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার *ফিরিয়া পাওয়া বেহেস্ত* (*Paradise Regained*) কাব্যগ্রন্থের তপশিল আকারে প্রথম ছাপা হয়।

শামসুর রাহমানও তাঁহার 'স্যামসন' কবিতা লিখিয়া থাকিবেন ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে বা সামান্য পরে।[২] আমাদের দুই কবির এক চিন্তার মধ্যে একটা সমস্যা কিন্তু থাকিয়াই যাইতেছে। ইহার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমি আমার কর্তব্য পালনের চেষ্টা করিব।

৪

শামসুর রাহমান যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তো জিজ্ঞাসা করিতাম: ২০০১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ইয়র্ক শহরে বিমানযোগে হামলা করিয়া যাহারা ৩,০০০ মতন মনুষ্য মারিয়া ফেলিল আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও ছাই হইয়া গেল তাহাদিগকে আপনি কি স্বাধীনতা সংগ্রামী বা মুক্তিযোদ্ধা বলিতে রাজি হইবেন? উত্তর উনি কি দিতেন তাহা আপনারা নিঃসংশয়ে আন্দাজ করিতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতাম: শিমশোনকে তবে আপনি কোন যুক্তিতে মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দিতেছেন? তিনিও তো আত্মঘাতী হামলায় একযোগে ৩,০০০ লোক মারিয়াছিলেন। মারেন নাই? অধিক, জীবনকালেও তিনি লোক মারিতেন। ইহা তাঁহার এক প্রকার পেশা ছিল বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে? পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নবিদের কিতাবেও কি একই কথা লেখা নাই? আছে: 'তিনি জীবনকালে যত লোক হত্যা করিয়াছিলেন, মরণকালে তদপেক্ষা অধিক লোককে হত্যা করিলেন।' (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ৩০)

কথাটা মহাত্মা শামসুর রাহমানও আমল করিয়াছেন। 'স্যামসন' কবিতায় স্যামসনের স্বগতোক্তিযোগে আমরা তাই পড়িতে পাই:

আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ
ফেলবো উপড়ে, দেখো কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।
(রাহমান ২০০৯: ১০৭)

শিমশোনের জীবনচরিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বয়ান অনুযায়ী যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারাই তাঁহাকে পুরাদস্তুর 'সন্ত্রাসবাদী' বলিবেন। অথচ শামসুর রাহমান কোথাও ইহার আভাসমাত্র দিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইল না। ইহা কী করিয়া সম্ভব?

সম্ভব—কারণ আমরা যাহা পড়ি তাহা হয়তো পড়ি নেহায়েত শব্দের ঝঙ্কারে, শব্দেরই প্রেমে পড়িয়া। সত্য স্পর্শ করিয়া হাত ময়লা করিব কোন দুঃখে? অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইতে যাইব কেন? এই গুণ শুদ্ধ শামসুর রাহমানের নহে, এই গুণ আমাদের সকলের—আমরা যাহারা কাবিলের জাত হইয়াও হাবিলের অভিনয় করিতেছি তাহাদের সকলের। আমাদের নাম তাই ইংরেজি বাক্যে 'লিবারেল'। লিবারেলের বাংলা সচরাচর করা হয় 'উদারনৈতিক'। আমি সবিনয়ে বলিব: ইহার অনুবাদ করিবেন 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী'। সেই ক্রমে লিবারেলিজম মানে দাঁড়াইবে 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়'।

শামসুর রাহমানও কি তবে লিবারেল অর্থাৎ স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী কবি? দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমাকে হ্যাঁ উত্তরই দিতে হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে—আমাদের বড় দুর্ভাগ্য—এই জাতের কবিরাই প্রধান। তাই তাঁহাদের বাড়ি ঢাকায় হইলেও তাঁহারা প্রথম বিশ্বেরই কবি—তাঁহারা হাবিলের জাত।

শিমশোনের গল্পটা দিয়াই আমি আমার এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সংহার ঘটাইব। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ লিখিতেছেন:

আর শিম্‌শোন তিম্নায় নামিয়া গেলেন, ও তিম্নায় ফিলিস্তিনীদের কন্যাদের মধ্যে একটি রমণীকে দেখিতে পাইলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আপন পিতামাতাকে খবর দিয়া বলিলেন, আমি তিম্নায় ফিলিস্তিনীদের কন্যাদের একটি রমণীকে দেখিয়াছি; তোমরা তাহাকে আনিয়া আমার সহিত শাদী দাও। তখন তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে বলিলেন, তোমার জ্ঞাতিগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত স্বজাতির মধ্যে কি কন্যা নাই যে, তুমি খত্‌নাবিহীন ফিলিস্তিনীদের কন্যা শাদী করিতে যাইতেছ? শিম্‌শোন পিতাকে বলিলেন, তুমি আমার জন্য তাহাকেই আনাও, কেননা আমার দৃষ্টিতে সে মনোহরা। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৪: ১–৩)

বিবাহ করিতে যাইবার পথে তিম্নার আঙ্গুর ক্ষেত্রে শিমশোন একটা যুবা সিংহ দেখিতে পাইলেন। মাবুদের রুহুর জোরে হাতে কিছু না থাকিলেও শিমশোন ছাগলের বাচ্চা ছিঁড়িবার মতন ঐ সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বিবাহের আসরে তিনি বাজি ধরিয়া একটি ধাঁধা বলিয়াছিলেন। ইহার সঠিক উত্তর শুদ্ধ তাঁহার স্ত্রী ছাড়া আর কেহ জানিতেন না। কিন্তু এই ধাঁধার উত্তর তাঁহার হবু স্ত্রীর মুখ হইতে গোপনে জানিয়া লইবার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার হবু স্ত্রীও দোষী ছিলেন। তাই নিরুপায় শিমশোন হার স্বীকার করিয়া লইলেন। আর বিবাহ করিব না বলিয়া আসর হইতে উঠিয়া গেলেন।

ইহার পর ক্রুদ্ধ শিমশোন অস্কিলোন নামক জায়গায় গিয়া ৩০ জন লোককে অকারণে আঘাত করিয়া তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া লইলেন আর সেই বস্ত্র দিয়া ধাঁধার বাজিতে হারিয়া যাওয়ার টাকা পরিশোধ করিলেন। তিনি বউ ফেলিয়া চলিয়া যাইবার পর আর আসিবেন না মনে করিয়া তাঁহার হবু বউকে অন্য একজনের সহিত বিবাহ দেওয়া হইল।

কিছুকাল পর গম কাটার সময় শিমশোন ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গ দাবি করিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল, তিনি যেন স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করেন। তিনি রাজি হইলেন না। পাল্টা এতদিনে স্ত্রী পরস্ত্রী হইয়া গিয়াছে শুনিয়া এক মহাকাণ্ড করিলেন। ধর্মগ্রন্থ লিখিতেছেন:

> পরে শিম্‌শোন গিয়া তিন শত শৃগাল ধরিয়া মশাল লইয়া তাহাদের লেজে লেজে যোগ করিয়া দুই দুই লেজে এক একটি মশাল বাঁধিলেন। পরে সেই মশালে আগুন দিয়া ফিলিস্তিনীদের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে বাঁধা আটি, ক্ষেতের শস্য ও জলপাই গাছের বাগান সকলই পুড়িয়া গেল। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৫: ৪–৫)

ততক্ষণে ক্রুদ্ধ ফিলিস্তিনিরা তাঁহার হতভাগিনী স্ত্রী ও স্ত্রীর পিতা মহাশয়কে আগুনে পুড়াইয়া মারিল। আর শিমশোন তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার স্বজাতি লোকেরা তাঁহাকে বাঁধিয়া ফিলিস্তিনিদের হাতে সমর্পণ করে। বাঁধন দুই গাছা নতুন দড়ি।

> ... তখন মাবুদের রূহ্‌ সবলে তাহার উপরে আসিলেন, আর তাঁহার দুই বাহুস্থিত দুই দড়ি আগুনে পোড়া শণের ন্যায় হইল, এবং তাঁহার দুই হাত হইতে বেড়ি খসিয়া পড়িল। পরে তিনি একটি গাধার চোয়ালের হাড় দেখিতে পাইয়া হাত বিস্তারপূর্বক তাহা লইয়া তাহা দ্বারা হাজার লোককে আঘাত করিলেন। আর শিম্‌শোন বলিলেন, 'গাধার চোয়ালের হাড় দ্বারা রাশির উপরে রাশি হইল, গাধার চোয়ালের হাড় দ্বারা

হাজার জনকে হানিলাম।' (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৫: ১৪–১৬)

শিমশোনের এই আবিল বীরত্বের বন্দনাই শুনি কবি শামসুর রাহমানের অনাবিল কণ্ঠে। আগেই উদ্ধার করিয়াছি কবির কথা:

মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন্,
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি? কত শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেওতো আছে জানা। রক্তারক্তি
যতই কর না আজ,...

(রাহমান ২০০৯:১০৫–০৬)

পাঠিকা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না, তবু বলিব: এই নিবন্ধে হাত দিবার আগে আমি কিন্তু কদাচ খেয়াল করি নাই শামসুর রাহমান নামটির অর্থও প্রকারান্তরে এই শিমশোন ওরফে স্যামসনই। 'দয়াময়ের সূর্য' আর 'সূর্যের সন্তান'—কি এমন দূরত্ব! দূরত্বের মধ্যে ঐ এক মিল্টনই।

ইংলন্ডের পীড়িত অন্ধ কবির দৃষ্টিতে শিমশোন বীর হইবেন সন্দেহ নাই। ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের একজন বাঙালি কবিও সেই দৃষ্টির চক্ষু ধার লইলেন কেন? ইহার পরীক্ষাই আমাদের প্রার্থনীয়।

৫

খ্রিস্টানি পরম্পরায় কাজি শিমশোনকে কিছু পরিমাণে নৈতিক স্খলনের দোষে দোষী করিবার রেওয়াজও আছে। ইহা আমরা কিছু আগেই দেখিয়াছি। শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। দেশবাসী তাহাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধার, বীরশ্রেষ্ঠের সম্মান জানাইল। তাঁহার সন্ত্রাসবাদ লইয়া কেহ বেশি উচ্চবাচ্য করিল না।

আধুনিক ধনতন্ত্রের ধনী দোসর 'স্বাধীনতা-ব্যবসায়' ওরফে লিবারেলিজম। এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীরাও সন্ত্রাসী শিমশোনকে মুক্তিসংগ্রামীর মর্যাদা দিতেছেন। ঘন ঘন—প্রায় বাতিকগ্রস্থের মতন—বেশ্যাগমনের সহিত স্বাধীনতা-ব্যবসায়ের সম্পর্ক একটা থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই সম্পর্ক কী আমরা কিন্তু জানি না। তবে আত্মঘাতী বোমাবাজ ওরফে আদমবোমারুও যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা-ব্যবসায়েরই অন্তর্গত সেই সত্য আমরা এতদিনে অনুধাবন করিতে পারিতেছি। আরব নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী

মহাত্মা তালাল আসাদের একটি বক্তৃতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। (আসাদ ২০০৭: ৬৫–৯৬; দেখুন, প্রবন্ধ ৪)

শিমশোন অমিতবিক্রম বীর এই সত্যে আমার সন্দেহ নাই। সাক্ষী পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কহিতেছেন:

> আর শিম্‌শোন গাজাতে গিয়া সেখানে একটা বেশ্যাকে দেখিয়া তাহার কাছে গমন করিলেন। তাহাতে, শিম্‌শোন এই স্থানে আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া গাজানিবাসীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহার জন্য নগর দ্বারে লুকাইয়া থাকিল, সমস্ত রাত্রি চুপ করিয়া রহিল, বলিল, সকালে দিন হইলে আমরা তাঁহাকে কতল করিব। কিন্তু শিম্‌শোন মাঝরাত পর্যন্ত শয়ন করিলেন, মাঝরাতে উঠিয়া তিনি নগর-দ্বারের শিকলশুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাজু ধরিয়া উপড়াইয়া ফেলিলেন এবং স্কন্ধে করিয়া হিব্রোণের সম্মুখস্থ পর্বত-শৃঙ্গে লইয়া গেলেন। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ১–৩)

শিমশোনের প্রেমের শেষ নাই। তবে এই প্রেমই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শেষ করিল। তাঁহার সর্বশেষ প্রেমিকার নাম দলীলা। পণ্ডিতেরা কহিতেছেন শিমশোন মানে যেমন সূর্য (অর্থাৎ দিবা) তেমনি দলীলা (ওরফে লীলা ওরফে লায়লা) মানেও রাত্রি। (আসিমব ১৯৮১: ২৫১; *ইনসায়িট* ১৯৮৮; *জোনডেরবান* ১৯৬৭)

রাত্রির নিকট সূর্য যেমন দলীলার নিকট শিমশোনও তেমন। একদিন প্রেমিকা দলীলার পীড়াপীড়িতে তিনি ধরা দিলেন। তাঁহার অমিততেজের গোপন কথা ফাঁস হইয়া গেল। শ্রীমতি দলীলা নিজের হাঁটুর উপর তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া লোক দিয়া তাঁহার সাত গুচ্ছ চুল কামাইয়া দিল। শিমশোন দুর্বল হইলেন।

> তাই তিনি মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, তাহাকে বলিলেন, আমার মস্তকে কখনও ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভ হইতে আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নাসরীয় [উৎসর্গিত]; চুল কামাইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্বল হইয়া অন্য সকল লোকের সমান হইব। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ১৭)

তখন ফিলিস্তিনিরা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উঠাইয়া ফেলিল, এবং তাঁহাকে গাজায় আনিয়া পিতলের দুইটি শিকলে বাঁধিল। তিনি কয়েদখানায় যাঁতা পেষণ করিতে লাগিলেন।

শামসুর রাহমান দেখি শিমশোনের দুঃখে তাঁহার চাইতেও বেশি কাতর। কয়েদখানার যাঁতা বন্দির প্রাণের চেয়ে কবির প্রাণকেই যেন বেশি পেষণ করিতেছে। কবি লিখিতেছেন:

আমাকে করেছো বন্দী, নিয়েছো উপড়ে চক্ষুদ্বয়।
এখন তো মেঘের অঢেল স্বাস্থ্য, রাঙা সূর্যোদয়
শিশুর অস্থির হামাগুড়ি, রক্তোৎপল যৌবন নারীর আর
হাওয়ায় স্পন্দিত ফুল পারি না দেখতে। বার বার
কী বিশাল দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি খুঁজে মরি। সকাল সন্ধ্যার
ভেদ লুপ্ত; মসীলিপ্ত ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে চকিতে মন্দার
জেগে উঠলেও অলৌকিক শোভা তার থেকে যাবে নিস্তরঙ্গ
অন্তরালে। এমন-কি ইঁদুরও বান্ধব অন্তরঙ্গ
সাম্প্রতিক, এমন নিঃসঙ্গ আমি নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি; দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের। পদে পদে
কেবলি হোঁচট খাই দিন-রাত্রি, তোমরা অটল মসনদে।
শত্রু-পরিবৃত হয়ে আছি, তোমাদের চাটুকার
উচ্ছিষ্ট-কুড়ানো সব আপনি-মোড়ল, দুস্থ ভাঁড়
সর্বদাই উপহাস করছে আমাকে। দেশবাসী
আমাকে বাসেতো ভালো আজো—যাদের অশেষ দুঃখে কাঁদি হাসি
আনন্দে? পিছনে ফেলে এসেছি কত যে রাঙা সুখের কোরক,
যেমন বালক তার মিষ্টান্নের সুদৃশ্য মোড়ক।
আমাকে করেছো অন্ধ, যেন আর নানা দুষ্কৃতি
তোমাদের কিছুতেই না পড়ে আমার চোখে। স্মৃতি
তাও কি পারবে মুছে দিতে? যা দেখেছি এতদিন—
পাইকারি হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্ষান্তিহীন
রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত
দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ, তাড়িত, ক্লান্ত; ভীত
—এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এ-সব ভীষণ
দৃশ্যাবলি আমূল উপড়ে নিতে আমার দু-চোখের মতন?
দৃষ্টি নেই, কিন্তু আজো রক্তের সুতীব্র ঘ্রাণ পাই,
কানে আসে আর্তনাদ ঘন-ঘন, যতই সাফাই
তোমরা গাও না কেন, সব-কিছু বুঝি ঠিকই। ভেবেছো এখন
দারুণ অক্ষম আমি, উদ্যানের ঘাসের মতন
বিষম কদম-ছাঁটা চুল। হীনবল, শৃঙ্খলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছো দলিত।

(রাহমান ২০০৯: ১০৬–০৭)

তবে কোন কথাই এই দুনিয়ায় শেষ কথা নহে। দিনের সূর্য রাতে অন্ধ হয়, তাহার চক্ষু উঠাইয়া ফেলে। সেই সূর্যই সকালবেলা আবার ফিরিয়া

আসে। ধীর ধীরে তাহার আলোকরশ্মি তেজীয়ান হইতে থাকে। শিমশোনের চুলও গজাইল এবং গজাইলে তাঁহার হৃতশক্তিও আবার ফিরিয়া আসিল।

ইহা 'ক্ষমতামাতাল জঙ্গী প্রভুরা' আমল করেন নাই। ইহাতেই শিমশোন তাঁহার শেষ বীরত্ব (অথবা সন্ত্রাস) দেখাইবার সুযোগ পাইলেন। পরে কোন একদিন ফিলিস্তিনি ভূপালেরা নিজেদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ ও আমোদ প্রমোদ করিতে একত্র হইলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইলে তাঁহারা বলিলেন: শিমশোনকে ডাক, সে আমাদের কাছে কৌতুক করুক।

> ... তাহাতে লোকেরা কয়েদখানা হইতে শিম্‌শোনকে ডাকিয়া আনিল, আর তিনি তাহাদের সামনে কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহারা স্তম্ভ সকলের মধ্যে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল। পরে যে বালক হাত দিয়া শিম্‌শোনকে ধরিয়াছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, আমাকে ছাড়িয়া দাও, যে দুই খামের উপরে ঘরের ভর আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দাও; আমি উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইব। পুরুষে ও স্ত্রীলোকে সেই ঘর পরিপূর্ণ ছিল, আর ফিলিস্তিনীদের সমস্ত ভূপাল সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী পুরুষ প্রায় তিন হাজার লোক শিম্‌শোনের কৌতুক দেখিতেছিল। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ২৫–২৭)

শিমশোন প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'তখন শিম্‌শোন মাবুদকে ডাকিয়া বলিলেন, হে খোদাবন্দ মাবুদ, মেহেরবানী করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে আল্লাহ্, মেহেরবানী করিয়া কেবল এই একটি বার আমাকে বলবান করুন, যেন আমি ফিলিস্তিনীদিগকে আমার দুই চোখের জন্য একেবারেই প্রতিশোধ দিতে পারি।' (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ২৮)

> পরে শিম্‌শোন, মধ্যস্থিত যে দুই খামের উপরে ঘরের ভার ছিল, তাহা ধরিয়া তাহার একটির উপরে ডান বাহু দ্বারা, অন্যটির উপরে বাম বাহু দ্বারা নির্ভর করিলেন। আর ফিলিস্তিনীদের সহিত আমার প্রাণ যাক, ইহা বলিয়া শিম্‌শোন নিজের সমস্ত বলে নত হইয়া পড়িলেন; তাহাতে ঐ ঘর ভূপালগণের ও যত লোক ভিতরে ছিল, সমস্ত লোকের উপরে পড়িল; এইরূপে তিনি জীবনকালে যত লোক হত্যা করিয়াছিলেন, মরণকালে তদপেক্ষা অধিক লোককে হত্যা করিলেন। (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ২৯–৩০)

নির্জলা হত্যা করা কিংবা নিজে হত হইয়া অপরকে হত্যা করা কোনটাই শেষ কথা নহে। আমরা যাহারা এই গল্প পড়িলাম বা শুনিলাম তাহারা পড়িয়া শুনিয়া কী করিব শেষ কথা তাহাই। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের লেখকও এই ঘটনায় আপনকার প্রীতি কিংবা সন্তোষ গোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার চোখও

শিমশোনের ভাইবেরাদরের চোখই। তিনি জানাইতেছেন: 'পরে তাঁহার ভাইয়েরা ও তাঁহার সমস্ত পিতৃকুল নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে লইয়া সরা ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাঁহার পিতা মানোহের গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করিল। তিনি বিশ বৎসর ইস্রায়েলের আচার বিচার করিয়াছিলেন।' (*কিতাবুল মোকাদ্দস*, সনতারিখ নাই: 'কাজীগণের বিবরণ,' ১৬: ২৮) ১৬: ৩১)

৬

আমার এখনো বাকশক্তি গজায় নাই যে বলিব এই ঘটনার অর্থ ষোল আনা বুঝিয়াছি। শিমশোন জীবনকালে অনেক লোককে হত্যা করিয়াছিলেন, আর মরণকালেও তদপেক্ষা অধিক লোক হত্যা করিলেন। এই অধিক—মানে ৩,০০০—লোকের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির লোকই ছিল। অথচ ইহাতে আমাদের স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী কবিদের কেহই সামান্যতম কাঁপিয়া উঠিয়াছেন কি? না মিল্টন না রাহমান—কেহই ওঠেন নাই।

যদি না উঠিয়া থাকেন তবে অনুমান করিব: আত্মঘাতী হত্যাকাণ্ডে, পুরুষ-স্ত্রী নির্বিশেষ হত্যায়—তাঁহাদেরও অনুমোদন মিলিয়াছে বৈ কি! আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি (কেহ কেহ বলিবেন স্বধর্ম বা স্ব-আদর্শ) রক্ষা করিতে হইলে স্বপ্রাণ নিধনও শ্রেয়।

আলায়হেসসালাম হজরত ইসার জন্মের ১,০০০ বৎসর আগের এই মহাত্মা কাজি শিমশোনের আত্মহত্যার বিনিময়ে ফিলিস্তিনি মরিয়াছিলেন অন্যূন ৩,০০০। আর এই ঘটনার আনুমানিক ৩,০০০ বৎসর পর ২০/২২ জন আরব্য বোমাবাজের প্রাণের বিনিময়ে আবারও মার্কিন নারী-পুরুষ মিলিয়া লোক মরিল কিছু কম ৩,০০০। ফিলিস্তিনি বাড়ির বড় খাম ছিল দুইটা, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বড় খাম বা দালানও (Twin Tower) ছিল সেই দুইটাই। আশ্চর্য!

সংখ্যার এই মিল কেন? সত্য বলিতে কাহারও ইহার উত্তর জানা নাই। থাকিলে বলিবেন বলিয়াই আশা করি। ৪, ৭ কিংবা ১৩ প্রভৃতি সংখ্যা কেন অশুভ বলিয়া গণিত হয়? ইহার জবাব খুঁজিতে হইবে ৩, ৬, কিংবা ১২ সংখ্যার মধ্যেই। শিমশোন কেন ১২ নম্বর কাজি তাহা কেহ বলিবেন কি? এখানে ১২ মানে শেষ কাজি।

কিতাবুল মোকাদ্দস গ্রন্থের 'পয়দায়েশ' কিতাবে লেখা হইয়াছে, মাবুদ মোট ৬ দিনে এই দুনিয়া সৃষ্টি করিলেন। কেহ বলিবেন কি তিনি কেন ৫

কিংবা ৭ দিনে করিলেন না? আর ৭ দিনের দিন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ঠিক আছে। কেন ৬ দিনের দিন বা ৮ দিনের দিন করিলেন না?

৩৬৫ কিংবা ৩৬৬ দিনে বৎসর হয়। মাস হয় ২৮, ২৯ কিংবা ৩০ দিনে। ৩১ এমনকি কখনো কখনো ৩২ দিনেও হয়। কেহ বলিবেন কি সপ্তাহ কেন ৭ দিনে হয়? ফরাসি তত্ত্বজ্ঞানী জাক লাকাঁ বলিতেন, অজ্ঞান ৬ পর্যন্ত গুণিতে জানে। কে জানে ইহার কী অর্থ?

৩,০০০ সংখ্যা ৩,০০০ বৎসর পর আবারও ৩,০০০। একবার ৩,০০০ মুক্তিযোদ্ধার, আরবার ৩,০০০ সন্ত্রাসবাদীর। কারণ কী? ইহার উত্তর সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতায় খুঁজিয়া কোথাও পাইলাম না।

এই দুঃখ রহিয়াই গেল।

বিখ্যাত মার্কিন সমালোচনা ব্যবসায়ী ফ্রেডরিক জেমিসন (Fredric Jameson) একদা দাবি করিয়াছিলেন বহুজাতীয় ধনতন্ত্রের জমানায় তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য প্রথম বিশ্বের সাহিত্য হইতে আলাদা প্রকৃতির মাল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে, জাতীয়তাবাদ জিনিসটা মোটেও ভালো মাল নহে তবে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য এক প্রকার না আর প্রকারের জাতীয়তাবাদ ছাড়া চলিতেই পারে না। সুতরাং এই বহুনিন্দিত জাতীয়তাবাদ ব্যবসায়টাকে অবিমিশ্র মন্দ জিনিসও বলা যাইতেছে না।

জেমিসনের কথার মধ্যে সত্য দুই আনাও নাই—তাহা বলিতেছি না। তবে এই পর্যন্তই। আরো আগাইয়া তিনি বলিয়াছেন আসলে এই দুনিয়ায় প্রভু ও ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নাই। সুতরাং দুইয়ে মিলিয়া দুনিয়া একটাই। জেমিসনের এই কথা যদি সত্য হয় তো স্বীকার করিতে হইবে, তৃতীয় বিশ্ব বলিয়া কোন আলাদা মাল নাই।

জার্মান মহাত্মা হেগেলের নাম ভাঙ্গাইয়া জেমিসন বলেন, প্রভু ছাড়া ভৃত্যের যেমন চলিবে না, তেমনি ভৃত্য ছাড়াও প্রভুর প্রভুত্ব কায়েম হইবে না। ইহাই সত্য। কিন্তু এক জায়গায় আসিয়া এই সত্য উল্টাইয়া পড়িতেছে। খোদ হেগেলই এই সত্যের আবিষ্কারক। তিনি বলিয়াছিলেন, এই দুনিয়া প্রভুর এবং ভৃত্যের বটে। কিন্তু শেষ বিচারে এই দুনিয়া শুদ্ধ ভৃত্যেরই। কারণ যে সব করে সে-ই সব জানে। ভৃত্য বা শ্রমিক সব করে তাই সে-ই সব জানে। অলস প্রভুর ভৃত্য ছাড়া চলিবে না। কিন্তু চলিতে ফিরিতে যে জ্ঞান না হইলেই নয় তাহার নাম অজ্ঞান। তাহা শুদ্ধ ভৃত্যের অধিকারে। কারণ সব রসুনের এক গোড়া। সেই গোড়ার নাম মানুষের শ্রম, শ্রমিকশ্রেণীর মেহনত। (জেমিসন ২০০১: ৩৩৫–৩৬)

জেমিসনের মতে তৎকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের গল্প বলিতে একেবারেই অপারগ, একান্তই অক্ষম। ব্যক্তির কথা বলিতে বলিতে সে অজান্তে কেবল জাতির গল্পই বলিয়া বসে। উদাহরণের ছলে তিনি চিনের মহান লেখক লু সুন (Lu Xun) আর সেনেগালের সেম্বেনে ওসমানের (Sembene Ousmane) কথা পাড়িয়াছেন। আমরা ফরাসি শার্ল বোদলেয়ার আর বঙ্গীয় শামসুর রাহমানের দৃষ্টান্তযোগে দেখাইলাম জেমিসনের বক্তব্য সত্য না-ও হইতে পারে। তাঁহার বিশ্ববিভাজন, 'তিন দুনিয়া পৃথক্‌করণের তত্ত্ব' বাসি হইয়াছে। ইহা অজ্ঞান হইলে আরো ভয়াবহ। বর্ণবাদের গাঢ় প্রলেপ তাহার গায়ে লাগিয়াছে।

পাক-ভারতীয় ধুরন্ধর এজাজ আহমদ (Aijaj Ahmad) লিখিয়াছেন, একই কারণে কোন দেশের সাহিত্যকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্বের বলিয়া আলাদা করাটা বর্ণবাদের অর্থাৎ পুরাতন উপনিবেশবাদের জের। জেমিসন মার্কিন জাতীয়তাবাদীর মতন লিখিলেও লোকে ভাবে তিনি বুঝি মার্কস ব্যবসায়ীও বটেন। এজাজ আহমদ তাঁহার মুখোশ কিছু পরিমাণে আলগা করিয়া দিয়াছেন। (আহমদ ১৯৯৫: ৯৫-১১২)

দুনিয়ার সকল দেশের ভাষাতেই দুই বিশ্বের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। আমেন।

....

জাতীয় কবিতা পরিষদের সেমিনারে পঠিত
'জাতীয় কবিতা উৎসব,' ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য

§ ৬

আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের আগাম ফলাফল

জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার (প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার) আইনের বিধান অনুসারে গঠিত। তাই জাতির নিয়তি কাঁপানো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে এই সরকারেরও উচিত ছিল জনসাধারণের মত কী যাচাই করে দেখার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা। আফগানিস্তান বা অনির্দিষ্ট অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই দেশের জল, স্থল ও নভোমণ্ডল ব্যবহারে অনুমতিদান এমনই এক নিয়তি কাঁপানো সিদ্ধান্ত। আমাদের সরকার নজিরবিহীন দ্রুততার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যুদ্ধজোটে যোগদানের এই সিদ্ধান্ত সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। (*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* ২০০৮: অনু. ৬৩)

আমাদের আশঙ্কা, সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটায় নাই। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকেই—ইতিহাসে দেখা যায়—অনেক দেশের সরকার জনসাধারণের সমর্থন বা বৈধতা হারাতে বাধ্য হয়। তো কেন এই ঝুঁকি? সরকার নৈতিক অবস্থানের দোহাই দিয়েছে। আমাদের বক্তব্য, এই দোহাই সৎ নয়।

সারা দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষও ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ব্যথিত। কিন্তু এই ঘটনার একমাত্র পরিণতি যুদ্ধ—এই সিদ্ধান্ত পৃথিবীরও নয়, বাংলাদেশের জনগণেরও নয়। যত ন্যূনতম পন্থায় হোক, আমাদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজোটে জড়িত করার আগে দেশের মানুষের মনোভাব (সেন্টিমেন্ট) কী ভেবে দেখা উচিত ছিল নিশ্চয়। কিন্তু সরকার ও সরকারের অনুমোদক রাজনৈতিক (প্রধান) দলগুলি তা করে নাই।

এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা মনে করি—এই বিষয়ে জনমত সরকারি মতের অনুসারী নয়। শঙ্কার অন্য কারণও আছে। যুদ্ধ 'দীর্ঘস্থায়ী' হলে সাধারণের মধ্যে বিরাজমান ভিন্নমতই প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেবে। দেশের দায়িত্বশীল বুদ্ধিমানদের উচিত এই বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা। অন্ধ হলেই কিন্তু প্রলয় বন্ধ হবে না। জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিপন্ন করার অধিকার শুদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক কেন, কোন সরকারেরই নাই।

১

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স (Thomas Hobbes) যুদ্ধের সঙ্গে খারাপ আবহাওয়ার একটা তুলনা কেটেছিলেন। হব্‌স বলেছিলেন যুদ্ধ মানে মাত্র ঘটনা নয়, আবহাওয়া। 'সময়' যুদ্ধে একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

হব্‌সের উপমা অনুসারে, এক পশলা বৃষ্টি হলেই আবহাওয়া খারাপ হয় না। যেদিন থেকে আকাশে মেঘ জমতে থাকে, হাওয়া দম মেরে যায় সেদিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ হল বলা যায়। যুদ্ধও তেমনি। যখন দুই বিবদমান পক্ষের উভয়কে ঠাণ্ডা করার মত কোন মধ্যস্থ শক্তির অস্তিত্ব থাকে না তখনই বলা যায় যুদ্ধ শুরু হল। দার্শনিকের ভাষায়:

> শুদ্ধ খণ্ড খণ্ড লড়াই বা সংঘাতকেই যুদ্ধ গণ্য করা হয় না। যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসার ইচ্ছাটা যখন থেকে পরিষ্কার ব্যক্ত হয়—সময়ের সেই পরিসরের সবটুকুকেই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া যায়। যুদ্ধের সংজ্ঞার মধ্যেই এই 'সময়' বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত। হব্‌স ১৯৯৬: ৮৮)

এই সংজ্ঞা অনুসারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করেই দিয়েছে। এখন আমরা শুদ্ধ অধীর হতে পারি—এর শেষ কোথায়?

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মত ঘটনায় 'মানুষ' আদিম অনুভূতি ও আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। এটাই 'স্বাভাবিক'। কিন্তু অনুভূতির আগুনে যুদ্ধের আহুতি না দিয়ে শুভবুদ্ধির পতাকা ওড়াতে থাকাই তো সত্যের পরীক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যুদ্ধমুখী নীতি শুভবুদ্ধির পতাকা মাটিতে নামানোর তেমন আর বাকি রাখে নাই। মার্কিন সরকারের বর্তমান নীতিকে অধ্যাপক এডোয়ার্ড সায়িদ মার্কিন মহাকবি হারমান মিলভিলের *মবি ডিক* গদ্যকাব্যের

নায়ক তিমি মাছের বিরুদ্ধে প্রতিনায়ক ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধ-পরায়ণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। (সায়িদ ২০০১)

আমরাও এই তুলনা যথার্থ মনে করি। সেই সঙ্গে আমরা এটুকু যোগ করতেও ভুলি না: মবি ডিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আহাব জয়ী হন নাই। শুদ্ধ তাঁর নিজেরই নয়, তিমিশিকারী দলসুদ্ধ 'পেকুড' জাহাজেরও সাগর সমাধি হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরে।

সারা পৃথিবীতে তিমি এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী বটে। এই ফলাফল নিশ্চয় অকারণে হয় নাই। বিশেষত, উনিশ শতকে তিমি শিকারের ব্যবসা ছিল খুবই বাড়ন্ত। মার্কিন দেশের উত্তর-পূর্বোপকূলের বিভিন্ন শিকার কেন্দ্রের এককেন্দ্র—নান্টাকেট—থেকে ক্যাপ্টেন আহাবের জাহাজও তিমি শিকারে বেরুত। তিমির তেলে জ্বলত সভ্যতার প্রদীপ। এই ছিল প্রধান আকর্ষণ।

এ রকম এক অভিযানে 'মবি ডিক' নামে পরিচিত এক সাদা স্পার্ম তিমির কামড় খেয়ে একটা পা হারান ক্যাপ্টেন আহাব। তারপর থেকে প্রতিশোধের নেশায় তিনি 'পাগল' হয়ে যান। আহাবেরই আপন জবানিতে শুনি: 'আই অ্যাম ডেমোনিয়াক, আই অ্যাম ম্যাডনেস ম্যাডেন্ড।' অর্থাৎ 'আমি শুদ্ধ পাগল নই, আমি দানব, উন্মত্ত প্রমত্ততা আমি।' (মেলভিল ১৯৮৮: ১৭১)

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই কথিত অশুভ শক্তি ওরফে তিমি মাছের পিছনে তিনি দুনিয়ার তাবৎ জলসীমার মধ্যে ঘুরতে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে তাঁর বুকে। শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এক দূর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে মবি ডিকের সঙ্গে মোলাকাত হয় ক্যাপ্টেন আহাবের। পর পর তিন দিন আক্রমণ করেও তিনি বধ করতে ব্যর্থ হন মবি ডিককে। আক্রমণের তৃতীয় ও শেষ দিনে পলায়নরত তিমির গায়ে হার্পুন গেঁথে দিতে সক্ষম হন কাপ্তেন আহাব।

সেই আক্রমণ ছিল আহাবের জন্যও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু ক্ষিপ্ত আহাব কোন যুক্তি মানবেন না। তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তিমি বধ—প্রতিশোধ গ্রহণ। শেষ মুহূর্তের একটু আগে, আহাবের শিকারসঙ্গী সঙ্গী অফিসার স্টারবাক তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন: 'ফিরে আসুন।' স্টারবাকের যুক্তি—'মবি ডিক নিজের প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, সে তো আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে না, পাগলপারা আপনিই তাকে অতিষ্ঠ করছেন।' (মেলভিল ১৯৮৮: ৫৭৭)

কিন্তু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতই বলা চলে—যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।

মবি ডিক শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ায়। জাহাজ আক্রমণ করে বসে। এই দৈত্যাকার সাদা তিমির মাথার আঘাতে 'পেকুড' জাহাজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয় ধীরে ধীরে। 'পাঁচ হাজার বৎসর আগে সমুদ্রের বিশাল ফেনা যে রকম গড়িয়ে গড়িয়ে যেত জাহাজটিও তেমনি গড়িয়ে যেতে শুরু করল।' (মেলভিল ১৯৮৮: ৫৮২)

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পরিচিত হারমান মেলভিল এই কাহিনী প্রকাশ করেন ১৮৫১ ইংরেজি সনে। কোন কোন বুদ্ধিমান সমালোচক তখন তখনই ধরতে পেরেছিলেন মবি ডিকের গল্প যেমন তিমি শিকারের একটা বাস্তব আখ্যান তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধিষ্ণু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীকী কাহিনীও। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্পেনের কলোনি ফ্লোরিডা আর মেহিকো দেশের খণ্ডাংশ টেকসাস অঞ্চল কেড়ে নিয়েছে।

ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধ-পরায়ণতা শেষ পর্যন্ত নিজের এবং নিজের জাহাজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। মেলভিল এই সাবধানবাণী নিজের দেশবাসীর গোচরে আনার জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন।

২

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন আহাব পৃথিবীকে যে চোখে দেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃশ্রেণী পৃথিবীকে সেই চোখেই দেখছেন। আহাব দুনিয়ার সব বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক ভাগে কালো, অন্ধকার, মন্দ—এক কথায় 'অশুভ'। অন্য ভাগে সাদা, আলো, ভালো—এক কথায় শুভ। আহাবের বিচারে সমুদ্রের তিমি সেই অশুভের আর তিনি নিজে শুভের মূর্তি।

অন্তর্ভেদী দ্রষ্টা মেলভিল তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন না। মেলভিল দেখিয়েছেন, বেচারা তিমির নামে হিংস্রতা ও মৃত্যুপরায়ণতার যে বদনাম আহাব সাহেব রটিয়েছেন আসলে তার বেশির ভাগ আহাবের নিজেরই গুণ। জীবন—মেলভিলের চোখে—অতখানি বিশুদ্ধ সাদায়-কালোয় বা শুভে আর অশুভে বিভাজনযোগ্য নয়। হিংসা ও প্রতিশোধ আহাবের—অর্থাৎ লোভাতুর অহঙ্কারী মানুষের—মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূষণ।

আহাব সেই ভূষণ সমুদ্রের তিমির গায়ে চড়িয়ে প্রসাদ লাভ করেছেন। তাঁর একটা পা কর্তন করার অপরাধ মবি ডিক করেছে—এই কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আহাবের পক্ষেও এই কথা ভাবা সম্ভব হয় নাই যে, এই পদকর্তন

ব্যাপারটি ঘটানোর জন্য মবি ডিক ডাঙায় উঠে আসে নাই। আহাবই তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করতে মাঝ সমুদ্রে হার্পুন হাতে ছুটে গিয়েছিলেন।

আহাবের শিকারী জাহাজ ডোবার কথা আমরা জেনেছি মেলভিলের মুখপাত্র এসমায়েলের মুখে। ঐ জাহাজডুবির একমাত্র সাক্ষী, একমাত্র জীবিত নাবিক, এই এসমায়েল। মবি ডিকের ভাগ্যে এরপর কী ঘটেছিল সেই কাহিনী আর আমাদের জানার সুযোগ হয় নাই। সামুদ্রিক তিমির কোন কোন প্রজাতি আজ যে বিলুপ্তপ্রায় সে ঘটনাই গল্পে অকথিত অংশ বলে দিচ্ছে। সব গল্পই কখনো না কখনো শেষ হয়।

আহাব তাঁর খালাসিদের বোঝানোর কোশেশ করেছিলেন: মবি ডিকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই। মেলভিল দেখিয়েছেন, খোদ আহাবই অশুভের প্রতিমূর্তি। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও আর আর নেতা তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধর্মীয় পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। 'অশুভ' ও 'ক্রুসেড' শব্দ দুটি খুব ঘন ঘন প্রচার করা হচ্ছে। মেলভিলের সন্দেহই কি তাহলে সঠিক? এ অশুভ কি যুক্তরাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরীণ অশান্তির অপর নাম? হয়তো তাই।

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বলছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ সে রকম 'অশুভের বিরুদ্ধে শুভের যুদ্ধ' যদি না হয়, তো আমাদের সরকার কি তাঁর জাতীয় স্বাধীনতা সমর্পণের নীতি পরিবর্তন করবেন? আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা এখন উত্তরের দাবি নিয়ে হাজির।

সন্ত্রাস ও যুদ্ধ দুইটাই রাজনীতির পরিবর্ধিত সংস্করণ। রাজনীতির প্রশ্নকে শেষ পর্যন্ত বিচার করতে হবে আমাদের রাজনীতির আলোকেই। আমরা—সারা পৃথিবী জুড়ে—আজ যে রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সে রাজনীতি শুভ ও অশুভের নয়। এ যুদ্ধ খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের সঙ্গে এসলামি প্রাচ্যের নয়। এ রাজনীতি শেষ বিচারে প্রভু ও ভৃত্যের।

পৃথিবী যে এখন আরো বেশি করে প্রভু ও ভৃত্যে বিভক্ত সেই সত্য চাপা দিয়ে আমরা সন্ত্রাসের ব্যাকরণ বা যুদ্ধের অভিধান কোনটাই পড়তে পারব না। আরো যুদ্ধ, আরো মৃত্যু, আরো হত্যার পরও রাজনীতি থাকবে।

মনুষ্য সমাজে প্রভু ও ভৃত্যের, মালিক ও দাসের উদ্ভব হল কী করে? মানুষ ঠিক যেভাবে তিমি শিকার করে ঠিক সে ভাবে দাস শিকার করে না। বনের পশুকে গৃহস্থ মানুষ যেভাবে পোষ মানায়, মানুষ মানুষকে ঠিক সেভাবে পোষ মানায় নাই। দুজন মানুষের মধ্যে লড়াই বাধল। ধরা যাক, কেউ আত্মসমর্পণ করল অর্থাৎ দাস হল। আর অন্যজন হল প্রভু। কিন্তু এতে প্রভুর মনে শান্তি

আসে না। যখন কোন মানুষ আত্মসমর্পণ করে, 'স্বাধীনতা' বিসর্জন দিয়ে শুদ্ধ 'প্রাণ' বাঁচায় তখন সে আর 'মানুষ' থাকে না। সেই অমানুষের স্বীকৃতি—দাসত্ব স্বীকার করা মানুষের—প্রভুর মনতুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ সে প্রভুর সমান নয়। সমানের স্বীকৃতিই শুদ্ধ গণনার যোগ্য।

দাসের কাছে তাহলে কী চায় প্রভু? চায় কাজ। কাজের মধ্য দিয়ে আবার দাসও আপনকার হারানো মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইতিহাস এই অর্থে দাসেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই ইতিহাসের উপর তার মালিকানা নাই। নিজেও সে মানুষ—এই কথার প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাকে বিদ্রোহ করতে হয়। বিদ্রোহ মানে 'হয় দেহ স্বাধীনতা নয় দেহ মৃত্যু'।

কথিত আছে দার্শনিক মহাত্মা হেগেল বলেছিলেন, একমাত্র মানুষই আত্মহত্যার ঝুঁকি নিতে পারে এবং তখনই তার দাসত্বের অবসান ঘটে। তখনই সে 'মানুষ' হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত যে কোন আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে এই সত্যটি হজম করা দরকার।

৩

মানুষ এক ধরনের পশু। তবে অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের ভেদও নির্দেশ করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে, মানুষ 'রাষ্ট্রায়ত্ত পশু' (political animal, *zoon politikon*)।

রাষ্ট্র গড়ে তোলা মানুষের স্বভাব। দার্শনিক হব্‌স এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে, মানুষ রাষ্ট্র গড়ে স্বভাবের কারণে নয়, ঠেলায় পড়ে। কী সেই ঠেলা? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বভাবের জগতে (state of nature) বাস করে, ততক্ষণ মানুষ যুদ্ধাবস্থায় (state of war) থাকে। এ যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে সবার।

স্বভাবের জগৎ নয়, শান্তির অভাবই মানুষের 'রাষ্ট্র সমাজ' গড়ার আসল কারণ। যুদ্ধ মানে তাই সভ্যতার পরাজয়, স্বভাবের জয়। যুদ্ধে মানুষ পশু পরিচয়েই ফিরে যায়। চিরকাল পশু থাকা তার পক্ষে অসম্ভবও। তাই সে সমাজ গড়ে। শান্তির কথা বলে।

হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয় তেমনি সমাজের সব মানুষও সমান নয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে এ কথা যেমন সত্য, উপরের কথাটিও মাত্র তেমনই সত্য। এর বেশি নয়। হব্‌স বলেছিলেন অন্য কথা। তাঁর মতে, মানুষ মাত্রেই সমান। কারণ পৃথিবীর দুর্বলতম মানুষটিও হয় কৌশলে বা সমানমনা অন্যদের সহায়তায় সফলতম মানুষটিকে হত্যা করতে পারে। (হব্‌স ১৯৯৬: ৮৭)

হব্‌সের মতে, মানুষে মানুষে সমতার দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। প্রত্যেক মানুষই মনে করে সে আর সকলের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ। আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান, বেশি বুদ্ধিমান, বেশি বাকপটু লোক আছে—এই কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমার যে ন্যায়-অন্যায় বোধ, শুভ-অশুভ বিচার তা অন্যের চেয়ে উত্তম—এই ধারণা প্রায় সব মানুষেরই। নিজেকে বড় করে দেখার এই প্রবণতা—এই নৈতিক অহঙ্কার—যখন সবারই সমান তখন মানুষ মাত্রেই সমান। এই সিদ্ধান্ত করেন হব্‌স। (হব্‌স ১৯৯৬: ৮৭)

মানুষ তিমি মাছ নয়। কিন্তু কোন কোন তিমি মাছ মানুষের মতন রুখেও দাঁড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এই আদি-পড়না আদৌ পড়বেন কিনা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের পড়না হওয়া উচিত এই বাক্য: আসন্ন আমেরিকার যুদ্ধে আফগানিস্তানের অবস্থান সহুক অশুভের দলে নয়, নিছক ভৃত্যের কাতারে।

....

প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০০১

§ ৭

অন্যায় ও ন্যায়যুদ্ধ

... [T]hat right, as the world goes, is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must.

... দুই খণ্ড দেশ যখন শক্তিতে সমান থাকে না, তখন অধিকার কথাটা অবান্তর। দুনিয়ার রীতিই এই। শক্তিমান যতটা পারে ততটা মারে আর দুর্বল যতটা না খেলেই নয় ততটা মার খায়।

—থুকুদিদিস (১৯৫১: ৩৩১)

আফগান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর কোন কোন ইঙ্গ-মার্কিন মহাত্মা দাবি করেছেন: 'ইট ইজ নট জাস্ট এ ওয়ার, ইট ইজ এ জাস্ট ওয়ার।' আমাদের বাংলায়ও কথাটা কম ঝঙ্কার তোলে না—'এ যুদ্ধ যুদ্ধ শুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ শুদ্ধ যুদ্ধ।' যদি বলতে পারতাম, যুদ্ধ মানেই অন্যায় বা অশুদ্ধ তো কথাই থাকত না। কেউ যদি আমার গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধায় তখন তো আমাকে গা বাঁচানোর দায়ে হলেও যুদ্ধ করতে হয়। আত্মরক্ষার যুদ্ধ—অতয়েব—শুদ্ধ বা ন্যায়যুদ্ধ।

যুদ্ধকে এই দুই ভাগে ভাগ করার রীতিটি কখন চালু হয়েছে আমরা তার পুরো খবর রাখি না। এই বিষয়ের শাখাজ্ঞানীরা বলেন, খ্রিস্টান জাতির মধ্যে অগস্তিন হিপোবি বা সাধু অগস্তিনই প্রথম এই দুই কথা অক্ষরে লিখেছিলেন। অগস্তিন খ্রিস্ট-পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের লোক। এয়ুরোপে বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' বিশেষণ দুটির জায়গায় 'আক্রমণ' ও 'আত্মরক্ষা' কথা দুটি চালু হয়েছিল। কিন্তু ন্যায়যুদ্ধ মানেই

আত্মরক্ষামূলক—এমন কোন যুক্তি নাই। আক্রান্ত হবার ভয়ে কোন দেশ আগেভাগেই আক্রমণ করে বসতে পারে। তাতে সেই যুদ্ধ অন্যায়যুদ্ধ হয় না। এক কথায় আক্রমণ ও অন্যায় এবং আত্মরক্ষা ও ন্যায় সমার্থক শব্দজোট নয়। (টেইলর ১৯৮২)

আমেরিকা ও বিলাতের জোট এই সুযোগটা পুরোদমে গ্রহণ করেছে। আফগান দেশের উপর আক্রমণটা তারাই করেছে। একই সাথে দাবি করছে তাদের আক্রমণে ন্যায় আছে। তো 'ন্যায়' শব্দটার অর্থ কী? এই প্রবন্ধে আমরা এ বিষয়ে কিছু খবর সংগ্রহের চেষ্টা করব। কোন দুর্বল দেশের উপর সবল দেশের আক্রমণকেও একটা না একটা যুক্তি বা ন্যায়ের উপর দাঁড় করাতে হয়। মানুষের এই প্রয়োজন কেন? সেই কথারও একটা খোঁজ নেওয়া সম্ভব কিনা আমরা দেখব। দেখা যাক আমেরিকা কোন যুক্তিতে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। এই মুহূর্তে যুদ্ধ চলেছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মার্কিন মহাত্মাগণ যেসব যুক্তি প্রকাশ করেছেন সেগুলো বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু যে যুক্তি তাঁরা শক্তিতেই প্রকাশ করছেন তারও একটা বিবেচনা প্রয়োজন।

যবনজাতির অন্যতম প্রসিদ্ধ ইতিহাস-পণ্ডিত থুকুদিদিসের ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ সঙ্কলন করে আমরা দেখাতে চাই আমেরিকার আসল যুক্তিটা কী। আমাদের প্রস্তাব, দুর্বল দেশ মেলোসের বিরুদ্ধে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে আথেনসের সেনাপতিরা যে যুক্তি দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আজ আমেরিকার যুক্তিও তাই। আথেনসের সেনাপতিদের যুক্তি নথিভুক্ত করেছেন যবন-গৌরব মহাত্মা থুকুদিদিস। তাঁরা বলেছিলেন:

> দুই খণ্ড দেশ যখন শক্তিতে সমান থাকে না, তখন অধিকার কথাটা অবান্তর। দুনিয়ার রীতিই এই। শক্তিমান যতটা পারে ততটা মারে আর দুর্বল যতটা না খেলেই নয় ততটা মার খায়। (থুকুদিদিস ১৯৫১, ৩৩১)

১

খ্রিস্টান জাতির অন্যতম জ্যেষ্ঠ ধর্মগুরু সাধু অগস্তিনের নাম আমরা এমনিতেই নিয়েছি। তাঁর জগদ্বিখ্যাত পুঁথির নাম *আল্লাহর বাদশাহি* (*City of God*, Civitas Dei)। এই পুঁথির এক জায়গায় খুব মজার একটা বয়ান আছে। যবন বাদশাহ সেকান্দর একবার এক জলদস্যু পাকড়াও করেছিলেন। অগস্তিনের বয়ান অনুসারে বাদশাহ ডাকাতটিকে জেরা করলেন, 'কোন ধর্মজ্ঞানে তুমি দরিয়ার শান্তি নষ্ট করছ, বল দিকি?' ডাকাত নির্ভয়ে বললেন,

'আপনার ধর্মজ্ঞানে। আপনি যে জ্ঞানে সারা জাহানের শান্তি নষ্ট করেন সেই জ্ঞানে। আমার নৌকা ছোট্ট নৌকা, আপনার বহর মস্ত। তাই আমার নাম ডাকাত আর আপনার নাম বাদশাহ।' (অগস্তিন ১৯৮৪: ১৩৯)

ডাকাত নিছক ব্যক্তি আর বাদশাহ মানে জাতি বা সমাজ—পাছে এই যুক্তি কেউ পেশ করেন সেই ডরে অগস্তিন লিখে রেখেছেন, 'ডাকাতদলও কি ছোটখাট একটা বাদশাহি নয়? ডাকাতদলেরও তো "নেতা" থাকে, থাকে "নীতি"। দুয়ের বাঁধনও একের সাথে অপরের সমঝোতার বাঁধন বটে। লুটের মাল চুক্তির বিধান মতে ভাগ-বাটোয়ারা করা তো ডাকাতদলেরও রীতি।' এই কথার পর অগস্তিন দেখান: যথেষ্ট জনসমর্থন, নির্দিষ্ট এলাকা, ঘাঁটি, শহর আর শাসন করার মতন জনগোষ্ঠী জুটে গেলে ডাকাতদলও নিজেদের বাদশাহি ঘোষণা করতে পারে। বাদবাকি দুনিয়া সেই দাবি মেনে নেয়। এতে নতুন বাদশাহির লুটপাটের অধিকার লোপ পায় না, লোপ পায় তার শাস্তিভোগের বিধান।

ঠিক এই বয়ানের সুতা ধরে নয়, আর কারণে প্রায় আশি বছর আগে কলকাতার উকিল, আমাদের রংপুরের ছোকড়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন: 'ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেটিরই বর্ধিত সংস্করণ বা "এনলার্জড এডিশন" কেন প্রশংসার?' (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১১)

ডাকাত-বাদশাহ আখ্যানের পরিভাষায়: ডাকাতের কাজ যদি দোষের, তবে বাদশাহর কাজ কোন যুক্তিতে আমাদের তারিফ কুড়ায়?

অতুলবাবুর জবাবটা বিবেচনার যোগ্য। তিনি দাবি করেন, জাতীয় আইন বলে কিছু যদি থেকেও থাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু নাই। তখন এয়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। গত আশি বৎসরে এই পরিস্থিতির উল্লেখ করার মতন উন্নতি হয়েছে বলতে পারলে আমরাও উৎফুল্ল হতাম। তাই অতুল গুপ্তের কথায় ফের কান দেওয়া যাক। অতুলবাবু লিখেছেন:

> কারো নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করাটা যে সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ঐ এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য এক দলের অহংবোধটা অন্য আর এক দলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি-নিষেধ, সে সবই হল ছোট হোক বড় হোক কোন একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে। এক দলের সঙ্গে

> আরেক দলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ সব কোন কিছুরই লক্ষ্য নয়। সে জন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নাই সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনরকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে-লোক জীবনে কাকেও কোন দিন কড়া কথা বলেনি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১১)

একই কথা অন্য কানে যদি শুনি তো বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনের গোড়ায় আছে বল ও জোরাজুরি, সংক্ষেপে বলাজুরি। এর মানে আন্তর্জাতিক সমাজ আজও গড়া হয়নি। জাতিসংঘ নামে যে আপোস ব্যবহার নীতি আছে তার নামও সমাজ নয়। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স (Thomas Hobbes) যখন প্রস্তাব করেন আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল না, এক সময় চুক্তি লিখে তারা সমাজ গঠন করেছে—তখন অনেকে আপত্তি করেছিলেন। হবসের কল্পনাকে মনগড়া বলেছিলেন বিবাদীরা। অতুল গুপ্ত বিবাদীর যুক্তিসংক্ষেপটা এভাবে পেশ করেন: 'মানুষ কোনো দিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোন রাষ্ট্র গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্যন্ত কোন পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেন নি।' (গুপ্ত ১৪০৬: ৪১২)

তো হব্‌সের এই কল্পনার অজুহাত কী? রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখেই হব্‌স খুব সম্ভব আন্দাজ করেছিলেন লোকের সাথে লোকের সম্পর্কও একদিন নিশ্চয় এ রকম ছিল। এই অবস্থার নামই হব্‌স রেখেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থা (state of nature)। বল প্রয়োগই স্বাভাবিক। আইন প্রয়োগই অস্বাভাবিক তথা সভ্যতার কথা।

এই হিসাব অনুসারে আন্তর্জাতিক সমাজ এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের ইতিহাসেও ছিল। খ্রিস্টীয় একুশ শতকেও আছে। থুকুদিদিস পণ্ডিতের লেখায় পুরানো দিনের যে বিবরণ পাওয়া গেছে আমরা তারই অনুবাদ সংগ্রহ করেছি মাত্র।

২

পঞ্চম শতাব্দীর আথেনস সাম্রাজ্যের দুই জন সেনাপতির সঙ্গে ক্ষুদ্র দ্বীপ মেলোস সরকারের যে কথা কাটাকাটি হয় তার মোটামুটি পূর্ণ বিবরণ থুকুদিদিসের পঞ্চম খণ্ডে পাওয়া যায়। মেলোস দ্বীপটি এক পর্যায়ে স্পার্তার প্রভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক সময় ঐ অঞ্চলে আথেনসের নতুন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আর সকলে আথেনসের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেলোস করেনি।

মেলোস প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার অধিকার প্রার্থনা করে। কিন্তু আথেনস বলে: আমাদের অভিধানে 'নিরপেক্ষ' শব্দটির কোন ভুক্তি নাই। যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারা আমাদের বিপক্ষে। এই বলে আথেনস তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

যুদ্ধ চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে মেলোস পরাস্ত হয়। সেই দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে খুন এবং সকল শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে বন্দি করে দাস ঘোষণা করা হয়। আথেনসের লোকজন এসে দ্বীপে নতুন বসতি গড়ে। এই ঘটনা ঘটে স্পার্তার সাথে আথেনসের যুদ্ধের ষোড়শ বৎসরে। মনে করিয়ে দেওয়া অবান্তর নয়, এই যুদ্ধ মোট ২৭ বছর স্থায়ী হয়েছিল। আরো স্মরণ করা যায় যে এই পেলোপোনেসিয়ার যুদ্ধের পরই আথেনসের সাম্রাজ্য চিরতরে বিলীন হয়।

কূটনীতি শাস্ত্রের লেখকরা যে বস্তুকে পরবর্তীকালে আক্রমণমূলক যুদ্ধ নাম দেন মেলোসের বিরুদ্ধে আথেনসের অভিযান সেই বস্তুরই সাক্ষাৎ উদাহরণ। থুকুদিদিস নিজে আথেনসপক্ষের লেখক হয়েও কেন এই বিবরণ লিখেছেন তা অনেক পণ্ডিতের মাথাব্যথার কারণ। মার্কিন দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজার (Michael Walzer) মনে করেন আথেনসের পক্ষে সাফাই গাইবার মতলবেই থুকুদিদিস এত লম্বাচওড়া বিবরণের কষ্ট স্বীকার করেছেন। মেলোসের উপর আথেনসের হামলা—বাইরে থেকে মনে হতে পারে—আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী যুদ্ধ। কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে এই যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধই। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৫)

আমরা ওয়ালজারের এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে পারছি না। মেলোসীয় নেতাদের সঙ্গে আথেনসীয় সেনানায়কদের কথা কাটাকাটি খুব ঠাণ্ডা মাথায় পড়লে অন্য সিদ্ধান্তও করা যায়। ঐতিহাসিক মোজেস ফিনলে (Moses Finley) মনে করেন, থুকুদিদিস একটু হতাশার কবলে পড়েছেন। আথেনসের যুক্তিকে খেলো করার জন্যই—তথাকথিত নীতিবাগীশির গোড়ায় কী রকম হীন স্বার্থবুদ্ধি প্রকট তা দেখানোর জন্যই— সম্ভবত এই বিবরণ। (ফিনলে ১৯৭৭: ৪৮–৫৯)

আথেনসের দুই সেনাপতি—ক্লেয়োমেদেস এবং তিসিয়াস—সভায় বসেছেন। সামনে মেলোসের প্রতিনিধিগণ। আথেনীয় সেনাপতিদের ভাষণ কূটনীতির আড়াল ছেড়েছে। তাঁরা বললেন, এই আলোচনাটা দশের সামনে চলছে না, চলছে একান্তে। কাজেই আসুন, বক্তৃতা বাদ দিয়ে আসল কথা বলি। আমাদের কোন কোন কথায় আপনাদের আপত্তি তা এখানেই বলে দিন। আমাদের প্রস্তাব মেনে নিন।

মেলোসের প্রতিনিধি বললেন, দশজনের দৃষ্টির আড়ালে, এই একান্ত আলোচনায় আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আপনারা যে হারে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে আমাদের আলোচনায় ডেকেছেন, তার সাথে আপনাদের কথার কোন মিল নাই। আপনারা মুখে বলছেন আলোচনা, কিন্তু আপনারাই তো এই আলোচনার বিচারকও সেজে আছেন। এই আলোচনার ফলাফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াবে বলে আমরা আশা করতে পারি তা যুদ্ধ ছাড়া আর কী! যদি আমরা প্রমাণ করি, ন্যায় আমাদের পক্ষে তখন আমরা আত্মসমর্পণ করছি না। তখন একমাত্র পথ যুদ্ধ। আর যদি তা না হয় অপর পথ যা খোলা আছে তার নাম দাসত্ব।

আথেনসওয়ালা বললেন, আপনারা যদি ভবিষ্যতের পৃথিবী কী রকম দেখাবে তা নিয়ে কিংবা অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান, করুন। আমরা সেই আলোচনায় অংশ নেব না। তবে আপনাদের দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতে যদি কোন রকম আগ্রহ পোষণ করেন তো আমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে রাজি।

জবাবে মেলোসওয়ালা বললেন, আমরা এখন যে দশায় এসে পৌঁছেছি সে দশায় পড়লে চিন্তা ও কথার যতটা মুদ্রা আছে সব কয়টা বাজিয়ে দেখাই স্বাভাবিক এবং মার্জনীয়। আপনাদের কথাই যদি সত্য হয় এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় আমাদের দেশের নিরাপত্তা—এই কথা মেনে নিচ্ছি। তো আলোচনা চলতে পারে। আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

আথেনসওয়ালা বললেন, সত্যি কথা বলতে, আমরা কোন প্রকার ভান করব না। আমরা মিদিয়া বা ইরানকে পরাজিত করেছি, তাই আমাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হক তো আছেই—এই যুক্তি দিয়ে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। অথবা আপনারা আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন, তাই আপনাদের উপর হামলা করতে এসেছি—এই ছুতাও দেব না। আমরা এমন কোন বক্তৃতাও দেব না যা আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হবে না।

বিনিময়ে আমরা আশা করব আপনারাও দয়া করে বাজে যুক্তি পেশ করবেন না—বলবেন না আমরা স্পার্তার উপনিবেশ ছিলাম তবে তাদের মিত্র ছিলাম না। কিংবা বলবেন না আপনারা আমাদের কোন ক্ষতি করেন নাই। দয়া করে যা যা সম্ভব আলোচনা তার ভিতরই সীমিত রাখুন। দুই পক্ষেরই আসল মনোভাবটা হিসাবে নিতে ভুলবেন না। কারণ আপনারাও জানেন, আমরাও জানি, যখন দুই খণ্ড দেশ শক্তিতে সমান নয় তখন অধিকার কথাটা অবান্তর। দুনিয়ার রীতিই এই। শক্তিমান যতটা পারে ততটা মারে আর দুর্বল যতটা না খেলেই নয় ততটা মার খায়।

এর উত্তরে মেলোসীয় প্রতিনিধিরা জানালেন, আপনারা যখন অধিকারের কথা তুলতে বারণ করছেন আমরা সেই কথা আর তুলছি না। আপনাদের প্রস্তাব অনুসারে স্বার্থের কথাই পাড়ব। যা ন্যায়সঙ্গত ও সত্য বিপদে পড়লে তার দোহাই দেওয়ার—এমনকি যেসব যুক্তি সচরাচর কাজে লাগে না তেমন সকল যুক্তির বলে ছাড়া পাওয়ার—অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। আশা করি আপনারা আমাদের এই যুক্তি দেওয়ার অধিকারটা বিনষ্ট করবেন না। আপনারা আর দশ প্রস্তাবের মতন এই প্রস্তাবেও সম্মত হবেন বলে আশা করি। কারণ একদিন যদি আপনাদের পতন হয় তখন অন্যরা কী পরিমাণ প্রতিশোধপরায়ণ হবে ভাবতে পারেন? এই নিয়ে সারা দুনিয়াকে কাতর হতে হবে।

আথেনসের সেনাপতিরা উত্তর দিলেন, আমাদের সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে আমরা দুর্ভাবনায় ভুগছি না। ধরে নিচ্ছি স্পার্তাই আমাদের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী। স্পার্তার মতন প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য পরাভূত পক্ষের জন্য অতটা ভয়ের নয়। যেসব প্রজা নিজ উদ্যোগে আক্রমণ করে শাসকগোষ্ঠীকে পরাস্ত করে তারা এর তুলনায় অনেক বেশি ভয়ের। তবু এই ঝুঁকিটা আমরা নেব। এখন আমরা বলতে চাই, আমরা এসেছি আমাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থ কোথায় সেই কথা জানাতে। আর আমরা যা এখন বলছি তাতে আপনাদেরও স্বার্থ আছে। আমরা বিনা বাধায়, বিনা ঝামেলায় আপনাদের দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চাই। তাতে আপনারাও হেফাজতে থাকবেন, আমাদেরও স্বার্থ সাধিত হবে।

মেলোসীয় প্রতিনিধিরা বললেন: আমাদের উপর শাসনক্ষমতা বিস্তার করে আপনাদের স্বার্থ সাধিত হবে বুঝলাম। কিন্তু দয়া করে বলবেন কি আপনাদের দাসত্ব করে আমাদের স্বার্থটা সাধিত হবে কোন পথে?

আথেনসীয়রা বললেন: উত্তর সোজা। চরম পরিণতির আগে আত্মসমর্পণের একটা সুযোগ আপনারা পাচ্ছেন। এটাই স্বার্থ আপনাদের। আর আপনাদের ধ্বংস করার কষ্টটা থেকে আমরা রেহাই পেলাম। এটাই আমাদের লাভ।

মেলোসীয় প্রতিনিধিরা বললেন: তো আপনারা আমাদের নিরপেক্ষ থাকার অধিকারটাও স্বীকার করবেন না? নিরপেক্ষ মানে শত্রু নয়, বন্ধুই—যারা কোন পক্ষেরই মিত্র নয়।

আথেনসীয়রা বললেন: না। কারণ আপনারা শত্রুতাসাধন করলে আমাদের যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় আপনারা বন্ধু সাজলে ক্ষতি হবে অনেক গুণ বেশি। আপনারা শত্রু হলে প্রমাণিত হয় আমরা শক্তিমান। আর আপনাদের বন্ধু বলে স্বীকার করি তো আমাদের অধীনস্ত প্রজাদের চোখে তা হবে আমাদের দুর্বলতার প্রমাণ।

মেলোসীয়রা বললেন: আপনাদের প্রজারা ন্যায়বিচার বলতে মাত্র এইটুকুই বোঝেন? আপনাদের সাথে যাদের কোন কায়কারবার নাই তারা, আর যারা আপনাদের খাস উপনিবেশের লোক কিংবা আপনাদের হাতে পরাজিত বিদ্রোহী সবাইকে এক সমান ভাবা কি ঠিক?

আথেনসের সেনাপতিরা জানালেন: আমাদের প্রজারা মনে করেন, যদি অধিকারের প্রশ্ন ওঠে তো সকলেরই অধিকার সমান। কেউ যদি স্বাধীন হয় তো সে শক্তির কারণে। আমরা যে তাদের পোষণ করি না তার কারণ আমরা ভয় পাই। অতয়েব আপনাদের যদি আমরা দাস বানাতে পারি আমাদের দুই লাভ— এক নম্বরে, আমাদের সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ল; দুই, একটা উদাহরণ পাওয়া গেল যে আমরা শক্তিমান। আপনাদের দেশটা দ্বীপ এবং আপনারা অন্য যে কোন দেশের তুলনায় দুর্বল। তাই আমরা যারা সমুদ্রের অধীশ্বর আমাদের চোখের সামনে আপনাদের স্বাধীন না থাকাটা বাড়তি গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য।

মেলোসের নেতারা মুখ খুললেন: কিন্তু আমরা যে নীতি প্রস্তাব করছি তাতে কি আপনারা কোন রকম সুবিধা দেখতে পাচ্ছেন না? এখানেও আপনারা যদি ন্যায়-অন্যায়ের কথা এক পাশে ঠেলে দিয়ে শুদ্ধ নিজেদের স্বার্থের কথা তোলেন তো আমরাও নিজেদের স্বার্থের কথা বলতে চাই। আপনাদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন হতে পারে, সেই কথাটা আপনাদের বোঝাতে চাইছি। আমাদের মতন আরো নিরপেক্ষ দেশ আছে। আমাদের যেমন এখন আপনারা আক্রমণ করছেন তাদেরও যে সেই রকম আক্রমণ করবেন না তার প্রমাণ কী? বিশেষ করে তারা যখন আমাদের ভাগ্য নিজ চোখে দেখবে? বর্তমানে আপনাদের শত্রুসংখ্যা যত আছে এই নীতির ফলে সেই সংখ্যার বাড় ছাড়া আর কী হবে? আর যারা কোনদিন শত্রু হওয়ার কথা চিন্তাও করে নাই, এখন তারাও শত্রু তালিকায় নাম লেখাবে।

আথেনসীয়রা বললেন: তা হবে কেন? মূল ভূখণ্ডের দেশগুলো আমাদের অতটা দুর্ভাবনার কারণ নয়। ওরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছে, আমাদের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়ার কোন প্রয়োজন ওদের নাই। বিপদ আসে আপনাদের মতন দ্বৈপায়নদের দিক থেকে। আপনারা রয়েছেন সাম্রাজ্যের বাইরে। বিপদ আসবে আমাদের অধীনস্ত জাতিগুলোর দিক থেকেও। তারাও সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসবে আর স্পষ্ট বিপদের কারণ ঘটাবে।

মেলোসবাসীরা বলেন: ধরে নিচ্ছি আপনাদের বিশ্লেষণই ঠিক। আপনারা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছেন আর অধীন জাতিগুলোও স্বাধীন হওয়ার জন্য এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছে, তো আমরা যারা এখনো স্বাধীন আছি, যদি

আত্মসমর্পণের আগে যতটুকু সাধ্য আছে সবটুকু প্রয়োগ করে স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা না করি—তা কি ভয়াবহ নিচতা ও কাপুরষতার পরিচায়ক হবে না?

জবাবে আথেনসের সেনাপতিরা বললেন: যদি স্বার্থের কথাই বিবেচনা করেন, তবে হবে না। যেখানে যুদ্ধ হয় সমানে সমানে সেখানে জয়ের পুরস্কার ইজ্জত আর পরাজয়ের দণ্ড গ্লানি। কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের লড়াই তো তেমন নয়। কী করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবেন—সেই প্রশ্নে সীমিত আপনাদের স্বার্থ। যারা আপনাদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিমান তাদের প্রতিরোধ করার প্রশ্নই তো ওঠে না।

মেলোসীয় প্রতিনিধিরা বললেন: যুদ্ধের ভাগ্য মাঝে মাঝে অন্য রকমও হতে পারে সেই কথা আমরা জানি। দুই পক্ষের জনবল দেখে শক্তির যে পরিমাপ লোকে করে থাকে অনেক সময় শক্তির ভারসাম্য ঠিক সেই রকম অনুপাতে নাও হতে পারে। আত্মসমর্পণ মানে হতাশার হাতে নিজেদের ভাগ্য নিবেদন করা। অথচ সংগ্রাম চালিয়ে গেলে অন্তত কিছুটা হলেও আশা থাকে যে যদি সুযোগ আসে টিকে যাব।

আথেনসের লোকেরা বললেন: আশা সে তো বিপদে সান্ত্বনাদাত্রী। আশার প্রশ্রয় দেওয়া তাদেরই সাজে কোমরে যাদের জোর আছে। এই অবস্থায় যারা আছেন তারা আশা করতে পারেন, কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়তো হবে। পুরো ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাদের। কিন্তু আশার স্বভাবই এমন যে সে সব সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। যখন সর্বনাশ এসে দরজায় দাঁড়ায়, মাত্র তখনই অতি আশাবাদীরা টের পান কোন জায়গায় তাদের ভুল হয়ে গেছে। যদি কেউ এই অতি আশাবাদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চায় তো সাহায্যের অভাব নাই। আশা করি আপনারা এই ঝুঁকিটা নেবেন না। আপনাদের ভাগ্য ঝুলে আছে একটা সুতার উপর। আর কিছু লোক আছেন, যারা এই রকম অবস্থায় মানবিক চেষ্টার যেটুকু নিরাপত্তা পাওয়া যেতে পারে সেটুকুও পরিত্যাগ করে ভাগ্যগণনা, দৈববাণী ইত্যাদির উপর ভরসা করেন। এতে আশার নামে ধ্বংস ডেকে আনা হয়। আশা করি আপনারা সেই পথে এগুবেন না।

মেলোসবাসীরা বললেন: আপনাদের সৈন্যসামন্ত আর ধনদৌলতের সামনে দাঁড়ানো যে কঠিন সেই সত্য আপনারা যেমন জানেন আমরাও তেমনি জানি। সেই সত্যে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি আপনাদের এবং আমাদের শক্তি ও সম্পদ সমান সমান হত তবে কথা হত স্বতন্ত্র। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি দেবতারা আপনাদের দিকে যে রকম, সে রকম আমাদের দিকেও মুখ তুলে দেখতে পারেন। কারণ আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়পক্ষের যোদ্ধা। আর

আমাদের সৈন্যসামন্ত আর অস্ত্রশস্ত্রে যেটুকু ঘাটতি পড়েছে তা স্পার্তার কাছ থেকে আমরা পাব। আমরা শুদ্ধ তাদের মিত্রই নই, রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়ও। সুতরাং স্বার্থে না হলেও অন্তত লজ্জায় ওরা আমাদের পক্ষে লড়তে আসবেন। অতয়েব আমাদের আত্মবিশ্বাস অতখানি অযৌক্তিক নয়।

উত্তরে আথেনসের সেনাপতিরা যা বললেন, তাই তাঁদের মূল দার্শনিক যুক্তি। তাঁরা উচ্চারণ করলেন: আপনারা যে রকম দেবতার সাহায্য আশা করছেন, আমরাও সে রকম সাহায্য সমানে আশা করতে পারি। আর দশ মানুষ দেবতাদের যেমন বিশ্বাস বা পূজা করে আমরাও তা-ই করি। কোন অন্যথা করি না। দেবতার কথা যদি ওঠে তো বলব আমরা বিশ্বাস করি আর মানুষের প্রসঙ্গ ওঠে তো বলব আমরা জানি: মানুষ ও দেবতা উভয় পক্ষই যেখানেই পারে শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নেয়—এটাই তাদের স্বভাব, এর কোন ব্যতিক্রম নাই। শাসন করা বিধির বিধান—এই বিধান আমরাই প্রথম আবিষ্কার করি নাই কিংবা প্রথম প্রয়োগ করছি না। আমরা দেখেছি আমরা আসার আগেও এই বিধান বিদ্যমান ছিল আর আমাদের বিদায়ের পরও এই বিধান জারি থাকবে। আমরা বিধানটার প্রয়োগ ঘটাচ্ছি মাত্র।

আমরা পরিষ্কার জানি, আমাদের হাতে যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা যদি আপনাদের মতন অন্য যে কোন শক্তিরও থাকত, তো তারাও আমরা যা করছি তার চেয়ে কিছু কম করত না। অতয়েব, দেবতাদের বিচারে আমরা কোন অন্যায় করছি না। ফলে আমাদের ভয়ের কিছুই নাই। ন্যায় আমাদের পক্ষেই। কিন্তু যদি স্পার্তার কথা তুলে আপনারা বলেন, তারা লজ্জার ভয়ে আপনাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে, তো আপনারা ভুল করছেন বলে আপনাদের করুণা করতে পারি। একই সাথে আপনাদের বোকামিতে মুগ্ধও হচ্ছি।

যেখানে নিজ স্বার্থ বা নিজ দেশের বিধিবিধান নিয়ে বিবাদ বাধে সেখানে স্পার্তার তুলনা হয় না। অন্য জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। যা নিজেদের স্বার্থসম্মত তাই গৌরবের আর যা সুবিধাজনক তাই ন্যায়সঙ্গত—এই বিচার যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে স্পার্তাবাসীরাই শ্রেষ্ঠ, সংক্ষেপে এটুকু বললে ওঁদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়। এই ধরনের চিন্তাভাবনায় যারা অভ্যস্ত তাদের সাহায্যের আশায় ঘর বাঁধা, নিরাপত্তার ভরসা করা ঠিক হবে না। (থুকুদিদিস ১৯৫১: ৩৩০–৩৭)

মেলোসবাসীদের সাথে আথেনসের দুই সেনাপতির বাদানুবাদ আরো কিছু দূর লেখার পর থুকুদিদিস থেমে গেলেন। আলোচনা, বলা বাহুল্য, ভেঙ্গে গেল এবং যা হওয়ার তাই হল। অনেক প্রতিরোধের পর শেষ পর্যন্ত মেলোস

আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তার কী পরিণতি হয় সে কথা উপরেই লেখা হয়েছে। ততদিনে খ্রিস্টপূর্ব ৪১৬ সন। মেলোসের সকল পুরুষ হত্যার পর সকল নারী ও শিশু বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল আথেনসে। সেই শূন্য দ্বীপে চাষাবাদ করার জন্য ৫০০ জন আথেনসের নাগরিক পাঠানো হয়।

৩

থুকুদিদিসের যুক্তি নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছে। এখনো হচ্ছে। এখানে মূল প্রশ্ন: ন্যায় কার পক্ষে? মেলোসের না আথেনসের? অনেকে বললেন ন্যায় আথেনসের পক্ষে। কারণ ন্যায় তো বিধিরই বিধান। আথেনস শুদ্ধ বিধির নিয়ম পালন করেছে। এই বিধিরই নাম ক্ষমতা, শক্তি বা সাম্রাজ্য।

ওদিকে মেলোসের বিধির বিধান স্বাধীনতা। এই দুই বিধির যদি বিরোধ বাধে তো মধ্যস্থ কোন বিধি কি আছে? ইতিহাসে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। সচরাচর বলা হয়—বিধির বিধান মেনেই স্বাধীনতা স্থাপিত হয়। বিপরীতে এ কথাও বলা চলে: স্বাধীনতা স্থাপন করেই মাত্র বিধির বিধান গ্রহণ করা যায়।

মেলোসের পতনের পর থুকুদিদিস কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আথেনসের পতনের আগেই সম্ভবত তিনি মারা যান। কারণ ঐ যুদ্ধের শেষ কথা তিনি লিখে যেতে পারেন নাই। মেলোসের পতন প্রমাণ করে স্বাধীনতা পরাভূত, আর ক্ষমতার বিধান জয়ী। ওদিকে আথেনসের পতন—১১ বছর পর—দেখাচ্ছে বিধির বিধানও পরাভূত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে দুনিয়ার কোন সাম্রাজ্যই পরাভবের নিয়তি এড়াতে পারে না।

এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তো প্রশ্ন ওঠে: কেন? সম্ভবত মানুষের স্বাধীনতাই বিধির প্রকৃত বিধান। স্বাধীনতা ও বিধি হয়তো পরস্পরের শত্রু আদৌ নয়। তাই বলা চলে দাসত্ব নয়, বিদ্রোহই ন্যায়সঙ্গত।

আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ইংলন্ড এখন বিধির নাম ভাঙ্গিয়ে এসেছে। আফগান জাতি লড়ছে স্বাধীনতার নামে।

এই বাক্য সংশোধন করে বলা যায়: আমেরিকা ও ইংলন্ডের বিধির অপর নাম মৃত স্বাধীনতা। আর আফগান স্বাধীনতার অপর নাম প্রাণবন্ত বিধি।

....

সাপ্তাহিক ২০০০, ঈদসংখ্যা ২০০১

§ ৮

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য

On peut fonder des empires glorieux sur le crime, et de nobles religions sur l'imposture.

খোদ অপরাধ মূলধন করে বড় বড় বাহাদুর সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে, আর নিতান্ত জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েও প্রবর্তিত হতে পারে মহামহিম ধর্ম।

— শার্ল বোদলেয়ার (১৯৬৪/ক: ২৫৬)

জগদ্বিখ্যাত ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময় লিখেছিলেন, 'খোদ অপরাধ মূলধন করে বড় বড় বাহাদুর সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে, আর নিতান্ত জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েও প্রবর্তিত হতে পারে মহামহিম ধর্ম।' এই বক্তব্যের প্রথম অংশ কতখানি সত্য তলিয়ে দেখাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আফগানিস্তানের উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হামলা কি সেই ধরনের অপরাধ যার উপর একটা সাম্রাজ্য খাড়া করা যায়? এই প্রশ্নের তর্কাতীত জবাব লেখার সময় এখনো আসে নাই। তবু আমার কেন জানি মনে হয়েছে এই বিষয়ে এখনই লেখা আমাদের কর্তব্য।

আমেরিকা কী কারণে আফগানিস্তান আক্রমণ করল? মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে যে কারণ দেখাচ্ছে, সেটাই কি আসল অথবা একমাত্র কারণ? ভিতরের প্রকৃত ব্যাপার কী তা জানার জন্য আমাদের বিশ, পঁচিশ এমনকি পঞ্চাশ বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। এতদিন অপেক্ষা করার মতন সবুরশক্তি যাঁদের নাই তাঁদের দৃষ্টি আদ্যকালের গ্রিক ইতিহাসবেত্তা থুকুদিদিসের (Thucydides) লেখার দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করলে কেমন হয়? এই ভাবনা থেকেই বর্তমান লেখাটির জন্ম।

১

ইতিহাসবিদ থুকুদিদিস—অনুমান করা হয়—দার্শনিক সক্রাতেসের চেয়ে বয়সে আট-দশ বৎসরের ছোট হবেন। হজরত ইসার আগের পঞ্চম শতকে তাঁরা দুজনই প্রাণধারণ করতেন। থুকুদিদিস সক্রাতেসের মতন খ্যাতির অধিকারী নন। কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস বিষয়ে যাঁদের খানিক হলেও আগ্রহ, তাঁরা তাঁর লেখার কদর করেন।

ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স থুকুদিদিসের বই—*পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধের ইতিহাস*—ইংরেজিতে তর্জমা করেন। (শ্লাত্তার ১৯৭৫) একালের দার্শনিকদের কারও কারও মতে হব্‌সের রাষ্ট্রকল্পনা থুকুদিদিসের অনুগামী। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৪) কেউ কেউ মনে করেন, থুকুদিদিসের চিন্তায় নতুন কথা নাই—তিনি মানুষের নীতি, সভ্যতা ও রাষ্ট্র বিষয়ে খালি হতাশা আর নিরাশার কথাই শুনিয়েছেন। (ফিনলে ১৯৭৭: ৪৮–৫৯)

আমাদের চোখে থুকুদিদিসের লেখার অন্য এক মূল্য ধরা পড়েছে। তাঁর বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে একবার যা ঘটে তা হুবহু না হোক, আকারে প্রকারে আরো বহুবার ঘটতে পারে। কেতাবি ভাষায়, ইতিহাসের আবৃত্তি আছে। (থুকুদিদিস ১৯৫১: ১৪)

এই দাবি যদি আট আনাও সত্য হয়, তো থুকুদিদিস সাহেবের লেখা ইতিহাসের একটি ঘটনার আলোকে আফগান মুলুকের উপর মার্কিন জবরদস্তির বিচার যৎকিঞ্চিত করা যায়। আমার মনে হয়েছে প্রাচীন গ্রিক জাহানের পরাশক্তি আথেনস তার এককালীন মিত্র ক্ষুদ্র মিতুলেনি রাজ্যের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল, বর্তমান দুনিয়ার বাদশাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সাবেক মিত্র আফগান দেশের সঙ্গে একই ব্যবহার করছে।

এই তুলনা কতখানি আকাশ-কুসুম তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের এই লেখার আসল উদ্দেশ্য পূরণের সম্ভাবনা। আথেন্স রাষ্ট্রে জননেতারা মিতুলেনির সকল সাবালক পুরুষ হত্যার এবং তাবৎ শিশু ও নারী বিক্রয়ের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিলেন থুকু সাহেব তা সম্পাদিত ভাষায় নকল করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হিসাবেও এই বিবরণ পাঠ করা যায়—এ প্রস্তাব এই অধম লেখকের।

যুদ্ধের কারণ দুই প্রকার—বলেছিলেন থুকুদিদিস। এক প্রকার কারণের নাম সাক্ষাৎ বা আশু কারণ, আরেক প্রকারের পরিচয় তিনি দেন—সত্য বা সুদূর কারণ নামে। থুকুদিদিস যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বল করে এই বিচারকথা

প্রচার করেন, আজকালকার ইতিহাস লেখকরা তারই নাম দিয়েছেন পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ।

প্রাচীন যবনদেশের এক অংশ পেলোপোনেশিয়া নামে খ্যাত ছিল। সেই অংশের প্রধান ক্ষাত্রশক্তি স্পার্তা নামক রাষ্ট্র। এই স্পার্তার সঙ্গে নতুন পরাশক্তি আথেন্সের অনেক বছরের সংঘাতকেই ইতিহাসে পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ বলার রীতি। নামেই প্রকাশ থুকুদিদিস আথেন্সপক্ষীয় মানুষ। তবে তাঁর সম্মানে অন্তত এইটুকু বলা দরকার—নিরপেক্ষতার ভান তিনি করেন নাই। বইয়ের প্রথম রুকুতেই থুকু সাহেব বলেছেন, আমি আথেন্সের লোক, এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে বসেছি। নিজ দেশ বা নিজ দল বলে তিনি আথেন্সকে ছেড়ে কথা বলেননি। তাই আমরা তাঁর লেখার কদর করতে আজও কসুর করি না।

মিতুলেনির ভাগ্যনির্ধারণ সভায় আথেন্সের দুই রাজনীতিবিদের যে কাহিনী তিনি নকল করেছেন তা আমাদের মূল ও মূল্যবান ভরসা। থুকুদিদিসের এই দিলখোলা কথাবার্তা বর্তমান যুগের মার্কিন দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজার দেখলাম খুব একটা পছন্দ করেন নাই। (ওয়ালজার ১৯৯২: ৪-১৩)

কোন প্রকার রাখঢাক না করে বা চাতুরির আশ্রয় না নিয়ে থুকুদিদিস বলেছেন, পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধের সত্য কারণ আথেন্সের সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি। দুটি করদ রাজ্যের বিরোধ নিয়ে এই বিবাদ শুরু হলেও সেটিই সত্য কারণ নয়—থুকুদিদিস সাহেব এই বিশ্লেষণে অটল। তাঁর ভাষায়:

> পণ্ডিতদের আলোচনায় যুদ্ধের যে কারণ সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়, আমার বিচারে যুদ্ধের সত্য কারণ সেটাই। আথেন্সের ক্ষমতার বাড় বাড়া এবং সেই বাড়ায় লাকিদেমনের (মানে স্পার্তার) ভয় পাওয়া—এই দুই কারণে যুদ্ধ না লাগা অসম্ভব হয়ে ওঠে।[২]

থুকুদিদিস সাহেবের এই বিভাজন ইতিহাস লেখকরা পরকালেও বড় সহি জিনিস বলে আদর করেছেন—যেমন এয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের মার্কিন ইতিহাস লেখক ফে সাহেব থুকুদিদিসের ভূয়সী তারিফ করেন। (ফে ১৯৭৫: ১)

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সমিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরব্ধ সমর প্রয়াসের বেলায়ও থুকুদিদিসের বিভাজন খাটানো সম্ভব। প্রশ্ন তোলা যায়: এই যুদ্ধের সত্য বা সুদূর কারণ কী?

খ্রিস্টীয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এক সুন্দর সকালের নির্মেঘ আকাশ ছেড়ে কয়েকটি অসামরিক বিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অসামরিক দালান ও একটি সদর দফতরে হামলা চালাল আর ৭ অক্টোবর নাগাদ কাবুল-কান্দাহারের মাটি মার্কিন বোমায় উড়ে গেল। ইতিহাস লেখক বা সংবাদ

জগতের পরিচালকরা যদি এই সুবাদে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকেই এই যুদ্ধের আশু বা সাক্ষাৎ কারণ বলেন তো অন্যায় হয় না। অন্যায় হয় যদি তাঁরা এই ঘটনাই যুদ্ধের সত্য কারণ বলে দাবি করেন।

ইসাবি ১৯১৪ সালের ২৮ জুন উপনিবেশ বসনিয়ার সারায়েভো শহরে মালিক সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়ার ভাবী সম্রাট সস্ত্রীক রাজনৈতিক প্রতিবাদীর গুলিতে প্রাণ দিলেন আর আগস্ট মাসের ৪ তারিখ নাগাদ দুই পরাশক্তি—জার্মানি আর ইঙ্গভূমি—মহাযুদ্ধে নেমে গেল। সেই যুদ্ধ সাড়ে চার বছর স্থায়ী হল। দুই দলে খুন কিংবা জখম হল তিন কোটির মত মনুষ্য। অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্রাটের জীবন মহান ও মূল্যবান। এ সত্যে সন্দেহ করলেও গোনাহ হয়. সন্দেহ নাই। কিন্তু এয়ুরোপীয় মহাসমরের কারণ এইটুকুন বললে খুব একটা সওয়াবও হয় না। এই কারণ অকিঞ্চিৎকর।

২

একই প্ররোচনায় আমরাও বলব, ১১ সেপ্টেম্বরই মধ্য এশিয়ায় মার্কিন অভিযানের প্রকৃত বা সত্য কারণ নয়। আফগান শাসকরা সৌদি আরবি বাদশাহের প্রজা ওসামা এবনে লাদেনকে ঠাঁই দিয়েছে। মার্কিন উপরোধ উপেক্ষা করে তাকে রেহাই দিয়েছে, পাকড়াও করে তাদের হাতে তুলে দেয়নি। তাই আমরা আফগান বেটাদের উপর চড়াও হয়েছি—যুক্তিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কৈফিয়ত দয়া করেই দিয়েছে। না দিলেও কারও কিছু বলার ছিল না।

ওদিকে আবার সাবেক রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন প্রচার করেছেন—১১ সেপ্টেম্বর তারিখের অনেক আগেই তিনি শ্রীমান লাদেনকে খুন করার হুকুম জারি করে বসেছিলেন। এই সেই ক্লিনটন যিনি কোন দিন কোন মিথ্যাকথা বলেন নাই। তাই পৃথিবীও তাঁহার কথা অবিশ্বাস করে নাই।

তার প্রমাণও মেলে সুদানে, সোমালিয়ায়, এরাকে এবং (বলা বাহুল্য) খোদ আফগান দেশে। তো বলা চলে, লাদেন-বিরোধী অভিযানের ইতিহাসে ১১ সেপ্টেম্বর একটি বাড়তি অধ্যায় বৈ নয়। বাংলায় বলি, কারণ-বোঝার উপর করুণ-শাকের আঁটি। তবু প্রশ্ন থেকেই গেল: খুদে আফগান জাতির উপর মহান দেশের এই মহা গোস্বার সত্য কারণ কী?

যুক্তরাষ্ট্র বার বার বলেছে—তাদের যুদ্ধ ক্রুসেড বটে, তবে এ ক্রুসেড সে ক্রুসেড নয়। এর প্রতিপক্ষ আফগান জাতি নয়, শুদ্ধ তালেবান শাসকগণ। এর প্রতিপক্ষ এসলাম ধর্ম নয়, (এসলাম মার্কা) সন্ত্রাসবাদ মাত্র। আমেরিকার এই

কথা ও তার যুদ্ধপ্রয়াসের মধ্যে সঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা শতাব্দীর মনীষার কাজ, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রপতি বুশ বলেন: সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে তাঁর দেশের অভিযানের মাঝখানে দাঁড়াবার অধিকার কারও নাই। পয়গম্বর হজরত ইসা এবনে মরিয়মের বাক্য উদ্ধার করে তিনি বলেন, যারা আমাদের পক্ষে নাই তারা আমাদের শত্রুপক্ষের লোক। (*কিতাবুল মোকাদ্দস* ২০০০: সিপারা মথি, ১২: ৩০)

এ কথার অর্থ ভয়াবহ। এমন ভয়াবহ যে আমাদের পক্ষে এর অর্থ হজম করাও কঠিন। এই কথায় নির্গলিতার্থ: আমরা সারে জাহাঁর বিরুদ্ধে জঙ্গ ঘোষণা করলাম। ভয়ে বা প্রলোভনে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্র এর মধ্যেই মার্কিন জোটে যোগ দিয়েছে। যারা দেয় নাই যুক্তরাষ্ট্র এখন ইচ্ছা করলে তাদের ঘাড়েও সিন্দাবাদের দৈত্যের মতন লাফ দিয়ে বসতে পারে। তো সামান্য লাদেনের শাক ঢাকতে কেন এত মাছের আমদানি? কেন কামান দাগতে এই মশার চাষ, মশাই? কেন আমেরিকা বনাম পৃথিবীর এই আড়াই নম্বর বিশ্বযুদ্ধ?

কারণ, আমাদের বিবেচনায়, বিদ্রোহ। আফগানরা একদিন মার্কিন দেশের মিত্র ছিল। এখন বিদ্রোহ করছে। এ বিদ্রোহ মেনে নেওয়া যায় না। আফগানিস্তানের মতন নগণ্য কোন দেশ জোটের বাইরে গেলে ছাইপাঁশ আসে যায়। কিন্তু উদাহরণের শক্তি অপরিমেয়। ক্ষুদ্র আফগান দেশ যদি উদাহরণ স্থাপনের সুযোগ পায়, তো কাল বড়সড় দেশ সৌদি আরবও যে সেই পথ ধরবে না তার কসম কোথায়? মার্কিন সাম্রাজ্যের আজ আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আজ সে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তবু কেন এমন নিষ্ঠুরতা? কেন তার শরণ নিতে আজ সে পিছ পা হচ্ছে না? দুনিয়ার আর দশ দেশকে শিক্ষা দেওয়াই আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের প্রধান কারণ। এই দরিদ্র দেশের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনায় বসাও আমেরিকার মর্যাদার সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার মিত্রদের জবরদস্তির এবং আত্মগরিমার এটাই আশু কারণ। এর সুদূর মূল এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে বটে। সারা পৃথিবীর প্রাণ না নিয়ে আজ এ সাম্রাজ্য আয়ুর নিশ্চয়তা নিতে পারছে না।

আথেন্সেরও এই রোগ হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ এবং ৪৮০ সনে— যথাক্রমে মারাথন ও সালামিসের যুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে গ্রিক জাতির যুদ্ধজোট জয়ী হয়। এই বিজয়ের নেতৃত্ব দেয় নতুন পরাশক্তি আথেন্স। যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু জোট শেষ হয় না। আথেন্সের পতাকাতলে প্রায় ১৫০টি ছোট ছোট রাষ্ট্র

সমবেত হয়। এই মিত্রদের সঙ্গে আথেন্সের সম্পর্ক কেমন ছিল সে নিয়ে ইতিহাস লেখকরা এখনো তর্ক করেন। কিন্তু কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট। জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা কাউকে দেওয়া হয়নি। যদি কোন রাষ্ট্র আথেন্সের জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো তাকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে শায়েস্তা করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৮ সনের দিকে এই জোটের আত্মপ্রকাশের প্রায় ৪৬ বছর পর পুরনো পেলোপোনেশীয় জোটের সঙ্গে তার যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধার চার বছর পর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিতুলেনি জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আথেন্স তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে নীতি গ্রহণ করেছিল—আমাদের মনে হয় তার সঙ্গে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত প্রতিশোধ ও ত্রাসনীতির মিল আছে। আশা করি আফগানিস্তানে মার্কিন-পাশ্চাত্য যুদ্ধের আসল কারণ কী তার কিছু ইঙ্গিত এই বিশ্লেষণের ভিতর পাওয়া যাবে।

অনেকদিন ধরে লড়বার পর মিতুলেনির সরকার আথেনসীয় বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে। থুকুদিদিসের মতে, আথেনসীয় বাহিনীর অবরোধের মুখে একদিকে খাদ্যবস্তুর ঘাটতি দেখা দেয়, অন্যদিকে স্পার্তার দলের প্রতিশ্রুত সাহায্যও এসে পৌঁছে না। ওদিকে সশস্ত্র জনসাধারণ খাদ্য গুদাম খুলে দেওয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে আত্মসমর্পণ বাদে সরকারের অন্য গতি থাকে না। আত্মসমর্পণ চুক্তির শর্ত অনুসারে মিতুলেনির একদল দূত খোদ আথেন্স নগরী গিয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত আথেনসের বাহিনী কোন মিতুলেনীয় নাগরিকের প্রাণহানি করবে না। কিন্তু আথেনসীয় বাহিনীর অধিপতি—পাখেস তার নাম—বিদ্রোহের নেতাদের বন্দি অবস্থায় আথেন্সে পাঠিয়ে দেন। বন্দিদের মধ্যে স্পার্তার একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। (থুকুদিদিস ১৯৫১: ১৬৩)

বন্দিরা আথেন্স পৌঁছামাত্রই স্পার্তার প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়। আথেন্সের জাতীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, শুদ্ধ যুদ্ধবন্দি হিসাবে আনীতদেরই নয়, মিতুলেনির সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরও প্রাণদণ্ড দিতে হবে। নারী আর শিশুদের করতে হবে দাস। এই দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্যে একদল দূত তৎক্ষণাৎ নৌপথে মিতুলেনি যাত্রা করেন।

কিন্তু পরদিন আথেনসীয় নাগরিকদের একাংশ বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব তোলে। কারণ দায়ী-নির্দায়ী নির্বিশেষে কোন রাষ্ট্রের সকল মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত অনেকের কাছে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর মনে হয়। পরদিনের এই বিতর্কে অংশ নেন কট্টরপন্থী সেনাপতি ক্লেয়ন (এবনে

ক্লেয়েনেতুস) এবং নরমপন্থী পক্ষে দিয়োদোতুস (এবনে এয়ুক্রাতেস)। ভোটাভুটিতে শেষমেশ গণ মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল হয়। অনেক মিতুলেনিবাসীর প্রাণ বাঁচে। (থুকুদিদিস ১৯৫১: ১৭২) তবে প্রায় এক হাজার বন্দির প্রাণদণ্ড কার্যকর হয় এবং দেশটি পুরোপুরি পরিণত হয় আথেন্সের উপনিবেশে।

মিতুলেনির সকল পুরুষ নাগরিকের প্রাণদণ্ড কেন দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে সেনানায়ক ক্লেয়ন আথেন্সের জাতীয় পরিষদে যে বক্তৃতা দেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায়ও দেওয়া সম্ভব। শুদ্ধ মিতুলেনি শব্দটি কেটে তার জায়গায় আফগানিস্তান বা অন্য যে দেশের নাম ইচ্ছা হয় দিতে পারেন। ক্লেয়ন বলেন:

> যারা আমাদের সাম্রাজ্যের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কিংবা দুশমনদের উস্কানিতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের না হয় আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যারা সুরক্ষিত দুর্গসহ দ্বীপে বসবাস করে আসছে, সমুদ্রপথ ছাড়া যাদের উপর আমাদের শত্রুরা হামলা করতে পারে না, যাদের নিজস্ব নৌ-যুদ্ধযান মজুদ আছে, যারা স্বাধীন এবং আপনাদের চোখে সম্মানের পাত্র ছিল—তারা যদি এমন কাজ করে তবে তাকে বিদ্রোহ বলা সত্যের অপলাপ। কারণ বিদ্রোহ বলতে অত্যাচারের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।
>
> এদের কাজটিকে সজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এরা আমাদের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে আমাদের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করেছে। তারা নিজেরা ক্ষমতাধর হওয়ার চেষ্টা করলে যে অন্যায় হত এই অন্যায় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তাদের যে প্রতিবেশীরা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, তা থেকে তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। নিজেদের ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা ঝুঁকি নিতে পিছ পা হয়নি।[২]

ক্লেয়ন দাবি করলেন, এদের এখন 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' দিতে হবে। পরিষদের উদ্দেশে তিনি বলেন:

> অভিজাতদের শাস্তি দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের মাফ করবেন না। তারা সকলেই নির্বিচারে আপনাদের উপর হামলা চালিয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তারা তো আমাদের পক্ষে যোগ দিয়ে, এতদিন নিজেদের দেশের মালিক হতে পারত। কই তারা তো তা করেনি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, অভিজাতদের পিছনে কাতার বেঁধেছে।[৩]

ক্লেয়নের এই যুক্তিকে একালের দার্শনিকরা বলবেন, 'জাতীয় অপরাধের যুক্তি'। ক্লেয়নের অপর যুক্তি: অপরাধ অনুসারে সাজা দিতে হবে। যদি না দিই তো সমূহ বিপদ। তিনি বলেন:

> ভেবে দেখুন। যে মিত্র শত্রুর চাপে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করল এবং যে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় বিদ্রোহ করল তাদের উভয়কে যদি একই শাস্তি দেন তাহলে—ভাবতে পারেন!—সামান্যতম ছুঁতো পেলেই কে না বিদ্রোহে এগিয়ে আসবে! যেখানে সাফল্যের পুরস্কার স্বাধীনতা আর ব্যর্থতার শাস্তি তেমন ভয়ের কিছু নয়—সেখানে পরিস্থিতি কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন তো![৪]

ক্রেয়নের হিসাব মোতাবেক:

> আমরা রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্রের বিদ্রোহ দমন করতে আমাদের পয়সা আর প্রাণ রাখব আর জিতলে পাব ধ্বংসপ্রাপ্ত এমন সব দেশ যা থেকে যুদ্ধের খরচাও উঠে আসবে না। আর যদি ব্যর্থ হই তো কামাই হবে চিরস্থায়ী একটা শত্রু। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই শিকায় তুলে আমাদের পুরানো মিত্রের সঙ্গে লড়ে সময় কাটাতে হবে।[৫]

ক্রেয়নের এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে যিনি পাল্টা যুক্তি পেশ করেন তিনি দিয়োদোতুস। তাঁর মতে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা যায় না। তাঁর বক্তৃতার কিয়দংশ থুকুদিদিস এভাবে পেশ করেন:

> সে যাই হোক, আমি মিতুলেনির মামলায় পক্ষে বা বিপক্ষে সাফাই গাইতে আসি নাই। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমাদের বিচার্য বিষয় ওদের অপরাধ নয়, আমাদের স্বার্থ। হাতে নগদ প্রমাণ পেলেও আমি ওদের প্রাণদণ্ড চাইব না, যদি না তাতে আমাদের স্বার্থ সাধিত হয়। আর ওদের প্রশ্রয় দেওয়ার পরামর্শ আমি দেব না, যদি না তাতে আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা পায়।[৬]

দিয়োদোতুস বললেন: 'মনে রাখবেন, আমাদের এই পরিষদ আদালতের কক্ষ নয়, আমাদের কাজ রাজনৈতিক। বিষয়টা ন্যায় বা অন্যায়ের নয়, বরং মিতুলেনিদের কিভাবে আথেন্সের কাজে লাগানো যায় তা।'[৭]

৩

পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধ মোট সাতাশ বছর জারি ছিল। শুরু হয়েছিল আলায়হেস সালাম হজরত ইসার ৪৩১ বৎসর আগে, শেষ হয় ইসার আগের ৪০৪ বছরে। মাঝখানে সাত বৎসরের একটা বিরতির হিসাবও এর ভিতরে ধরা আছে। এই যুদ্ধের শেষ ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল তা বাংলাদেশের জ্ঞানী পাঠিকা জানেন। যবনজাতির গৌরব আথেন্সের পতন ঘটে এই যুদ্ধে। তার সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। যুদ্ধের শেষটা কী হয়েছিল সে কথা অবশ্য লিখে যাবার সময় থুকুদিদিস পাননি। কিন্তু এই হত লঙ্কার বিস্তর ইঙ্গিত তিনি তার বইতে

দিয়েছেন। এর পিছনে মিতুলেনির মত একটি হত রাষ্ট্রের কী ভূমিকা! রাজনীতি বা যুদ্ধনীতির মাপে হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু নীতিরাজ বা নীতিযুদ্ধের বিচারে এই ভূমিকা বিরাট।

সেবার—পেলোপোনেশিয়ার যুদ্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে—কপালগুণে মিতুলেনির বাদবাকি লোকজন প্রাণে রক্ষা পায়। মার্কিন দার্শনিক ওয়ালজার মনে করেন, এই কপালের জোর নিছক ভাগ্য নয়। এর পিছনের কারণ আথেন্সের গণতন্ত্র। প্রথম দিন অভিজাত-সাধারণ, বিদ্রোহী-শান্তিবাদী নির্বিশেষে সবাইকে প্রাণদণ্ড আর নারী ও শিশুদের দাসত্বদণ্ড বিধান করায় যাঁরা ব্যথিত হয়েছিলেন তাঁরা গণতান্ত্রিক আথেন্সের নীতিবাদী নাগরিক। এঁদের যুক্তির জোরেই মিতুলেনির প্রাণ রক্ষা পায়। (ওয়ালজার ১৯৯২: ১১)

ওয়ালজার সাহেবের মতে, বিদ্রোহীকে শাস্তি দেওয়া নিষ্ঠুরতা নয়, সেটা ন্যায়সঙ্গত। শুদ্ধ নির্বিচারে মানুষ মারাই নিষ্ঠুরতা। ক্রেয়ন সেই নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। ওদিকে ক্রেয়নের বিরোধী দলের নেতা দিয়োদোতুসও নীতির দোহাই দিয়ে নয়, আথেন্সের স্বার্থের খাতিরে—স্বার্থ কা ওয়াস্তে—মিতেলেনির প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন। তাহলে নীতি কোথায়? আমরা কি এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য যে এই ভূমণ্ডলে নীতি বলতে কিছু নাই? কেবলই স্বার্থ আছে অখিল ভুবনে, নাই আর কিছু?

যদি নাই থাকে নীতির বালাই—তো এত নীতিকথা কেন? আমেরিকা তো ইচ্ছা হলে বলতেই পারে, আমরা ক্ষমতাবান, তোমরা ক্ষমতাহীন—আমাদের আজ্ঞা পালনই তোমাদের কর্তব্য। তা না বলে আমেরিকা কেন বলে: ন্যায় আমাদের পক্ষে? বাঘ কেন ভেড়ার বাচ্চাকে বলে: 'তুমি আমার পানি আউলা করছ!' বেকুব ভেড়ার বাচ্চা যদি বলে: 'কই হুজুর, আমি কি কইরা আপনের পানি আউলা করুম? আমি তো এই দিকে নিচে খাড়াইয়া আছি।' বাঘ মহাশয় কি শুনতে বাধ্য?

আমাদের প্রশ্ন: বাঘেরও কেন একটা যুক্তি দরকার? সম্ভবত লা ফঁতেন নামক এক কবির পাল্লায় না পড়লে বাঘকেও এ দর্শন প্রচার করতে হত না। (লা ফঁতেন ১৯৭৯: ১১) ক্রেয়নও করেননি। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় তিনি পরিষ্কার বলেন: 'আমি এর আগেও বহুবার বলেছি কোন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু রেখে সাম্রাজ্য রাখা যায় না। মিতুলেনির বিষয়ে আপনারা এই যে দোমনা হচ্ছেন তা দেখে আমার এ বক্তব্য আরো বলবান হল।' (থুকুদিদিস ১৯৫১: ১০৩–০৪) আমেরিকায় গণতন্ত্র আছে। কিন্তু সে গণতন্ত্র রাজার নতুন জামার মত। খালি চোখে দেখা যায় না।

আফগানিস্তানে আমেরিকার নিষ্ঠুরতাকে অনেকের মনে হবে 'ন্যায়বিচার'। সন্ত্রাস দমনের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি। আবার অন্য অনেকের মনে হবে এই সন্ত্রাসের সত্য কারণ আমেরিকার সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যটা কেটে বাদ দিলে আফগান আর আমেরিকান জনগণের কোন বিবাদ নাই। সাম্রাজ্য আছে। তাই যুদ্ধ আছে। কারও কাছে এই যুদ্ধ স্বাভাবিক, সুতরাং সঙ্গত। আর কারও কাছে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যের ফল, অতয়েব নিষ্ঠুর।

আমেরিকার হাত থেকে আফগানিস্তান কি রেহাই পাবে? পেলে তা কিভাবে? হয় খোদ আমেরিকার নীতি বদলালে, নয় আফগান সরকারের পতন ঘটলে। আমেরিকার নীতি দুই চার দশ বছরে বদলানোর সম্ভাবনা যখন নাই তখন ধরে নেওয়া যায় আফগানিস্তানে সরকার বদলাবে। কিন্তু মার্কিন নিষ্ঠুরতার কি অবসান ঘটবে তাতে?

ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিলাসিতায় যদি আরো একটু গা ভাসানোর অনুমতি পাই তো বলি, পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের ষোল নম্বর বৎসরে আরেক ক্ষুদ্র রাজ্য মেলোসের কপালে কী ঘটেছিল তার বিবরণ পড়া যাক। কিন্তু এখানে আমার আর লেখার সুযোগ নাই। সংক্ষেপে লিখি: মেলোস দ্বীপের সকল মনুষ্য হয় নিহত, না হয় দাস হয়েছিল। তবুও আথেন্সের সাম্রাজ্য রক্ষা পায় নাই। এর গভীর কারণ থুকুদিদিস আলোচনা করেছেন।

জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস সমকালীন বোদলেয়ারের কাছাকাছি সময় লিখেছিলেন, মনুষ্যজাতির ইতিহাসের ঘটনা একবারই মাত্র ঘটে না, বার বারই ঘটে। তবে তাঁর মতে, প্রথমবার যদি ঘটে বিধির বিধান বা ট্রাজেডি আকারে, দোসরাবার ঘটে প্রহসন বা হাসির খোরাক হিসাবে। (মার্কস ১৯৭৯: ১২)

নাপোলেয়ঁ বোনাপার্তের নাম ভাঙ্গিয়ে তাঁর ভাতিজার ক্ষমতাদখলের পর মার্কস এই মন্তব্য করেছিলেন।

আথেন্স সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বিধির বিধান অনুসারে। তবে কি মার্কিন সাম্রাজ্য নষ্ট হবে প্রহসনে? মার্কিন সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ আছে। খুব সম্ভবত আফগানিস্তান তার শেষ অপরাধ নয়। আরো আছে। প্রবন্ধান্তরে আমরা তার বিচার করব।

আমিন। অতয়েব আমিন।

....

যুগান্তর, ১৬ নবেম্বর ২০০১

§ ৯

না ক্রুসেড না জেহাদ

১৯৭২ সালে আহমদ ছফা লিখেছিলেন: 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন রক্ত দিয়েই চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি।' (ছফা ২০০৮/খ: ৬/১৯৫)

অন্য সময় কি আমরা মাংস দিয়ে চিন্তা করি? সম্ভবত না। তবুও বলা যায় এখনো আমরা রক্ত দিয়েই চিন্তা করছি। যুদ্ধ শুদ্ধ আফগানিস্তানেই হচ্ছে না। রক্তপাত হচ্ছে আমাদের ভিতরেও।

আমেরিকা ও ইংলন্ডসহ পুরো পাশ্চাত্য জগৎ আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। সেই আক্রমণের বিরোধিতা করতে আমাদের বাধছে কোথায়? আমরা শক্তিহীন বলে? না, আরো কারণ আছে। আমাদের ভয়, পাছে আমরা তালেবানের—তথা এসলামের—সমর্থক হওয়ার অপবাদ পাই!

এসলাম সম্পর্কে আমাদের ভয়ের একটা ইতিহাস আছে। আসলে কি আমরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলেই এসলামকে ভয় পাই, না এসলামকে ভয় পাই বলেই সাম্রাজ্যবাদের তল্পি বহন করি? আজ এই প্রশ্ন আমাদের তুলতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের ভদ্রলোক সমাজে যে পিছুটান তার বিচার প্রয়োজন।

যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুখে বলেন অথচ এসলামের ভয়ে কার্যকর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গড়তে চেষ্টা করেন না তাঁদের কাছেও আমার বক্তব্য একই। ফরহাদ মজহার জেহাদকে শ্রেণী সংগ্রামেরই একটা বিশেষ রূপ বলেছেন। আমি সেই কথার সঙ্গে একমত। আমি ইতিহাস দ্বারা আমার বক্তব্য সমর্থন করব। বলব আফগানিস্তানে বর্তমান পশ্চিমা আগ্রাসনও শ্রেণী সংগ্রামেরই এক ইতর রূপ বিশেষ।

১

প্রথমে ক্রুসেড সম্পর্কে বলি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর সংগ্রামকে 'ক্রুসেড' নাম দিয়েছিলেন। কেন? কিছু পরে আমেরিকার প্রচার বিশারদরা বললেন: তাঁদের সংগ্রাম এসলামের বিরুদ্ধে নয়, শুদ্ধ এসলামি ত্রাসনীতির বিরুদ্ধে। তো ক্রুসেড কথার ব্যবহার কেন? ক্রুসেড কী জিনিস? আমেরিকা দেশের আরব বংশোদ্ভূত অধ্যাপক ফিলিপ হিট্টি ১৯৩৭ সালে লেখা *আরব জাতির ইতিহাস* বইতে ক্রুসেডের ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে:

> প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রিসের এবং গ্রিসের বিরুদ্ধে ইরানের পুরানা যুদ্ধ এই সংঘর্ষেরই প্রথম অধ্যায়ের আগের অধ্যায়। এই সংঘর্ষের মাঝখানকার অধ্যায়ের নাম ক্রুসেড। একালে পশ্চিম এয়ুরোপের সাম্রাজ্য-বিস্তার প্রচেষ্টা এই সংঘর্ষেরই সর্বশেষ অধ্যায়। (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫)

হিট্টি সাহেব আরো বলেন:

> প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দেশভেদ আছে এই কথা সত্য। কিন্তু তাতে কিছু আসতও না, যেতও না। দেশভেদ যে গুরুত্ব লাভ করল তার একমাত্র কারণ দুই জগতের ধর্ম, জাতি ও ভাষাভেদ। আরো খোলামেলা যদি বলা চলে তো বলব: 'মুসলমান প্রধান' এশিয়ার বিরুদ্ধে 'খ্রিস্টান প্রধান' এয়ুরোপের আক্রমণের নামই ক্রুসেড। মুসলমানরা ৬৩২ ইসাবি সালের পর থেকে শুদ্ধ সিরিয়া আর পশ্চিম তুরস্কেই (এশিয়া মাইনর) নয়, স্পেনদেশ আর সিসিলি দ্বীপেও রাজ্য বিস্তার করে আসছিলেন। (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫)

ক্রুসেডের অন্যান্য উস্কানির মধ্যে অধ্যাপক হিট্টি উত্তর এয়ুরোপের টিয়ুটন জাতির লোকদের দেশান্তর গমন আর যুদ্ধজয় মানসিকতার কথাও উল্লেখ করেন। ক্রুসেডের আরো আরো কারণ উল্লেখ করেছেন হিট্টি সাহেব। ১০০৯ খ্রিস্টীয় সালে খলিফা আল-হাকিম জেরুজালেমে স্থিত পয়গম্বর ইসার সমাধিস্থল কথিত স্থানের গির্জা ধ্বংস করেন। হাজার লক্ষ এয়ুরোপীয় হাজি এই জায়গায় হজ করতে আসতেন। ৮০০ সালে ফরাসি দেশের বাদশাহ মহাশার্লের (Charlemagne) কাছে এই গির্জার চাবি উপহার পাঠানো হয়। পাঠিয়েছিলেন জেরুজালেমের প্রধান ধর্মযাজক। তাছাড়া হজে যাওয়ার পথে—বিশেষত পশ্চিম তুরস্ক পার হওয়ার সময়—এয়ুরোপীয় হাজিদের নানা প্রকার জুলুম করা হত।

এসব ছাড়াও শেষ কারণ হিসাবে হিট্টি সাহেব ধর্মপিতা দ্বিতীয় আরবানের নাম নিয়েছেন।

ততদিনে খ্রিস্টান জগৎ দুই কেন্দ্রে ভাগ হয়ে গেছে। ১০০৯ থেকে ১০৫৪ সাল পর্যন্ত ঘরোয়া সংগ্রামে খ্রিস্টান সমাজের কেন্দ্র রোম ভেঙে নতুন কেন্দ্র কনস্তান্তিনের শহর (কনস্তান্তিনোপল, কনস্তান্তিনাবাদ, একালের ইস্তাম্বুল) তৈরি হয়েছে। ততক্ষণে কনস্তান্তিনাবাদ শহরের বাদশাহ আলেক্সিয়ুস কোমনেনুসের রাজ্য তুরস্কের সেলজুক বংশের রাজারা কিছু কিছু কেড়ে নিচ্ছেন। এই সময় রোমের ধর্মপিতা দোসরা আরবান খ্রিস্টান জাতির দুই সাম্রাজ্য এক করার সুযোগ দেখতে পেলেন। ১০৯৫ সালে তিনি কনস্তান্তিনাবাদের বাদশাহের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সমগ্র 'খ্রিস্টান জগৎ' একজোট হয়ে 'মুসলমান জগৎ' আক্রমণ করুক—এই ছিল সেই প্রার্থনার সারাংশ।

এশিয়াখণ্ডের নাম কেন 'মুসলমান জগৎ' আর এয়ুরোপ মহাদেশের নাম কেন 'খ্রিস্টান জগৎ'—সেই মীমাংসায় যাবার সুযোগ এই স্থানে নাই। আগেভাগে দেখতে পাই ধর্মপিতা দুই নম্বর আরবান ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার একটি বাক্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তিনি বললেন: 'এই যুদ্ধ বাধুক। ইহাই আল্লাহর ইচ্ছা'। লাতিন জবানে মাত্র দুই শব্দে বলা হয়: 'দিউস ভুলত'—ভগবান চাহেন। কী চাহেন তিনি? 'শয়তান জাতটার হাত থেকে পবিত্র কবর ছিনিয়ে নাও'—বললেন ধর্মপিতা মহাশয়। যাহাই বলেন তাহাই সই। ইতিহাসবিদ হিট্টি লিখেছেন: 'মানবজাতির সমস্ত ইতিহাসেও সম্ভবত এই বক্তৃতার সমান কাজের বক্তৃতা আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না।' (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৬)

এশিয়ার বিরুদ্ধে এয়ুরোপের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কেন ধর্মের জিগির তুলেছিল তার উত্তর প্রথম ক্রুসেডে পাওয়া গেল। ধর্মপিতা আরবান প্রথম ক্রুসেডের ডাক দেন খ্রিস্টান ১০৯৫ সনের ২৬ নভেম্বর। বছরখানেক পর—১০৯৭ সন নাগাদ—উত্তর ও দক্ষিণ এয়ুরোপের নরমান ও ফিরিঙ্গি জাতির দেড় লক্ষ যোদ্ধা কনস্তান্তিনাবাদে হাজির। বিনা খরচায় এত বড় বাহিনী গঠনে ধর্মই প্রধান সেনাপতির অধিক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই ক্রুসেড দুইশত বৎসর চলেছিল। ইতিহাস-ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে সাত থেকে নয় দফা ক্রুসেডের কথা বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রুসেড কখনো থেমে থাকে নাই। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে এয়ুরোপ পিছু হটে। খ্রিস্টের দুই জগৎ—গ্রিক ও রুমি গির্জা—এক হয় নাই। ইসাবি ১৬ শতকের গোড়ায় পশ্চিমা খ্রিস্টজগৎ আরেক দফা বহুধা বিভক্তির মুখোমুখি হয়। ক্রিস্তোবাল

কোলনের আমেরিকা আর ভস্কো দে-গামার ভারত আবিষ্কার এই নতুন ক্রুসেডেরই অংশ। এই ক্রুসেডের শেষ পর্যায় এখনো চলছে।

সবে পাঁচশ বৎসর পার হয় হয়। এর মধ্যে কী ভূমিকা পশ্চিম এশিয়ার? একাদশ শতকের ক্রুসেডের সময় মুসলমান জগৎ একখণ্ড ছিল না। তখন মিসরের ফাতেমিয়া বংশ আর এরাকের আব্বাসিয়া বংশ লড়াই করছিল ফিলিস্তিনের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য। মাঝখানে সিরিয়া অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য। বর্তমানে এসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরও ক্রুসেড শেষ হয় নাই। ইতিহাস রসিক পুরুষ। প্রথম ক্রুসেডের সময় এয়াহুদিরা ছিল শয়তানের জাত। এখন তারা দেবতার দলে।

২

১০৯৭ সালে কনস্তান্তিনাবাদে সমবেত ধনী-গরিব সকল খ্রিস্টান যোদ্ধাই বুকে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই সেই যুদ্ধের নাম ক্রুসেড। এয়ুরোপে এখনো ক্রুসেড মানে শুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, জনযুদ্ধও। কাজেই ক্রুসেডকে নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এর জনপ্রিয়তা বা গণ-আবেদনের তাৎপর্য কী তাও ভেবে দেখতে হয়। হিট্টির বক্তব্য আমরা শুনেছি। তিনি বলেন, ক্রুসেড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী যুদ্ধ। (হিট্টি ১৯৮২: ৬৩৫)

পশ্চিমের কোন কোন অধ্যাপক দেখানোর প্রয়াস পান যে ক্রুসেড মানে নিতান্ত স্বার্থের সংঘাত, অর্থনৈতিক সংঘাত। ধর্ম এখানে সাধারণ ছুতা মাত্র। (লামন্তে ১৯৪৬) আমরা দ্বিমত করি। ধর্মের নাম নিলে—প্রভু যিশুর মাজার-শরিফ দখলের ডাক দিলে—লাখো মানুষ নাচে, তাই ঐ ডাক দেওয়া হয়।

কিন্তু মানুষ নাচে কেন? এই প্রশ্নটা জেহাদের বেলায়ও তুলতে পারতাম। অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের বই পড়েও জানা যায়, জেহাদ এর আরবি মূল ক্রিয়া 'জহদ'। মানে চেষ্টা করা। অধ্যাপক আহমেদ আবদুল কাদের লিখেছেন, শব্দটি 'জুহুদ'। (কাদের ১৯৯৭: ৭; তুলনীয়, ভদ্র ১৯৯৪: ২৮৬)

ইতিহাসে জেহাদের অর্থও দাঁড়িয়েছে জনযুদ্ধ। এর সচরাচর বাংলা অনুবাদ ধর্মযুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এর তাৎপর্য কী? ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীনে ছিল তখন জেহাদ নিয়ে বিশেষ তর্ক দেখা দিয়েছিল। আমরা এখানে তার সার গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

প্রথমে বাংলাদেশের এবং পরে ভারতের অন্যান্য এলাকার রাজা মহারাজারা ইংরেজের হাতে পরাজিত হয় অথবা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে।

অভিজাত শ্রেণীর একাংশ ইংরেজের সহযোগী হয়, অন্য অংশ ধ্বংস হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বাংলায় এবং অন্যত্র ভদ্রলোক শ্রেণী—বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতি—ইংরেজের সহযোগিতা করছে তখন বাংলাদেশের কৃষক সমাজ—বিশেষত মুসলমান কৃষক সমাজ—ইংরেজের সহযোগী ও ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এই লড়াইয়ের নাম তারা দেয় জেহাদ।

বাংলাদেশে বারাসতের মির নিসার আলি প্রকাশ তিতুমীর এমনই এক জেহাদের নেতা। তিতুমীরের ভাবগুরু পাঞ্জাব অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। সৈয়দ আহমদের সংগ্রাম প্রথমে পাঞ্জাবের শিখ রাজার বিরুদ্ধে চালিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারি কর্মচারীদের লেখা থেকেও প্রমাণ হয় তাঁর লড়াইয়ের আসল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ কর্তব্য কিনা—এই বিচার পাওয়ার জন্য সৈয়দ আহমদ মক্কা সফর করেন।

সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লড়াইকে আজও আমাদের দেশের ভদ্রলোক লেখকরা কিভাবে দেখবেন মন ঠিক করতে পারেন নাই। ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখকরাও এই সব কৃষক বিদ্রোহকে 'পশ্চাৎপদ কৃষক চেতনার চিহ্ন' জ্ঞানে বিচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাব এও হতে পারে যে এসব চেতনা অগ্রসর চিন্তারই পূর্বঘোষণা। তা নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার উপর। ইতিহাস অতীত নয়, বর্তমান।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস এবং মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন যাঁদের বিচারে সমার্থক তাঁরা সৈয়দ আহমদ বা তিতুমীরের স্থান নির্ণয় করতে সফল হবেন না। তাঁদের চোখে এদের আন্দোলন বা সংগ্রাম আসল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়, তার প্রাক-ইতিহাস মাত্র। বামপন্থী ভদ্রলোকদেরও সমস্যা এই ধর্ম জিনিসটা। কৃষকরা আন্দোলনের জন্য মসজিদ ব্যবহার করেছেন—কোন কোন ইতিহাস লেখক তা জেনে লজ্জায় ভোগেন। (সেনগুপ্ত ১৯৭৪)

বিখ্যাত রণজিৎ গুহ এমন লজ্জা পান না। তবু তাঁর গুরুতর *পরাধীন ভারতে কৃষক বিদ্রোহের গোড়ার কথা* বইতে তিনি সৈয়দ আহমদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা বলতে গেলে করেনই নাই। (গুহ ১৯৮৩) গৌতম ভদ্র তিতুমীরের লড়াই নিয়ে গবেষণা করেছেন কিন্তু সৈয়দ আহমদ নিয়ে বলেন নাই। আমার প্রস্তাব তা করা গেলে ভালো হত। সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে ইংরেজ লেখকরা কী বলেছেন তা আলোচনা করলে জেহাদ কী বস্তু ভালো জানা যায়। সেই আলোচনায় আমরা রণজিৎ গুহের পদ্ধতি অনুসরণ করব।

অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তীর কথা অনুসারে 'সাব অলটার্ন কথা বলতে জানে না'—-গরিবের ভাষা নাই। কিন্তু গরিব সম্পর্কে ধনিক যা বলে তা থেকে লুকানো ইতিহাস বের করে আনা যায়। রাজকর্মচারী উইলিয়াম হান্টারের নামকরা *আমাদের ভারতীয় মুসলমান* বইটির উপশিরোনাম ছিল 'তারা কি রাণীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দায়বদ্ধ?'

এই বইয়ের মোট চার অধ্যায়। শেষ অধ্যায়ে ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতি ইংরেজ সরকার কী কী অবিচার করেছে তার একটা ফর্দ আছে। হান্টার সাহেব মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করেছেন এই দুর্নামও তাঁকে দেওয়া হয়। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৫) তবে হান্টারের বইয়ের পয়লা তিন অধ্যায়ে মুসলমান সমাজের ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মুসলমান তোষণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। (দে ১৯৯৮: ২)

পরবর্তী মুসলমান নেতাদের শুভবুদ্ধির তারিফ করার তাড়নায় এই দুরাচার নেতাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্র। আবদুল লতিফ বা কারামত আলির ফতোয়ার সাথে তুলনার জন্য আগের ফতোয়ার উল্লেখ করা। শেষের এই নেতারা ইংরেজ শাসনকে জায়েজ ঘোষণা করেছিলেন। আলিগড় খ্যাত সৈয়দ আহমদ বা চেরাগ আলি প্রমুখও এই সহযোগিতা পথেরই পথিক।

অসহযোগীদের নেতা বেরিলির সৈয়দ আহমদ। নিজেদের অসহযোগ আন্দোলনকে তাঁরা 'জেহাদ' নাম দেন। 'জেহাদ' শব্দটির প্রতি এই কালের সাম্রাজ্যবাদপন্থী বা সহযোগী ঐতিহাসিকদের ন্যক্কার এমনই তীব্র যে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিধান থেকে এই অধ্যায়টি পুরোপুরি খারিজ করে দিতেও কসুর করেন না। এই আন্দোলন ও সংগ্রামকে নিতান্ত 'সাম্প্রদায়িক' বলেও নিন্দা করা হয়।

পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর একজন বর্ণহিন্দু পণ্ডিত লিখেছিলেন: ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনকে শুদ্ধ বিদেশি-রাষ্ট্র বিরোধী না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মী বা অমুসলমান-রাষ্ট্র-বিরোধী বলাই সঙ্গত। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩) শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী সত্য সত্যই লিখেছিলেন:

> হয় বল প্রয়োগে বিধর্মী রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা বিধর্মী রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া কোন মুসলিম-রাষ্ট্রে গিয়া বাস করিতে হইবে, মুসলমানের পক্ষে এ ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা নাই। ইহাই ছিল ওয়াহাবিদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব ওয়াহাবি আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না। মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'জাতি' আখ্যা দিলে ইহাকে ভারতে মুসলিম-জাতির জাতীয় আন্দোলন বলা যাইতে পারে। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩)

বিনয়েন্দ্রবাবুর এই অপমত শুদ্ধ জনৈক বর্ণহিন্দু ইতিহাস লেখকের মত হলে কথা ছিল না। এই মত 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' সকল লেখকেরই। কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত। একালের 'মৌলবাদ' কথাটার মতন 'ওয়াহাবি' কথাটাও গালি মাত্র। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লোকেরা নিজেদের দলকে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলতেন। ঘৃণায় ও ন্যক্কারে ইংরেজ সরকার সেই নাম মুখে আনে নাই, বর্ণহিন্দু লেখকরাও আনেন না। প্রগতিশীলরাও তাই করছেন।

তারপরও সত্য গোপন করা সম্ভব হয় নাই। বর্ণহিন্দু লেখকের লেখা আর একটু উদ্ধার করা যাক। পাঠিকা বিচার করার সকল অধিকার নিজ হাতে রাখেন। চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন:

> এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কারমূলক হইলেও শুধু ধর্মের সীমানাতে আবদ্ধ ছিল না। আরবদেশে ইহার উৎপত্তি এবং রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মসংস্কারের দিক দিয়া ইহাকে 'পিউরিটান'-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ধর্মে অনাড়ম্বর সরলতা, বিলাসব্যসন পরিত্যাগ, আর্থিক সাম্য এবং বিধর্মীর জেহাদ-প্রচারই ওয়াহাবিদের কাজ ছিল। বিধর্মী শিখ এবং বিধর্মী খ্রিস্টান-রাজশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিরা ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহারা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ধনীর শত্রুতাসাধন করিয়াছে এবং ইসলাম রাষ্ট্র স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রকৃত মুসলমানের ভারতে স্থান নাই, এই বিশ্বাসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ইহাদের ঘাঁটি ছিল: ইংরেজ শাসকেরা ইহাদের শক্তি এবং কর্মকুশলতাকে প্রথমদিকে অবহেলার চোখে দেখিয়াছিলেন। পরে ইংরেজদের আদালতে বিচারকালে ইহাদের কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকের চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। বিধর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য সারা দেশের মুসলমানের নিকট হইতে ইহারা এক প্রকার খাজনা আদায় করিয়াছে এবং ধনী মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া চর্ম ব্যবসায়ী মুসলমানগণ, ইহাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান ইহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে রাজি হয় নাই তাহাদের শাস্তি বিধান করিয়া তাহাদের মসজিদ পর্যন্ত ইহারা পোড়াইয়াছে। (চৌধুরী ১৩৫৬: ২–৩)

এই বিবরণীর প্রত্যেকটি শব্দ যদি সত্য সত্য সত্য হয় তবে ঘোর লাগে, প্রশ্ন জাগে: 'জেহাদ' কী বস্তু, কার লড়াই এই জেহাদ? ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর, বিধর্মীর বিরুদ্ধে মুসলমানের, জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান প্রজার, নারাজ মুসলমানের বিরুদ্ধে

জেহাদি মুসলমানের—সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই? বিনয়েন্দ্রবাবুর উত্তর এই রকম:

> ওয়াহাবিরা মোটের উপর ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে ছিল এ কথা সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম-নিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান সাধনা। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩)

সৈয়দ আহমদের মুরিদরা ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় একেই বলে 'স্টেট অব নেচার' বা সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধচিহ্নিত 'স্বাভাবিক অবস্থার দেশ'। 'হারব' শব্দের অর্থ যুদ্ধও হয়, শত্রুও হয়। অন্তত এই স্থলে।

তার বিপরীত অবস্থার নাম সভ্য দেশ (সিভিল সোসাইটি) অথবা শান্তির দেশ (দারুল এসলাম)। দারুল আমান শব্দেরও একই অর্থ। সৈয়দ আহমদের অনুসারীগণ সভ্যতার শাসন কায়েম করার জন্য লড়েছিলেন। তাঁদের চোখে সভ্যতা ও শান্তি ওরফে এসলাম সমার্থক শব্দ।

গোলমালটা এই জায়গায়। সভ্যতা ও এসলাম সমার্থক কিন্তু সম-শব্দ নয়। দুই শব্দেরই এক পদার্থ। অর্থাৎ পদার্থ এক হইলেও পদ কিন্তু দুইটা। যেমন পানি ও জল। এই গোলমালটা ভাবের নয়, ভাষার। গণ্ডগোলটা মেটাফর ওরফে রূপকথার। সাম্প্রদায়িকতা মেটাফরনির্ভর। ইতিহাসে তার আরো নজির পাওয়া যায়।

৩

যখন ভারতে জাতীয় আন্দোলন জেহাদের রূপ ধারণ করেছিল তখন জাতীয় আন্দোলনকারীদের নাম হয় ওয়াহাবি। পরবর্তী সময় যখন জাতীয় আন্দোলন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির রূপ গ্রহণ করে তখন তাদের নাম হয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। এই দুই পর্যায়ের তুলনায় অনেক উপকার হবে। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি জনসাধারণকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে বাধ্য ছিল, তারা ভদ্রলোকের উপর নির্ভর করেছে।

কিন্তু জেহাদি আন্দোলন ছিল কৃষক সমাজে বিস্তৃত এবং সরাসরি বিদেশি শাসন বিরোধী। ১৮৬৪ সনের পর চার দফা বিচার হয়েছে এ জাতীয় বিপ্লবীদের। সেই বিচারের নথিপত্রের সারাংশ উইলিয়াম হান্টার তাঁর *আমাদের ভারতীয় মুসলমান* নামক সুবিখ্যাত বইতে প্রচার করেন।

হান্টারের বয়ান অনুসরণ করলেই বোঝা যায় তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সারা ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলন চরিত্রে ছিল এক জাতীয় কৃষক বিদ্রোহই। এর ব্যাপ্তি ছিল পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম অবধি। ওয়াহাবি বিপ্লববাদীরা লড়াই করেছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে কিন্তু তাঁদের টাকাপয়সা আর যোদ্ধার জোগান গিয়েছিল তো সারা দেশ থেকেই।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে তালেবানরা এখন লড়াই করছেন তাদের সাথে পুরানা ওয়াহাবিদের অনেক মিল চোখে পড়ে। তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন প্রচারে আমাদের দেশের মার্কিন বন্ধুরাও মজেছেন। আমেরিকার অন্যায় যুদ্ধ যাঁরা সমর্থন করেন, যাঁরা বলছেন তালেবানদের হত্যা করা দরকার, আমি তাঁদের তারিফ করি। তবে যাঁরা আফগানিস্তানের জন্য দুঃখ করছেন অথচ মার্কিন আগ্রাসনের চরিত্র বুঝতে সক্ষম নন, কৃষক বিদ্রোহের ভাষায় তাঁরা বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। কৃষক বিদ্রোহীর চৈতন্যে তাঁরাও সমান ন্যক্কার পাওয়ার যোগ্য। (গুহ ১৯৮৩: ১৯৯-২১৯)

উইলিয়াম হান্টারই ভালো সাক্ষী। তিনিই বরং শেষকথা বলুন, কেমন বিপ্লবী ছিলেন ওয়াহাবিরা। শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসই মানবজাতির ইতিহাস—অন্তত আমাদের জন্য ইতিহাস—বলেছিলেন কার্ল মার্কস। সেই বিচারে জাতীয় আন্দোলনও শ্রেণী সংগ্রামেরই বিশেষ রূপ বটে। এই রূপে এক গুচ্ছ শ্রেণী আরেক গুচ্ছ শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ে। জাতীয় সংগ্রামে একপক্ষে দেশি ও বিদেশি শক্তি জোট বাঁধতে পারে। অপর পক্ষেও তাই। তবু সেই লড়াইয়ের চরিত্র মার্কস প্রস্তাবিত শ্রেণী সংগ্রামের বিধিবর্হির্ভূত হয় না। এই প্রস্তাব নারী আন্দোলন বা অন্য কোন পীড়িত, মজলুম শক্তির আন্দোলনের বেলায়ও কার্যকর। ওয়াহাবি আন্দোলনকে আমরা যে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলি না, তার কারণও শ্রেণী সংগ্রামই। এই ভাষার মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম জারি আছে।

দেখা যাক ইংরেজ কর্মচারী মহাত্মা হান্টার কোন প্রকারে তাঁর ক্রুসেড অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম মানে জেহাদ চালিয়েছিলেন। হান্টার লিখেছেন:

> পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ। (তিনি ছিলেন রায় বেরিলির বাসিন্দা। ১২০১ হিজরির মুহররম মাসে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়।) যাদেরকে আমরা পিন্ডারি শক্তির নির্মূলকালে অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তিনি ছিলেন সেই সাহসী ব্যক্তিদের অন্যতম। একজন মশহুর দস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ। বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগঞ্জের উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান

> শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চলসমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে সকল মুসলমান দস্যুর পক্ষে নিজের পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তার উপর শিখদের অত্যধিক হিন্দুয়ানিতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের ধর্মান্ধতা আরো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিমানের মত নিজেকে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির একজন মশহুর আলেমের নিকট (শাহ আবদুল আজিজ ১৭৮৬–১৮২৩) শরিয়তি শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে সাগরেদি করার পর সৈয়দ আহমদ এসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় এসলামে যেসব অনাচার বা বেদা'ত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। (হান্টার ১৯৭৪: ৪; অনুবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত)

হান্টার আরো জানাচ্ছেন:

> ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চল সফর করে ফিরলেন। তখন তার মুরিদগণ তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ নফরের মতো খিদমত করতো এবং বহু দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মত খালি পায়ে তাঁর পালকির দুধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। পাটনায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের ফলে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এতদূর বেড়ে গেল যে একটা সাধারণ সরকারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়ে পড়ল। তাঁর সফরকালে যেসব শহর পথে পড়ত সেগুলিতে নায়েব পাঠিয়ে তিনি তেজারতি জাকাত সংগ্রহ করতে লাগলেন। মুসলমান বাদশাহদের সুবাহদার নিযুক্ত করার মত হুকুমনামা জারি করে তিনি চারজন খলিফা ও একজন বড় খতিব নিযুক্ত করলেন। এভাবে পাটনায় একটা স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে গঙ্গা নদীর গতিপথ বেয়ে এবং পথিমধ্যে বড় বড় শহরে অসংখ্য মুরীদ ও তাদের নায়েব নিযুক্ত করে তিনি কলকাতার দিকে রওয়ানা হলেন। কলকাতায় সাধারণ মুসলমানেরা তাঁর কাছে এমনভাবে দলে দলে জমায়েত হতে লাগল যে, প্রত্যেকের হাতে হাত দিয়ে বয়েত দান করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। তখন তিনি মাথার পাগড়ি খুলে জমায়েতে ছড়িয়ে নিয়ে বললেন যে কেউ তার পাগড়ি ছুঁয়ে দেবে তাঁর মুরিদ হয়ে যাবে। ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ করতে যান এবং এভাবে তার পূর্বতন দস্যুবৃত্তি হাজির পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বে শহরে উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতই সাফল্যমণ্ডিত হল। কিন্তু ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এই প্রেসিডেন্সি শহরের চেয়ে আরো উর্বর ক্ষেত্র এই দস্যু-দরবেশের অপেক্ষায় ছিল। উত্তর ভারতে ফেরার পথে বেরেলি জেলার তার জনপল্লীতে এক বিরাট হাঙ্গামাবাজ অনুচরের দল তাঁর সহযোগী হল। ১৮২৪ সালে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের বুনো পাহাড়ীদের মধ্যে উদিত হয়ে সরাসরি পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহরগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। (হান্টার ১৯৭৪: ৪–৬; অনুবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত)

জার্মানির ১৬ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ, ১৭ শতকিয়া ইংলন্ডের পিউরিটান বিপ্লব এবং চিনদেশের ১৯ শতকিয়া তাইপিং বিদ্রোহের ইতিহাসও একই চরিত্রের। আমরা এখন এসব বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ইতিহাস যত পারি তত কম জানার সংগ্রাম করছি। কারণ এসব বিদ্রোহ আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এখনকার শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল নয়। ভুলে যাওয়ার চেষ্টাও শ্রেণী সংগ্রামের অংশ। একে যদি শ্রেণী সংগ্রাম না বলি তো শ্রেণী সংগ্রাম কি গাছে ধরে না বাঁশে ধরে? আমরা চাই বা না চাই শ্রেণী সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হয়েছে।

মজার ব্যাপার ২১ শতকের গোড়াতেও এই সংগ্রাম পৃথিবীর মালভূমি বরাবর আবার জেহাদ নামে দেখা দিয়েছে। ফরহাদ মজহার জেহাদকে জেহাদ বলে সঠিক কাজটাই করেছেন। জেহাদই এখানে শ্রেণী সংগ্রামের, কৃষক যুদ্ধের রূপক। মাও জেদং দুনিয়ার শহরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার গ্রামের লড়াইকে শ্রেণী সংগ্রামের সম্মান দিয়ে ভুল করেন নাই। আমরা আফগান দেশ বা বাংলাদেশে কি দুনিয়ার গ্রাম হয়েই বসে আছি না?

মাও জেদংয়ের জেহাদ আর মোহাম্মদ ওমরের শ্রেণী সংগ্রাম এখানেই মিত্রভাব স্থাপন করেছে।

....

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা সেমিনারে কথিত, ২৩ নবেম্বর ২০০১
প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারি ২০০২

সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি

§ ১০

আধুনিক ও উত্তরাধুনিক

Il est vrai que la grande tradition s'est perdue, et que nouvelle n'est pas faite.

সনাতন জীবনধারা শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু নতুন জীবনধারার আজও তৈরি হয় নাই—কথাটা সত্য বটে।

—শার্ল বোদলেয়ার (১৯৬৪/খ: ১৬৪–৬৫)

এমন এক যুগ ছিল যখন দেশবাসী জনসাধারণের মাথাপিছু আয় দেখে জাতীয় উন্নতি বা অনুন্নতি মাপা হত। সেই যুগ, খবরে প্রকাশ, আর নাই। তবে পুরানা যুগের জায়গায় নতুন কোন যুগ এল বলা মুশকিল।

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি আয় দেখে উন্নতি মাপার জায়গায় 'নতুন' এক মাপকাঠি ব্যবহার শুরু করেছে। এই কাঠির নাম 'মানব উন্নয়ন' বা মূল ইংরেজি বয়ানে যেমন বলে হিয়ুম্যান ডেভেলপমেন্ট (human development)। ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত এক প্রচারপত্র মোতাবেক মানব উন্নয়ন 'সাধারণ মানুষের পছন্দের আওতাবৃদ্ধির পথ'। পছন্দের আওতা—জাতিসংঘ বলছে—কেতাবি হিসাব অনুসারে অনন্ত এবং কালে কালে পরিবর্তনের বিষয়ও বটে।

তবে উন্নয়নের যেই তলায়ই হোক, তিনটি জিনিস না হলে সাধারণের চলবে না। এদের মধ্যে এক নম্বরে পূর্ণ ও সুস্থ পরমায়ুর কথা আসে। দুই নম্বরে আসে বিদ্যাবুদ্ধির কথা। শেষ তথ্য, তিন নম্বরে আসে ভদ্র জীবনযাপনের উপযুক্ত আয়-উপার্জন বা ধনসম্পত্তির কথা। এসব কথায় কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।

দুঃখের মধ্যে আপত্তির বিষয় একটি আছে। যখন বলা হয় এই তিন জিনিসের মধ্যেই আপনাকে পছন্দ করতে হবে তখন আপনি কী করবেন? যদি বলা হয় আপনি আয় ভালো পাবেন কিন্তু আয়ু পাবেন অল্প, নেবেন কি? অথবা যদি বলা হয় বিদ্যাবুদ্ধি অনেক হবে আপনার কিন্তু চিরদিন আপনাকে ফকির থাকতে হবে। নেবেন কি এই পছন্দের ভার? ঘটনা যদি এমন হত যে আপনি ইচ্ছা হয় বেছে নিন, ইচ্ছা না হয় ছেড়ে দিন তবে একটা কথা ছিল। আসল ঘটনা কিন্তু সেই রকম নয়। অন্য রকম।

বাছাই করা বা না করার স্বাধীনতা আপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নাই। বাছতে আপনি বাধ্য। অথবা বেছে না নেওয়ার কিংবা ছেড়ে দেওয়ার স্বাধীনতা আপনার নাই। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিও একপ্রস্ত বিজ্ঞাপন বৈ নয়। এর পিছনে যেই দাতার (মানে বলছিলাম কিনা বিজ্ঞাপনদাতার) দল কাজ করছেন তাঁরা ঘোষণা করেছেন 'মানব উন্নয়ন মানে সাধারণের বাছাই করার সীমা বাড়ানো'। বাছাই করার—মানে কোনটাই না চাওয়ার বা সবটাই চাওয়ার—স্বাধীনতা এই সীমার ভিতর পড়ে না। সেই কথা না বললেও, শুনেছি, অনেকের কাছে পরিষ্কার। (ইউএনডিপি ১৯৯৫)

'পছেন্দর স্বাধীনতা' বা 'মানুষের অধিকার' কোন এক যুগে সমার্থক পদজ্ঞানে চালু ছিল। সেই যুগকেই আমরা আধুনিক যুগের সূচনাকাল বলে জানি। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল—বিশেষ এয়ুরোপ মহাদেশে—রটিত হয়েছে আধুনিক যুগ বা মানুষের অধিকারের যুগ শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্যের মধ্যে ফরাসি মনীষী মিশেল ফুকো ঘোষণা করেছিলেন: 'মানুষ' কথাটি তেমন প্রাচীন নয়, সমুদ্রতীরে বালিতে আঁকা মুখের মতন একদিন তা ধুয়েমুছে যাবে। (ফুকো ১৯৯৪: ৩৮৭)

এতদিনে মনে হচ্ছে ফুকোর অতীতবাণী সত্য হতে চলেছে। পছন্দের স্বাধীনতা এখন পছন্দের অধীনতায় উন্নীত হয়েছে। এখন আপনি পছন্দ করতে বাধ্য। পছন্দ না করে আপনার উপায় নাই। এই নতুন যুগের নাম ইংরেজি-ফরাসি জবানে দাঁড়িয়েছে পোস্ট মডার্ন (post-modern)। আমাদের দেশে সাংবাদিকরা বলেন 'উত্তরাধুনিক'। পছন্দের স্বাধীনতা থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আর এখন পছন্দের অধীনতা অনুসারে আপনি হয় সেই সাম্রাজ্য গ্রহণ করবেন নয়তো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার নামে 'সন্ত্রাস' করবেন। দুইয়ের এক আপনাকে বেছে নিতেই হবে। বেছে নেওয়া থেকে আপনার পরিত্রাণ নাই। এই পরিস্থিতির নামই দাঁড়িয়েছে 'উত্তরাধুনিক' যুগ।

আমাদের ধারণা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কিংবা সাম্রাজ্য ও সন্ত্রাসের মধ্যে একটা বা অন্যটা বেছে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা সম্ভব কিনা তা যাচাই করা হয় নাই। সেই কারণে আধুনিক ও উত্তরাধুনিক দুই নীতিরই পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই পরীক্ষার মুখাগ্নি করছি মাত্র।

১

ফরাসি মনীষী জাক লাকাঁর বিশ্লেষণ করে স্লোভেনিয়াবাসী পণ্ডিত শ্রীমতী আলেনকা জুপানচিচ এই বিচারের সূচনা করেছেন আলান পাকুলা নির্মিত *সুফিয়ার নির্বাচন* (*Sophie's Choice*) ছবি ভর করে। এই ছবির এক স্থলে সুফিয়াদেবী আপন জরায়ুজাত এক ছেলে ও এক মেয়েসহ আউসভিৎস বন্দিশিবিরে এসে হাজির হন। তখন এয়ুরোপে মহাসমর চলছে। জনৈক জার্মান সেনা কর্মকর্তা এগিয়ে এসে সুফিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জানতে চান তিনি কম্যুনিস্ট কিনা। জবাবে সুফিয়া জানান তিনি কম্যুনিস্টও নন, এয়াহুদিও নন। পরিচয়ে তিনি অন্য, একে তো পোলদেশি অন্যাধারে খ্রিস্টান ধর্মের ক্যাথলিক মজহাবের সদস্যা। জার্মান কর্মকর্তা তখন তাঁকে বলেন তোমাকে পছন্দের স্বাধীনতা দিচ্ছি। দুই সন্তানের একটি তুমি রাখতে পার। অপরটি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। গ্যাসের চুলায় যাবে ওটা।

তিনি কম্যুনিস্ট বা এয়াহুদি, অর্থাৎ অসাধারণ নন। পোলদেশি ও ক্যাথলিক, মানে সাধারণ। এই কারণেই ওঁকে পছন্দের স্বাধীনতা বা মানুষের অধিকার (অথবা মানবাধিকারও বলা যায়) দেওয়া হল। সুফিয়া প্রথম প্রথম গাইগুই করেন। জার্মান কর্মকর্তা বার বার পছন্দের স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। শেষ মুহূর্তে কর্মকর্তা যখন দুই সন্তানকেই বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন তখন সুফিয়া দুজনের একজনকে বেছে নিলেন।

অন্তত একজন প্রাণে বাঁচুক। কিন্তু এই পছন্দের সময় সুফিয়ার মুখ বেদনায় বাঁকা হয়ে আসে, মনে হয় সে ভেংচি কাটছে। আবহে ভেসে আসে তাঁর কন্যার কণ্ঠ, কান্না ও চিৎকার। চলচ্চিত্রে দেখি শেষমেশ সুফিয়ার নির্বাচনে মেয়েটিই হেরে যায়। সুফিয়াও কাঁদতে পারেন নাই। গ্রাহকযন্ত্রের কল্যাণে আমরা দেখি তাঁর ব্যাদান করা মুখ স্থির। (জুপানচিচ ২০০০: ২১৩–১৪)

যেখানে ভাষার শেষ সেখানেই—আমরা বাংলায় বলি—অনির্বচনীয়ের শুরু। এই অনির্বচনীয়েরই এয়ুরোপীয় নাম—লাকাঁ রেখেছেন—অখিল

(real)। তাই অখিল শব্দে আমরা বুঝি নির্বাক বা অবাক। সুফিয়ার নির্বাচন শুদ্ধ সুফিয়াকে কেন আমাদেরও অবাক করে। মানে আমরা গেঁথে (suture) যাই। সুফিয়ার নির্বাচনেরই অপর নাম--আমরা সবিনয়ে সবাক করব— উত্তরাধুনিক যুগ বা মানব উন্নয়ন। মাশাল্লাহ!

সুফিয়া কী পেল, কী হারাল এই নির্বাচনে? দুই সন্তানের জীবনের বদলা হিসাবে যদি সুফিয়াকে নিজ জীবনই দান করতে হত, তো এই নির্বাচনে শরিক হতে হত না তাঁর। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁর নাই। জীবন অতি তুচ্ছ জিনিস নয়। সেটাও সই। দেওয়া যায় সেই অমূল্য জীবনও। কিন্তু সুফিয়াকে যা দিতে হয়েছে তা জীবন নয়, জীবনের অধিক কিছু। আমাদের বঙ্গভাষায় এর নামই ভক্তি।

জীবন আমার আছে, প্রয়োজন হয় দিতে পারি। কিন্তু আমাকে এখানে দিতে হয়েছে এমন কিছু যা আমার নাই, যার মালিক আমি নই। জীবন আমার হাব (have)। মানে আমার জীবন আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি যে আমার হাব নই, ভাব (being)। অর্থাৎ আমার ভাব আমার কাছে নাই। সুফিয়াকে এই খোদ ভাবই দিতে হয়েছে। হাব যদি মৃত্যুর এই পারে হয়, ভাব জীবন-মৃত্যুর ঐ পারে। কেবল হাবই নির্বাচনের আওতায় পড়ে, মানুষের স্বাধীনতার তালিকায় ওঠে। ভাব নয়। ভাব নির্বাচনের পরপারে। ভাব মনুষ্যের অধিকারের অংশ নয়।

মানুষকে যখন এমন জিনিসও দিতে বাধ্য হতে হয় যা তার নিজ বা ভাবসম্পদ নয় তখনই ভাষা বা বাক হয়ে ওঠে অবাক। তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের যুগকে বলা হচ্ছে এই অবাক নির্বাচনের যুগ বা উত্তরাধুনিক।

এই পরিস্থিতির সামনে আমাদের করার কিছু নাই। এই কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে উত্তরাধুনিক মানে 'নিজ জীবনের বাইরে আর কিছু নাই'—এই জ্ঞান। বহুধাবিভক্ত (plural), ছড়ানো ছিটানো (local) এবং মুখামুখি (immanent) উত্তরাধুনিক নীতির এই বৈশিষ্ট্য কি আধুনিক নীতির বিকল্প? মোটেও নয়। সুফিয়ার সামনে নিজের প্রাণ বিসর্জনের স্বাধীনতাও নাই কেন? কারণ স্বাধীনতা বা নির্বাচনের ছদ্মাবরণে উত্তরাধুনিক যুগ সন্ত্রাসবাদী।

২

আমাদের প্রস্তাব উত্তরাধুনিক সন্ত্রাসের সঙ্গে আধুনিক ত্রাসের বা সাম্রাজ্যের যোগ নিবিড়। তাই বিকল্প অনুসন্ধানের আগে পরীক্ষা করা দরকার আধুনিক নীতিই বা কী বস্তু? জাক লাকাঁ দেখাচ্ছেন আধুনিক নীতির উদ্ভবের সঙ্গে উত্তম পুরুষের (ego) ত্রাস কিংবা স্বৈরাচার জড়িত। উদাহরণটা তিনি দিয়েছেন প্রাচীন গ্রিসের *আন্তিগোনে* নাটক সম্বল করে। (লাকাঁ ১৯৯৭)

রাজা ক্রেয়ন আদেশ করেছেন যুদ্ধে নিহত আক্রমণকারী পলিনিকেসকে যথানিয়মে কবর দেওয়া যাবে না। দেওয়ার চেষ্টা করলে নিশ্চিত শাস্তি মৃত্যু। তা জেনেশুনেই আন্তিগোনে সিদ্ধান্ত নেন তিনি আইন অমান্য করবেন। এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে আন্তিগোনের অপর বোন ইসমেনে রাজি হন না। আন্তিগোনের নির্বাচনও এক প্রকার অসম্ভব নির্বাচনই। মৃতের প্রতি কর্তব্য পালনের বিনিময়ে নিজেকেও মৃত বানাতে হবে। আন্তিগোনের নির্বাচন এই দুই বিকল্পের মধ্যে। প্রথম বিকল্প কর্তব্য বা পারিবারিক দায়। জাক লাকাঁ বলেছেন এরই নাম শুদ্ধ বাসনা (desire)। দ্বিতীয় বিকল্প আত্মরক্ষা বা রাষ্ট্রের দায়। এর অপর নাম কাপুরুষতা বা কর্তব্যে বিচ্যুতি (bad faith) যা বাসনার বেচাকেনায় রাজি হয় নাই। অনন্ত বাসনার বিনিময়ে সে এক বাসনাকেই সঙ্গী করেছে।

জার্মান পণ্ডিত হেগেলসুদ্ধ অনেক মনীষী আন্তিগোনের সৌন্দর্যের ও সাহসের তারিফ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বলেছেন ক্রেয়ন ও আন্তিগোনে দুজনই দুই দিক বিচারে সঠিক। একজন পরিবারের (তথা দিব্য) কর্তব্য পালন করেছেন: কারণ ভাইয়ের কবর দেওয়া বোনের দিব্য কর্তব্য। মানুষের সৎকার মানুষের কর্তব্য, ফরজ। আরজন রাষ্ট্রের (তথা সমাজের) কর্তব্য করছেন: বিদ্রোহীর শাস্তি দেওয়া, আইন অমান্যকারীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। দুই নীতির সংঘাতে সমানে সমান লড়াই হয়েছে। তাই এই সংঘাতের নাম—হেগেল বলেন—ট্রাজেডি। নীতির সঙ্গে নীতির বিয়োগ ঘটেছে এই নাট্যকর্মে। এই বিয়োগ অমোঘ।

এই নাটকের বিচারে জাক লাকাঁ অন্য কাঠি ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন এখানে ক্রেয়নের যুক্তি আধুনিক মানুষের বা উত্তম পুরুষের যুক্তি। উত্তম পুরুষের যুক্তির সবচেয়ে সংহত প্রকাশ ঘটিয়েছেন সতের শতাব্দীর ফরাসি পণ্ডিত রনে দেকার্ত। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি: 'আমি ভাবি, তাতেই

প্রমাণ আমি সত্য'—উত্তম পুরুষের বা বক্তার অহঙ্কার (অহম মানে আমি) বা আমিত্ব প্রকাশ করে। যখন কোন উত্তম পুরুষ বলেন 'আমি বলছি আমি মৃত' তখন বোঝা যায় উদ্ধারচিহ্নের ভিতর ব্যবহৃত দুই 'আমি' এক 'আমি' নয়।

যে মানুষই ভাষায় কথা বলে বা সবাক হয় তাকেই ভাষার অধীনতা স্বীকার করতে হয়। তাই সে যখন ভাবে তখন প্রমাণ হয় ভাষাই সত্য—আমি তার উপসত্য মাত্র। ক্রেয়ন যে রাজা বা আইনের বিধাতা সেই সত্যও সেই রকমই উপসত্য বৈ নয়। যেই লোক বলে 'আমি ভাবি তাই আমি রাজা' অথবা 'আমি আইন জারি করেছি তাই আমি রাজা'—সেও সেই লোকের মতন, যে বলে 'আমি আইন জারি করেছি তাই আমি মৃত।' জীবিত মানুষ রাজা হতে পারে না, যেমন পারে না ভাষা হতেও। রাজা, আইন ও ভাষা সবই নিশানা মাত্র। অর্থাৎ মৃত। যে লোক মনে করে আমি রাজা, তার চেয়ে বড় উন্মাদ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই।

এই অর্থে ক্রেয়ন লোকটাও ছিলেন উন্মাদ। অথচ হেগেলের মতন মনীষীও বিষয়টি ধরতে পারেন নাই। কারণ খোদ দেকার্তের মতন হেগেলও বুঝে উঠতে সমর্থ হন নাই মানুষ—ভাষার অধীন মানুষ—মাত্রই দ্বিধাবিভক্ত, বিভাজিত। একজন উত্তম পুরুষের ভিতর একই সঙ্গে একটি নামপুরুষও বাস করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম, মধ্যম ও নাম তিন পুরুষ তিন শাসনে বাস করেন। শাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ এখানে রেজিস্টার (register), আর তার ফারসি সেরেস্তা। ক্রেয়ন এই সত্যের সন্ধান পান নাই। দেকার্তও পান নাই। হেগেলও না।

তবে হেগেল যা পেয়েছিলেন তার মধ্যে উত্তম ও অধমের লড়াই বিষয়টা আছে। উত্তমের শাসন সেরেস্তা থেকে দেখলেও হেগেল অধমের শক্তিটা টের পেয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যই তিনি আন্তিগোনের তারিফ না করে পারেন নাই।

জাক লাকাঁর মতে, তারপরও হেগেল যথেষ্ট করেন নাই। ক্রেয়ন নিজেকে বিধাতা ভাবলেন। আন্তিগোনের স্পর্ধা অনুসারে মানুষ মাত্রেই অধম, কেউই বিধাতা নন। সুতরাং ক্রেয়নকেও নেমে আসতে হবে অধমের, অর্থাৎ নামের সারিতে। অথচ ক্রেয়ন ভেবেছেন, আন্তিগোনে আইন অমান্য করে নিজেকেই পাল্টা উত্তম পুরুষের আসনে বসিয়েছেন। প্রভু বা উত্তম পুরুষ যে আসলেই ফাঁকাবুলি এই সত্য ক্রেয়ন বুঝতে পেরেছেন অনেক দেরিতে, যখন আর সংশোধনের সময় নাই তখন।

আন্তিগোনের নির্বাচন ইউএনডিপি ঘোষিত পছন্দের আওতা কিংবা সুফিয়ার নির্বাচন নয়। আন্তিগোনের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া নির্বাচন নিছক

জবরদস্তির নির্বাচন ছিল, অন্তত তাঁর বোন ইসমেনের চোখে তেমনই ঠেকেছিল এই নির্বাচনের প্রকৃতি। নির্বাচন কর বেছে নাও: হয় আইন, নয় মৃত্যু। দেখা গেল আন্তিগোনে শুদ্ধ মৃত্যু বেছে নেয় নাই। সে দানও উল্টে দিয়েছে। সাধারণের চোখে মৃত্যু বেছে নেওয়া অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে পরিহার করাবার জন্যই কিন্তু এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনের স্পর্ধা কবুল করে আন্তিগোনে অবাক করলেন সবাইকে। আন্তিগোনের নির্বাচন নেহায়েত বেহাত পছন্দ নয়। নির্বাচনের শিকার মাত্র নন তিনি। খেলার নিয়মই পাল্টে দিল তাঁর নির্বাচন।

প্রথমে তিনি মৃত্যু নির্বাচন করলেন। এর ফলে ইসমেনে বাধ্য হলেন নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে। দুই নম্বরে আন্তিগোনের মৃত্যু ক্রেয়নকে বাধ্য করল নিজেদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে। ক্রেয়ন নিজ থেকেই যদি বুঝতে পারতেন তো তাকে বীর বলা যেত। কিন্তু অন্ধ তিরেসিয়স তিরস্কার না করা পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন নাই তিনি শাঁখের করাতেই পড়েছেন। তাঁর দশা হয়েছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মতন। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

আন্তিগোনের পথ সন্ত্রাসের পথ নয়। একই সঙ্গে তা আবার মহাত্মা গান্ধির দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্রও নয়। আন্তিগোনের আহ্বান: ক্রেয়ন তুমি উত্তম পুরুষের অহঙ্কার ছেড়ে অধম বা নামপুরুষ হও, দশের একজন হও। অথচ ক্রেয়ন নিজের রাজ্যভার ছাড়তে রাজি হন নাই। নিজের ভিতরের ফাটলটি বুঝতে অস্বীকার করলেন তিনি এবং পরিণামে আমরা দেখলাম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা।

৩

আধুনিক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে। দেকার্ত এই যুক্তির বিশুদ্ধ প্রবর্তক। এই যুক্তি অনুসারে মানুষ মানে সেই প্রাণী যে ভাবে। তাই সে 'আশরাফুল মখলুকাত'। এই যুক্তিতেই মানুষের মধ্যে বিরাজমান আশরাফ-আতরাফ বিভক্তি নতুন বৈধতা লাভ করে। তথাকথিত মানবধর্ম (humanism) আসলে এই আশরাফ ধর্মেরই নতুন নাম ছিল। এই মতবাদই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছে। সাম্রাজ্য বলতে আমরা এই ঘটনারই নির্দেশ করছি। পণ্ডিত হেগেল এর মধ্যে উত্তম পুরুষের প্রতিষ্ঠা দেখেছিলেন। আন্তিগোনের মধ্যে তিনি নতুন আশরাফ শ্রেণীর ছায়া দেখেন। বলা বাহুল্য সেই বস্তু শুদ্ধ তাঁর বিভ্রম।

এখন এয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেই পণ্ডিতরা আধুনিক যুগের অবসান ঘোষণা করেছেন তাঁরা আন্তিগোনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীর ছায়া দেখলে আমরা বিস্মিত হব না। আদর্শের জন্য যারা অকাতরে প্রাণ দেন তাদের আমরা বীর বলে থাকি। ফরাসি বিপ্লবের সময় দাগি অপরাধীরাও সাহস প্রমাণ করার জন্য প্রতিযোগিতা করে গিয়োতিনের সামনে মাথা পেতে দিত। কবি বোদলেয়ার তাতে সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'আধুনিক সুন্দর'। (বোদলেয়ার ১৯৬৪/খ) আন্তিগোনের মধ্যেও অনেকে এই সুন্দরকে দেখেছেন।

আমরা দাবি করব, আন্তিগোনের সুন্দর সুন্দরেরও অধিক। তার মধ্যে ন্যায়ের আভাস আছে। এই আভাসেই প্রমাণ আধুনিকের বিকল্প উত্তরাধুনিক নয়, সাম্রাজ্যের বিকল্প সন্ত্রাস নয়। এই উভয়েরই বিকল্প ন্যায় আছে। আন্তিগোনের পথে সেই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অথচ উত্তরাধুনিক মতবাদের বেনামি—যেমন ফুকো—বা স্বনামি প্রবক্তারা—যেমন লিয়োতার—এই সত্য স্বীকার করতে রাজি হবেন না।

আন্তিগোনের মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়ে গেছে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে গাওয়া তাঁর বিলাপগীতিটি বহু বোদ্ধা পড়ুয়ার পর্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এমনকি মহাত্মা গ্যেটে পর্যন্ত রায় দিয়েছেন এই গীতিটি জালিয়াতি না হয়ে পারে না। এমন লেখা সোফাক্লেসের হতে পারে না। কেন? এই গীতিকায় অসম সাহসী আন্তিগোনে অনুযোগ করে বলছেন: আহা, আমার তো বাসর রাত হবে না, প্রিয়ের বাহু আমাকে কোনদিন জড়াবে না, কোলজুড়ে কোনদিন শিশুও আসবে না, বধূবরণের ডালা থেকে কেউ পুষ্পবৃষ্টি করবে না...।

কী কী তার হবে না সেই তালিকা অফুরন্ত। তারই অপর নাম বাসনা। সেই বাসনা কখনো পূরণ হবে না। সেই বাসনা পরিমাপের অযোগ্য। আন্তিগোনে এখন এই জীবনের ভাষায় গান গাইলেও তার এক পা পড়েছে জীবন ও মৃত্যুর পরপারে, যেই জগৎ তার সীমানায়। সেখান থেকে দেখলে পার্থিব অপার বাসনা, অসীম বাসনাও পরিমাপের যোগ্য হয়ে ওঠে। পরম বাসনা তাকেই বলে যার বলে অসীম হয়ে ওঠে সসীম।

ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন মৃত্যুর পরে জীবন অনন্ত হবে এই বিশ্বাস অর্থহীন হত যদি না মানুষ এমন এক পরমেশ্বর কল্পনা করতেন যিনি এই অনন্তকেও অন্ত দিতে পারেন, পরিমাপ করতে পারেন। জাক লাকাঁও বলেছেন, আন্তিগোনের বাসনা আর মহাত্মা কান্ট-কল্পিত পরমেশ্বর বা সর্বোচ্চ মঙ্গলও একই বস্তু। আন্তিগোনের বাসনা বা শেষ বিচার ছাড়া এই পৃথিবীর অন্তহীন বাসনার কোন উপশম নাই। সেই অন্ত থেকেই—যাকে শেষ বিচারের

মালিক বা ইচ্ছাপ্রভু বলা হয় সেই পরমেশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকেই—কেবল অনন্তের পরিমাপ করা সম্ভব।

মনে রাখা চাই অনন্ত মানে অন্তের অ (বা অভাব) নয়। অনন্তের নতুন অর্থ অ-এর অন্ত বা অভাবের অন্ত বা বাসনার অন্ত। এতদিন আমরা জানতাম—অবশ্যই জাক লাকাঁর কারণে—বাসনার নাম অনন্ত। এখন আমরা জাহির করব অনন্তের (অ-এর অন্তের) অপর নামই পরম বাসনা। আন্তিগোনে সেই বাসনার চরিত-কথা বৈ নয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নীতি বটে, কদাচ সন্ত্রাস নয়। কারণ সন্ত্রাস মানে সাম্রাজ্যের ছুঁড়ে দেওয়া নির্বাচন, ইউএনডিপির পছন্দের বাধ্যবাধকতা। পছন্দের শিকার হওয়া আর সন্ত্রাসের পথ ধরা সমার্থক। আন্তিগোনের পথ বিকল্প সত্যের সম্ভাবনার ইশারাও দেয়।

এই পথ মানে খোদ সাম্রাজ্যের আঙ্গিনায় বল ছুঁড়ে মারা। সাম্রাজ্যকেই বাধ্য করা, 'পছন্দের স্বাধীনতা' তার হাতে তুলে দেওয়া। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মোরশেদ শফিউল হাসানের একটি বই আছে, নাম: *অবাক নাম ভিয়েতনাম*। ভিয়েতনাম অবাক নামই বটে। আন্তিগোনের মতনই সেও বল ছুঁড়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যের হাতে।

পছন্দের স্বাধীনতা আমরা হারিয়েছি। কিন্তু সাম্রাজ্য এখনো সেই স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। আধুনিক যুগের অবসান হয়েছে কিন্তু নতুন যুগের সূত্রপাত এখনো হয় নাই। মাঝখানের বিকার বা সঙ্কট আপাতত 'উত্তরাধুনিক' নামে চলছে। তো চলতে থাকুক।

ঘরে বসে যেই বেটা নিজেকে রাজা ডাকে তাকে যেমন রাজা মানা যায় না, তেমনি যুগের শাসনশক্তি নিজের যেই নাম দেয় সেই নামে তাকে ডাকতে হবে এমন কোন কথা নাই। এখনো আধুনিক যুগই চলছে ছদ্মনামে, যেমন সাম্রাজ্যও চলছে সন্ত্রাসের ছাতার আড়ালে।

পছন্দের স্বাধীনতা যেই দিন সাম্রাজ্যের হবে—আমরা আশা করি—সেই দিন উত্তরাধুনিক ছদ্মযুগেরও কবর হবে।

....

সমকাল, ৬ এপ্রিল ২০০৭

§ ১১

এডোয়ার্ড সায়িদের ‘প্রাচ্যব্যবসায়’

বিষয় সাম্রাজ্যবাদের বিদ্যাবুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভাঙিয়ে একদা বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেছিলেন, প্রকৃতিতে ‘শ্রেষ্ঠ’ বলে কোন কথা নাই। বুদ্ধদেব প্রচারিত ইংরেজি জবানে ‘নেচার অ্যাবোরস সুপারলেটিভ’ (nature abhors superlative)। শ্রেষ্ঠত্রেষ্ঠ প্রকৃতির দুই চোখের বিষ—সংস্কৃতিতে আমরা এই কথার অনুমোদন করতে পারি না।

‘শ্রেষ্ঠ’ কথাটি প্রকৃতিতে না থাক, সংস্কৃতি জগতে আছে। আপনার মতে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যদি সত্য সত্য বুদ্ধদেব বসুর কথা মতন ‘শ্রেষ্ঠ কথাটি প্রকৃতির চোখের বিষ’ এমন উত্তর দিয়ে থাকেন—তো আমরা বলতে বাধ্য মুনিদেরও ভুলচুক হয়। বই প্রকৃতির সন্তান নয়, সংস্কৃতির ফসল। বইয়ের দুনিয়ায় ভালো-মন্দ আছে, আছে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টও। তবে শ্রেষ্ঠ নাই।

গত তিরিশ বৎসরে—আমাকে যদি পুছ করা হয়—আপনার পড়া সেরা বই কোনটা, আমি খানিকও দ্বিধা না করে বলতে পারি, আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বই মহাত্মা জাক লাকাঁর *লেখা* (*Écrits*)। ফরাসি ভাষায় প্রথম প্রকাশের চল্লিশ বৎসর পর এই বৎসর—২০০৬ সনের মাহে জানুয়ারি নাগাদ—বইটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইংরেজি তর্জমা মার্কিন মুলুকে প্রচারিত হয়েছে। (লাকাঁ ২০০৬/ক) এর অংশবিশেষের অনুবাদ আমরা আগে নানান সংস্করণে পড়েছি। ফরাসি আমি যতদূর জানি তাতে জাক লাকাঁ পড়া সুচারু কায়দায় সম্পন্ন হয় নাই। নতুন পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি তর্জমার কিছু অংশ আমার এখনো পড়া হয় নাই। হলে আমি এই বই নিয়েই লিখতাম। পরকালে হয়তো তা-ই করব। মাত্র তিন মাস হয় বইটি আমার ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। প্লাতোনের পর লাকাঁ

পড়ার এমনই কপাল আমার। গোটা পশ্চিমা সাহিত্যে লাকাঁর অন্য তুলনা নাই। অথচ আজ আমি তাঁর কাহিনী লিখছি না।

১

আমার গত তিরিশ গ্রীষ্মে পড়া দ্বিতীয় সেরা বই এডোয়ার্ড সায়িদ লিখিত *প্রাচ্যব্যবসায়* (*Orientalism*) এবং তার শেষাংশ *সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ* (*Culture and Imperialism*)—আমার সাধ্যানুসারে অনুবাদ করলে 'বিদ্যাবুদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদ'। (সায়িদ ১৯৭৯; সায়িদ ১৯৯৪)

এডোয়ার্ড ডব্লিয়ু. সায়িদের পরিচয় নানাভাবে দেওয়া যায়। তিনি জন্মসূত্রে ফিলিস্তিনি, আরব এবং প্রতিবাদী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সন্তান। মধ্যনাম ওয়াদি ইংরেজি ডব্লিয়ু. হরফে গোপন প্রশ্রয় পেয়েছে। সায়িদপুত্রের নামও রাখা হয়েছে ওয়াদি ই. সায়িদ। ওঁর মধ্য নামের ই অক্ষর হয়তো এডোয়ার্ডকেই সিন্দুকে পুরেছে।

এডোয়ার্ড সায়িদ রুটিরুজির অজুহাতে ইংরেজি সাহিত্যের মাস্টার। আমাদের দেশে মাস্টার বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে তো বটেই, সঙ্গের আর আর অর্থেও। উপরির মধ্যে, তিনি এয়ুরোপ মহাদেশের আরো দুই পাঁচটা ভাষা দখল করেছেন। ফরাসি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষাও তিনি ভালো শিখেছেন। মাতৃভাষা আরবি বরং তাঁকে শিখতে হয়েছে শেষে, বড় বড় সাহিত্য পড়ার মতন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাফ কাপুড়ে মানুষের কারবার, রাজনীতির মতন নোংরা জিনিসের সঙ্গে তার কী সংস্রব? এডোয়ার্ড সায়িদও এই ধরনের কথাবার্তা দিয়েই লেখাপড়া শুরু করেছিলেন। আমাদের এই বাংলা মুলুকেও এই জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আমরা কম দেখি নাই। সায়িদের জীবনে অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সাফ কথা মেলেনি। তিনি আবিষ্কার করেছেন—প্রতিটি মানব সন্তানকেই একই আবিষ্কার করতে হয়—এয়ুরোপের সাহিত্যের ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধির পিছনে রাজনীতির কাদামাটি ষোল আনাই লেগে আছে। শিল্প ও সাহিত্য বাইরে থেকে দেখতে যতটা নিরীহ ততটা 'নিরীহ' নয়—তার যথেষ্ট 'ইহ' আছে, আছে 'পর'ও। সাহিত্যের এই ইহকাল ও পরকাল নিয়েই এডোয়ার্ড সায়িদের কীর্তি।

আমাদের দেশের প্রথিতযশা লেখক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক জায়গায় মনের দুঃখ না চেপে কেঁদেই দিয়েছেন। এডোয়ার্ড সায়িদ আধা

ইংরেজ আধা পোল লেখক জোসেফ কনরাডের (Joseph Conrad) উপন্যাস পুরা অভ্যাস করে আমেরিকায় ডাক্তার উপাধি নেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও একই জিনিস এস্তেমাল করে একই উপাধি লন বিলাতের কোন এক প্রতিষ্ঠানে। পার্থক্যের মধ্যে নতুন ইয়র্ক ও ঢাকা। শুদ্ধ কি তাই? অধ্যাপক ইসলাম চৌধুরীর সর্বৈব সত্যবাদিতা এই জায়গায় আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি লিখেছেন, পার্থক্যের আরো সূত্র আছে—সেই সূত্র এক কথায় প্রতিভা। এরপর আমাদের আর কোন কথা বলার থাকে?

কথা শুদ্ধ এই: প্রতিভা কী বস্তু? নৈতিক সাহস না নিয়তি? বহুদিন আগে শেকসপিয়র নামক জনৈক ইংরেজ এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন নিয়তির বাড়ি আকাশের নক্ষত্রে নাই, আছে আমাদের চরিত্রের নাড়িজুড়ে। এডোয়ার্ড সায়িদের বই *প্রাচ্যব্যবসায়* জগদ্বিখ্যাত হয়েছে—আমার মনে হয়—এই নাড়ির জোরেই।

২

প্রাচ্যব্যবসায় প্রথম ছাপা হয় ১৯৭৮ সনে। আমি নিজে বহুদিন এই বই পড়ার সুযোগ পাই নাই। সেই বছর আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর পার হচ্ছে। এর প্রায় এক দশক পর ১৯৮৭ ইংরেজির ফেব্রুয়ারি মাসে আমি এই বইয়ের প্রথম কপি কিনি। ততদিনে আমার বই কেনার সামান্য সামর্থ্য হয়েছে। বইয়ের কপিটি এখনো আমার পাশে আছে। পরের বছর আগস্ট মাসে আমার কপিটি আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় ভাইয়ের মতন আমার ছোট ভাই সাদাতের কাছে পাঠাই। শোকরানা আদায় করি ওর। অন্য অনেকের সঙ্গে বইটা সে এখনো হারায় নাই। এই গল্প লিখছি একটা বিশেষ কারণে।

সেই বই তখনো আমি পড়িনি। বইটা প্রথম পড়ার ভাগ্য আমার হয় ১৯৯১ সনের গোড়ার দিকে। যখন এরাকের সাদ্দাম হোসেন কুয়েত যাত্রা করলেন বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোস্বা হল। এডোয়ার্ড সায়িদের বই পড়ে তখন আমি প্রথম দেখলাম, যে যুক্তিতে জিব মকশো করছেন জ্যেষ্ঠ জর্জ বুশ ১৯৯০–৯১ সনে ফরাসি বীর নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত ইংরেজি ১৭৯৮ সনে মিসর অভিযানের সময় সেই যুক্তিই দিয়েছিলেন। মিসর দখলের জুহাতস্বরূপ বোনাপার্ত বলেন: 'নু জোম ব্রেই মুসলমান' (*Nous somme vrai mussalmannes*)—'আমার ফরাসিরাই খাঁটি মুসলমান।' অন্তত মিসরের তৎকালীন মামলুক (ওরফে দাস) শাসকদের তুলনায় আমরা—নামে খ্রিস্টানরা—ভালো, বেহতর

মুসলমান। আমরা তুর্কি সুলতানের বন্ধু। দেখ না আমরা কিভাবে রোমের ভ্যাটিকানবাসী পোপ সাহেবকে পিটিয়ে সোজা করলাম।

এডোয়ার্ড সায়িদের *প্রাচ্যব্যবসায়* বইতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ সামান্য আছে মাত্র, বিশেষ নাই। পরে আমি আরো খবর নিয়েছি। গত দুইশ বৎসর ধরে আরব জগতে যে রাজনৈতিক ইতিহাস তৈরি হচ্ছে মহাত্মা নাপোলেয়ঁনের অভিযানেই তার সূত্রপাত। কিন্তু সায়িদ দেখিয়েছেন, আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। ফরাসি পণ্ডিত ও পর্যটক কঁস্তাতাঁ-ফ্রাঁসোয়া দো শাসবুফ ভলনি (Contantin-François de Chasseboeuf Volney) ইসাবি আঠার শতকের শেষভাগে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ভ্রমণের কাহিনী লিখেছিলেন। এসব দেশ কোন না কোন বিজয়ী বীরের অপেক্ষায় আছে—এমন ভাব করে তার পাতায় পাতায় তিনি নসিহত ও নির্দেশনামা লিখে রেখেছিলেন। মহাত্মা নাপোলেয়ঁ বাল্যকাল থেকেই এই কাহিনী পড়তেন। অতয়েব প্রমাণ বাহুল্য।

এই মতন আরো নানান উদাহরণ টেনে সায়িদ একটা কথার পক্ষে প্রমাণ জোগাড় করছেন। কথাটা এই: গত দুই কি আড়াই শত বৎসরে এয়ুরোপীয় পরাশক্তিদ্বয়—ফরাসি ও ইংরেজ জাতির রাষ্ট্র দুটি—এবং গত একশ কি আধা শ বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবী যেভাবে দখল করে দাবড়ে বেড়াচ্ছে তার পিছনে বিদ্যাবুদ্ধি বা শিল্প-সংস্কৃতিরও হাত আছে।

আছে দুই প্রকারেই। কখনো পেশিশক্তির আগে বিদ্যাবুদ্ধি। আবার কখনো বিদ্যাবুদ্ধির আগে আগে পেশিশক্তি। এই দুই বস্তু যে অমৃত তৈরি করেছে তার নাম একদা ছিল উপনিবেশবাদ বা পরদেশতন্ত্র। ১৮৭০ সনের পর ফরাসি-ইংরেজি দুইচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ঘোষণা দেয় নতুন চেটিয়া জার্মানি, ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই যুগের নাম 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' দাঁড়িয়েছে সত্য। কিন্তু সায়িদ নিঃশব্দে প্রশ্ন করছেন: তার আগের যুগটাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলব না কেন?

১৯১৬ সনে লেখা রুশ দার্শনিক রাষ্ট্রপতি লেনিনের প্রচারপত্র মোতাবেক আমরা শিখেছি: সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পর্যায়। সায়িদের লেখায় এই জবাব হাজির হয়েছে উত্তরাকারে নয়, প্রশ্নের ধাঁচে। মিসরে নাপোলেয়ঁ বা ভারতে ক্লাইব কি তাহলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন, না অন্য বেগুন ভাজছিলেন? এয়ুরোপের ভালো মানুষের পক্ষে—আজ আমেরিকান ভালো মানুষের পক্ষেও—বোঝা সম্ভব হয় না সাম্রাজ্যবাদ কী বস্তু। সায়িদ খোদ মার্কস এবং এঙ্গেলসকেও কাঠগড়ায় হাজির করেছেন, অজ্ঞানে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নেওয়ার অপরাধ তাঁরাও কি করেন নাই? এর জবাব এজাজ আহমদ (Aijaj Ahmad) আর ধরা

যাক আমাদের দেশের বদরুদ্দীন উমর দিয়েছেন। আমার বিচারে—অকিঞ্চিৎকর যতই হোক এই বিচার—তাঁরা ঘটনার কিনারায় আছেন।

সায়িদের *প্রাচ্যব্যবসায়* বইয়ের বিসমিল্লায় দুজন লেখকের দুই দফা উদ্ধৃতি আছে। এক দফায় কার্ল মার্কস, আর দফায় বেনজামিন ডিজরেলি (Benjamin Disraeli)। মার্কস একদা—১৮৫১ সনে—ফরাসি চাষিদের কথা সামনে রেখে বলেছিলেন, 'ওরা নিজেরা নিজেদের কথা বলতে পারে না, ওদের কথা ওদের হয়ে অন্য কাউকে এসে বলতে হয়।' সায়িদ কথা টেনে এনে বলেন, এয়ুরোপ থেকে যাঁরা এশিয়া ও আফ্রিকায় কিংবা আগে পরে অন্য জায়গায় উপনিবেশ বসাতে যাবেন তাঁরাও সেই জায়গার মানুষজন সম্পর্কে এই মনোভাবই পোষণ করেন। ওরা নিজেরা বোবা, তাই আমরাই ওদের হয়ে বলি। তাতে যে ওরা 'বলি' হয় সেই কথা এয়ুরোপীয় রাজসিক চৈতন্যে ধরা পড়েনি। এডোয়ার্ড সায়িদের *প্রাচ্যব্যবসায়* বইয়ের মূলসুর এই এক পঙ্‌ক্তিতে ভালোভাবে লেখা হয়েছে।

মূলকথা, ইতিহাসে যারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছে তারা অন্যের অভ্যাসের বিষয়বস্তু বা অভ্যস্ত। 'অভ্যস্ত' কথাটার গঠন বাংলা 'মুখস্থ' কথার মতন। আমার প্রস্তাব কথাটি ইংরেজি 'অবজেক্ট' কথার তর্জমা হিসাবে পড়া যায়। আর ইতিহাসের নায়করা যাকে বলেন 'সাবজেক্ট' আমি প্রস্তাব করি বাংলায় তাদের 'সাব্যস্ত' বলা যাক। এয়ুরোপের নায়করা 'সাব্যস্ত' আর এশিয়ার উজবুকরা 'অভ্যস্ত'। জার্মানির দর্শন ব্যবসায়ী হেগেলের বাগ্‌বিধি অনুসারে ইতিহাসের ধর্ম এই সাব্যস্ত আর অভ্যস্ত—বান্দা ও মনিব—বিভাগ। মনিব ও বান্দার যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বান্দারই জিত—হেগেলের এই রায় অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় যদি বান্দা থেকে যায় ইতিহাসের বাইরে।

হেগেল বলেছিলেন, ভারতের অর্থাৎ প্রাচ্যের কোন ইতিহাস নাই। এই কথারই পুনরুক্তি বা 'প্রতিষ্ঠান' আমরা পাই মার্কসের বিখ্যাত বুলিতে। তিনি চালাকি ভাষায় যোগ করেন: অন্তত লিখিত ইতিহাস নাই। মার্কস এই প্রস্তাবে আস্থাশীল না থাকলে কখনো লিখতে পারতেন না যে ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে ইতিহাসের সূচনা ঘটাচ্ছে। ইতিহাস বলতে মার্কস 'সমাজ বিপ্লব' শব্দটি ব্যয় করেছিলেন। মার্কসের দায় মেটানোর ব্যর্থ প্রয়াস একবার চালিয়েছিলেন ভারতীয় ইতিহাস বিশারদ অধ্যাপক ইরফান হাবিবও। তিনি বলেছিলেন, দায়টা মার্কসের নয়, হেগেলের। সায়িদের বই পড়লে দেখা যায়, দায়টা এয়ুরোপ ও আমেরিকার সেই মনের, যার নাম তিনি রেখেছেন 'প্রাচ্যব্যবসায়'।

প্রাচ্যব্যবসায়ের ভিতর হেগেলের মতন মার্কসও অনেকখানি ঢুকে আছেন। মার্কস যাঁকে ঘৃণা করতেন সেই জন স্টুয়ার্ট মিলও আছেন এই প্রাচ্যব্যবসায়। মিলের দুই বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম *স্বাধীনতার কথা* (*On Liberty*) ও *নির্বাচিত সরকার* (*Representative Government*)। এসব প্রবন্ধে যে রকম রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব তিনি তুলেছিলেন সেই রকম প্রস্তাব—তিনিই বলেছেন—ভারতের বেলায় খাটবে না। কারণ সহজ। ভারত অসভ্য।

ইংরেজ শাসন না থাকলে ভারত সভ্য হত না, মিলের এই প্রস্তাবের সঙ্গে মিলিয়ে পরকালের লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিঙ্গের প্রস্তাব পড়া যায়। কিপলিঙ্গের মতে ইংরেজরা চলে গেলে ভারত খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর এডোয়ার্ড সায়িদের প্রিয় লেখক জোসেফ কনরাডও বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা যতই খারাপ হোক অসভ্যদের এই তো নিয়তি। সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া উপায় নাই সভ্য হওয়ার। এসব কথাবার্তা ১৯০০ সনের আগে-পরের কথাবার্তা। একশ বৎসর পরও সেই কথা বলার লোকের অভাব নাই।

ইসাবি ১৮ শতকের শেষভাগে ফরাসি পণ্ডিত আব্রাম-আয়াসিন্থ-আঁকতিল-দুপেরোঁ (Abraham-Hyacinthe-Anquetil-Duperron, ১৭৩১–১৮০৫) ভারতের সুরত শহরে এসে অভেস্তার ভাষা উদ্ধার করেন। কিছু পরে ইংরেজ মহাত্মা উইলিয়াম জোনস (Sir William Jones) সংস্কৃত শিখে গ্রিক-লাতিনের সঙ্গে সংস্কৃতের আত্মীয়তা আছে এই সত্য প্রচার করেন। এই শব্দবিদ্যার মধ্যেই প্রাচ্যব্যবসায়ের সূত্রপাত। এই বীজ ১৮ শতকে পরিণত হয় প্রাচ্যব্যবসায়ের মহীরুহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায়—ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানে বিশেষ করে—তার প্রসার। সেই সূত্রে যাকে বলে সৃজনশীল সাহিত্য ও কলাশিল্পের জগৎ, সেখানেও প্রাচ্যব্যবসায় জপা শুরু হয়।

উনিশ শতকের বড় জ্ঞানীদের মধ্যে যারা এই অজপা জপতে শুরু করেন তাঁদের মধ্যে ফরাসি দেশের সিলভেস্ত্র দো সাসি (Silvestre de Sacy) আর এর্নেস্ত রেনাঁর (Ernest Renan) নাম অগ্রগণ্য। ওঁদের পায়ের চিহ্ন ধরে আসেন মহাত্মা লুই মাসিনোঁ (Louis Massignon)।

ইংরেজ জাতির মধ্যে উইলিয়াম জোনসের পর বিখ্যাত প্রাচ্যব্যবসায় বিশারদ এডোয়ার্ড উইলিয়াম লেন (Edward William Lane) থেকে স্যার হ্যামিল্টন গিব (Sir Hamilton Gibb)। বর্তমান মার্কিন দুনিয়ায় প্রাচ্যব্যবসায়ের প্রধান প্রতিনিধির মধ্যে বার্নার্ড লুইস (Bernard

Lewis) প্রমুখ যুদ্ধংদেহি গবেষক ও প্রচারকগণ। আমি ছররা গুলির মতন কয়টা নাম লিখলাম মাত্র। প্রাচ্যব্যবসায় এতদিনে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চন্দন পালঙ্কশায়ী।

এডোয়ার্ড সায়িদের কহতব্য দুই প্রস্ত। প্রাচ্যব্যবসায়ের বিপুল মর্যাদা শুদ্ধ পাশ্চাত্যকে নয়, প্রাচ্যকেও এই প্রস্তাবে রাজি করিয়েছে—ওঁরা যা বলেন তাই সত্য, বস্তুনিষ্ঠ, অভ্যস্ত সত্য। সায়িদ বলেন, এই কথাটা সত্য নয়। প্রমাণ? প্রাচ্যব্যবসায়ের মূলধারা বিচার করলে সত্য বেরিয়ে আসে।

সায়িদ বলেন, প্রাচ্যব্যবসায় যা বলে তা প্রাচ্য বিষয়ে পাশ্চাত্য (মানে বাইরে) থেকে তৈরি করা কিছু ধারণা। সেই ধারণার গোড়ায় যে বিশ্বাস তা অপরীক্ষিত, অসত্য কথা। প্রাচ্যব্যবসায়ের মতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিরকালই আলাদা। পাশ্চাত্য আলোকময়, প্রাচ্য অন্ধকার। পাশ্চাত্য যুক্তিনশিন, প্রাচ্য যুক্তিবিবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই ক্রমে দেখা যায় প্রতীচী শ্রেষ্ঠ, প্রাচী নিকৃষ্ট। অতয়েব আপনারা বুঝতেই পারছেন পাশ্চাত্যের হাতে শাসিত হওয়া প্রাচ্যের জন্য কেন ভালো, কেন কপাল।

এডোয়ার্ড সায়িদ দেখাচ্ছেন—এসব ধারণা পাশ্চাত্যের বাসনার প্রকাশ, সাব্যস্ত সত্য মাত্র। এই ধারণার প্রসার শুদ্ধ তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যেই নয়—সব আলোচনার মধ্যেই দেখা যায়। *রবিনসন ক্রুসো* (*Robinson Crusoe*) উপন্যাস তো সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী লেখা। কিন্তু জেন অস্টেনের আপাত নিরীহ উপন্যাস *ম্যানসফিল্ড পার্ক* (*Mansfield Park*) ধরে সায়িদ দেখান, সেই জমিদারির আপাতত শান্তি-কল্যাণ হয়ে থাকা জমিও কিভাবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসশ্রমভূক আখক্ষেত আর চিনিকলনির্ভর। সেখান থেকে টাকা পয়সা না এলে এখানে শান্তি থাকে না। এয়ুরোপের সেরা লেখক গুস্তাব ফ্লবেয়রের (Gustave Flaubert) লেখায় যে অনিরীহ এসলামবিদ্বেষ বিরাজমান তাও সায়িদ দেখাতে পারেন।

৩

কেন পারেন? পারেন তাঁর পদ্ধতির কারণে। তিনি আলামত ধরে আগান। পাশ্চাত্যের ইতিহাস তিনি জানেন। সেই ইতিহাসে প্রাচ্য বলে যে শত্রু বিরাজ করে তার ইতিহাসও তিনি জানেন। আলামত ধরে ইতিহাস পড়াই সায়িদের কলা ও কৌশল। ইতালির পণ্ডিত ১৮ শতকের জমবাতিস্তা ভিকো (Giambattista Vico) থেকে ২০ শতকের ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো

সবার লেখা থেকে সায়িদ টুকেছেন। এই টোকার গুণেই তাঁর আপন ফিলিস্তিনি-মার্কিনি অভিজ্ঞতাও সেই আলোকবর্তিকার অংশ হয়ে উঠেছে। কিভাবে?

একটা উদাহরণ দিব। ফরাসি নৃবিজ্ঞান বিশারদ ক্লদ লেভি-স্ত্রস (Claude Lévi-Strauss) কোন এক জায়গায় বলেছেন, পড়তে শেখার বহু আগেই তিনি পড়তে শিখেছিলেন। হেঁয়ালি নয় কথাটা, সত্য। তাঁর বয়স যখন ২ বৎসর মাত্র তখন তিনি একদিন মায়ের কোলে বসে মাকে বললেন, মা, আমি পড়তে পারি। মা বললেন, কিভাবে?

শিশু ক্লদ দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এটা মাংসের দোকান না, মা? ফরাসি জবানে বুশের (*boucher*) শব্দের গোড়ায় বু (bou) আর শেষে এর (er) আছে। শিশু ক্লদ আরেক দোকানের সামনে দেখল লেখা আছে বুলঁজের (*boulanger*), মানে রুটির দোকান। বাচ্চার চোখ ফাঁকি দেয়নি প্রথম তিন হরফের শব্দাংশ বু (bou) এবং শেষ দুই হরফের শব্দাংশ এর (er)। শব্দাংশের সাদৃশ্য দুই বৎসরের শিশুর চোখও এড়াতে পারে নাই। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এই নাটককেই পরকালে লেভি-স্ত্রস নাম দিয়েছিলেন খুব সহজে। সেই নাম গড়নবাদ, গঠনবাদ অথবা সম্পর্কবাদ।

১৯৭৭ সালে কানাডার জাতীয় বেতারে দেওয়া এক ভাষণে প্রাজ্ঞ নৃবিজ্ঞানী এই গল্পই বলছিলেন। (লেভি-স্ত্রস ১৯৭৮)সঙ্গে উপদেশ দিতেও ভুললেন না তিনি। দুই শব্দের ভিতরে দুই বৎসরের ক্লদ যেই মিল বা সাদৃশ্য দেখল ৭০ বৎসরের প্রাজ্ঞ লেভি স্ত্রসের গঠনবাদ বা সম্পর্কবাদেও তার অন্যথা হয় নাই (এই শব্দের তর্জমা কখনো কখনো কাঠামোবাদও করা হয়)।

এডোয়ার্ড সায়িদও কাজে কাজেই শিখেছেন, ১৮ শতকের শব্দবিদ্যা—যা শেষমেশ ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব নাম নিয়েছে—শেষ পর্যন্ত গোটা কয়েক মূল ধারণার উপরই দাঁড়িয়ে। ১৯ শতকের মনীষী এর্নেস্ত রেনাঁ যেমন বলতেন, আরবি-হিব্রু প্রভৃতি 'সেমিতি' ভাষার তুলনায় গ্রিক-ফরাসি প্রভৃতি সেরা ভাষা। এসব ভাষার প্রকৃতি বিচার করেই নাকি তিনি এহেন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। ভ্রষ্ট এই পথ ধরেই তিনি প্রমাণ করেন, এসলাম ধর্ম অবৈজ্ঞানিক ধর্ম, আরব জাতি অপরিণত। ইতি আদি। এয়ুরোপ-আমেরিকার আজকের বর্ণভিত্তিক জাতি সংস্কারের গোড়াও এখানেই। এই বর্ণবাদ এখন আন্তর্জাতিক আইনে বেআইনি ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু আমেরিকা, ইংলন্ড কিংবা সুইডেনে কয়েক বৎসর বসবাসের অভিজ্ঞতা আড়ং করে আমিও সাক্ষ্য দিতে পারি, বর্ণবাদ সেসব দেশের কত গভীরে পোঁতা। ফিলিস্তিনি সায়িদ অকারণে 'প্রাচ্যব্যবসায়' নামেন নাই।

সায়িদের লেখায় বিদ্যার সঙ্গে বর্ণবাদের এই যোগাযোগ পরিষ্কার হওয়ার পর এখন একটা নতুন শাখায় পাতা গজাচ্ছে, সর্বত্র। তথাকথিত সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পকলাতেও সেই জিনিসই প্রকটিত। শুদ্ধ কনরাড বা কিপলিঙ্গ নন, শ্রেষ্ঠ 'মানবতাবাদী' লেখক শাঁতোব্রিয়া (Chateaubriand) কিংবা নের্ভাল (Nerval), গ্যেটে কিংবা ফ্লবেয়র সবাই কম বেশি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজনে বিশ্বাসী। এখানেই সায়িদের লেখার সার্থকতা।

একটা ইতিহাস আছে এর পিছনে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ১৮ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য বলতে শুদ্ধ আরব জগৎকেই দেখতেন। বড়জোর ভারত তার সঙ্গে জোড়া দিতেন। পরে চিনদেশ, জাপানও যুক্ত হল এই তালিকায়। এখন 'দূরপ্রাচ্য' আর 'কাছপ্রাচ্য' এই দুই কথা চালু হয়েছে। ২০ শতকের গোড়া থেকে 'মধ্যপ্রাচ্য' চালু হল। কিন্তু আদিপ্রাচ্য—যা এখন মধ্যপ্রাচ্য—এয়ুরোপের অন্তরে বিদ্ধ হয়েই আছে, সেই কাঁটা এখনো ওঠে নাই।

সারা মধ্যযুগ ধরে এয়ুরোপ আরব জগতের অধমর্ণ ছিল—কি জ্ঞানবিদ্যায়, কি সমরে-শাসনে। সেই যুগে খ্রিস্টধর্মকে কেন্দ্রে বসিয়ে প্রাচ্যবিরোধী সমরাভিযান চলে। সে যুদ্ধের নাম কী? ক্রুসেড মানে ক্রুশের যুদ্ধ। আমরা জানি সেই ক্রুসেডের ইতিহাস থেকে এয়ুরোপ আজও ছাড় পায় নাই। প্রাচ্যব্যবসায়ের প্রথম সবক তাই সেই ক্রুসেড থেকেই আসে। ধর্ম এসলাম, জাতি আরব—সেই সবক অনুসারে হীন, রহস্যময় এসলামকে জানতে হবে ও জয় করতে হবে। এই জানা ও জয়ের বাসনাকেই এই যুগে আমরা যদি বস্তুনিরপেক্ষ বিজ্ঞান জ্ঞানে পূজা করি, তবে আমরা কি ভুল করছি না?

সায়িদ বলেছেন, প্রাচ্যব্যবসায় প্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের সত্য জ্ঞান দেয় না—এই কথা সত্য। কিন্তু এই বস্তু পাঠ করলে 'পাশ্চাত্য' সম্পর্কে অনেক সত্য জানা যায়। সেই সত্য বাসনার সত্য। নতুবা এই বিদ্যার সমালোচনা করে অযথা সময় নষ্ট করা কেন?

এডোয়ার্ড সায়িদের *প্রাচ্যব্যবসায়* বইয়ের গোড়ায় মার্কসের উদ্ধৃতিযোগে যা বলা হয়েছে তা এই প্রকল্পের মূল সত্য। প্রাচ্যব্যবসায় আসলে প্রাচ্য নয়—প্রাচ্য বিষয়ে কোন সত্য বলার ক্ষমতা তার নাই। কিন্তু তারপরও প্রাচ্যব্যবসায় আমরা পড়ছি কেন?

প্রাচ্যব্যবসায় পণ্ডিতরা ওরফে প্রাচ্যব্যবসায় ব্যবসায়ীমহল প্রাচ্যের হয়ে প্রাচ্যের কথা পাশ্চাত্যের কাছে বলছেন, মাতব্বরি করছেন—এই কথা প্রাচ্যের কেউ যদি শুনে ফেলেন তবে তার কানে সিসা ঢালার দরকার নাই।

তিনিও পাশ্চাত্যেরই হবেন। তাতেই ল্যাঠা চুকবে। কিন্তু এডোয়ার্ড সায়িদ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। সিসায় তাঁর কান ভরে নাই।

তিনি বলছেন, নিজের কথা নিজের হয়ে বলা ছাড়া 'সাব্যস্ত' বা কর্তা হওয়ার উপায় নাই। যে সাব্যস্ত হয় না, সে হয় অভ্যস্ত। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যবসায় গত দুইশ আড়াইশ বৎসরের ইতিহাস, তার ফলিত সাহিত্য ও শুদ্ধ সাহিত্য, তার বিজ্ঞান ও শিল্প সব বিশ্লেষণ করে সায়িদ দেখান সবখানেই কিছু কিছু উপাদান বার বার ফিরে আসে। সেই উপাদান সবখানে এক রকম কেন? শিশু লেভি-স্ত্রসের মতন বুড়া সায়িদও সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

৪

এখানেই প্রাচ্যব্যবসায়ের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। ক্ষমতা ও জীবিকা। ১৮৪৭ সনে প্রকাশিত ভবিষ্যৎ বিলিতি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন ডিজরেলির উপন্যাসের (এই উপন্যাসও ক্রুসেডের স্মৃতিবাহী, এই কথা অবশ্য সায়িদ বলেন নাই) এক প্রস্তাব সায়িদ উদ্ধার করেছেন। প্রাচ্য কী জিনিস? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা আছে—'প্রাচ্য আর কিছু না রুটিরুজি' (The East is a career)।

প্রাচ্য মানে একাধারে রুটিরুজি, অন্যাধারে মাতব্বরি। এই দুয়ের সম্পর্ক নিবিড়। ফরাসি দার্শনিক ফুকোর জোরে সায়িদ দেখান, রুটিরুজিটাই প্রধান কথা নয়। মাতব্বরিটাই এক নম্বর।

রুটিরুজির সন্ধানেই একদা পশ্চিমের বীর যুবারা ভারত দখল করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু শুদ্ধ বীরভোগ্যা নয় বসুন্ধরা। পরাধীন জাতির মন যতদিন পদানত করা না যায়, ততদিন শুদ্ধ গায়ের জোরেই কাজ চালাতে হয় অর্থাৎ বসুন্ধরা মাত্র 'বীর'ভোগ্যাই থাকে। কোন দেশ বা জাতিকে তাঁবে রাখার আরো পথ আছে। সেই পথের প্রকৃত নাম বিদ্যাবুদ্ধি। এভাবে সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদের শুদ্ধ পোশাক নয়, শিরা-উপশিরার মতন কাজ করে।

এডোয়ার্ড সায়িদের গবেষণা-সহকর্মী অধ্যাপিকা গৌরী বিশ্বনাথনের গবেষণায় দেখা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা খোদ ইংলন্ডের আগে চালু করা হয়েছিল ভারতবর্ষে। ইংরেজির শ্রেষ্ঠতা ইংরেজের শ্রেষ্ঠতাকে খানিক যুক্তিগ্রাহ্য করে বৈ কি! সাম্রাজ্যবিস্তার যাঁরা করেন তাঁরা অন্যকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য যে যুক্তি দেন, তার নাম উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভারতবর্ষে সতীদাহ নিবারণ এভাবেই ইংরেজ শাসনকে বৈধতাদানের অংশ হয়েছে। (বিশ্বনাথন ২০০৪)

এর মধ্যে আমরা যদি ভুলে বসি প্রাচ্যদেশ ইংরেজ ও ফরাসিদের—এখন মার্কিনিদের—রুটিরুজি বা ব্যবসায় মাত্র, তবে আমরা ভুল করব। কিন্তু আমরা আরো ভুল করব যদি না আমরা মনে রাখি যে এই রুটিরুজির ব্যবসায়-সাফল্য দাঁড়িয়ে আছে নিছক পেশিশক্তির ভিত্তিতে নয়, হৃদয়ধর্মের উপরও। পরাধীন জাতি যতদিন নিজেদের পরাধীনতাকে হয় প্রকৃতির বিধান নয় হীন সংস্কৃতির ফসল মনে করবে, ততদিন পরাধীনতা, পরবশ্যতা স্বীকার তার নিয়তি হয়েই থাকবে।

প্রাচ্যব্যবসায় বা প্রাচ্যবিদ্যা আসলে নিছক কৌতূহলবশত তৈরি হয়েছিল এবং আজও তা স্বার্থলেশশূন্য শুদ্ধ বিজ্ঞান—এই প্রচার এখনো চলছে। মার্কিন জায়ন ব্যবসায়ী বা এয়াহুদি রাষ্ট্রবাদী লেখক বার্নার্ড লুইস কিংবা পশ্চিম ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী লেখক ইংরেজ মনীষী স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপল পর্যন্ত এডোয়ার্ড সায়িদের তীব্র সমালোচক।

ক্ষমতা ও জ্ঞানের এই শুদ্ধ সংযোগ সায়িদের একমাত্র আবিষ্কার নয়। ক্ষমতার সঙ্গে শিল্পেরও একই যোগাযোগ। প্রশ্ন উঠতে পারে: তাই বলে কি আমরা জ্ঞান ও শিল্পকলা বাদ দিয়ে দেব? সায়িদের উত্তর: মোটেও নয়। জ্ঞান ও শিল্পকে সত্যের বিকল্প হিসাবে, মাতব্বর হিসাবে নেওয়া যাবে না। জ্ঞানের সাব্যস্ত মানুষ। সেকথা প্রাচ্যব্যবসায় জগতে সেলাই করা থাকে জ্ঞানের ভিতরেই। সেই সেলাই করা, লুকিয়ে রাখা, স্ব ও অর্থকে—স্বার্থকে—খুঁজে বের করেছেন এডোয়ার্ড সায়িদ। মজার বিষয় সায়িদ এই ব্যাপারে যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন তাঁর নাম ফ্রানৎস ফানোঁ।

ফানোঁ (১৯২৫–১৯৬১) জীবন বাজি রেখে ফরাসি উপনিবেশতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এয়ুরোপ দিনরাত শুদ্ধ মানুষ মানুষ করে, কিন্তু দুনিয়ার যেখানেই মানুষ পায়, পথে-ঘাটে, কোনায়-কানচিতে, প্রথম সুযোগেই মানুষ খুন করে।'

এই মানুষের খুন থেকেই তৈরি হয়েছে এডোয়ার্ড সায়িদের *প্রাচ্যব্যবসায়*। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের আলোচনা এখানে করবার সময় নাই। চতুর্থ খণ্ডের উল্লেখমাত্র করেছি। (সায়িদ ১৯৯৪; সায়িদ ১৯৯২; সায়িদ ১৯৯৭) পাঠক, ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ জ্ঞান করবেন। ইতি আদি।

....

সমকাল, ১২ মে ২০০৬

§ ১২

এডোয়ার্ড সায়িদ, এসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

কিছুদিন আগের এক ছোট্ট খবরে প্রকাশ, 'সন্ত্রাসবাদ কাকে বলে?'—এই প্রশ্নে কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারে নাই বর্তমান দুনিয়ার একমাত্র একচ্ছত্র সংস্থা সম্মিলিত জাতিসংঘ। এক কথায় সন্ত্রাসবাদের কোন সাধারণ সংজ্ঞায় পৌঁছানো যায় নাই সেখানে। এর কারণ—আমাদের জানানো হয়েছে—এই প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হতে পারে নাই এসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান। কোন সাংসারিক স্বার্থের প্রয়োজনে বা অনিবার্য গরজে পাকিস্তান যদি একদিন মার্কিন সংজ্ঞা মেনেও নেয়, তবুও—অনুমান করতে কষ্ট হবে না—এই প্রশ্নের মীমাংসা জটিলই থাকবে।

দিল্লি সত্যিই দূর অস্ত! 'সন্ত্রাস-বাদ' ও 'সন্ত্রাস-প্রতিবাদ' মনে হয় সহসা বাদ হবে না।

১

'সন্ত্রাসবাদ' কী জিনিস? এডোয়ার্ড সায়িদ বলেছেন, এই প্রশ্নের জবাব—দেখা যায়—বিশেষজ্ঞরাও যতটা জানেন বলে মনে হয় আসলে ততটা জানেন না। এসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তিনি এবং তদীয় সহকর্মী ক্লেয়ার স্টার্লিং এক জায়গায় বলেছেন, 'যা কিছু পাশ্চাত্য, এসরায়েল, এয়াহুদি-নাসারা ট্রাডিশন বা সভ্যতা এবং মঙ্গলের সঙ্গে শত্রুভাবে আপন্ন তাই সন্ত্রাসবাদ।'

এই রকম বীরত্বপূর্ণ, প্রায় নাবালক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গত কারণেই সকলে একমত হবেন না। এমনকি এসরায়েলেও সকলে হবেন না। এই বিষয়ের

আরো অনেক সাবালক, অভিজ্ঞ ও শ্রবণযোগ্য পণ্ডিত ধরা হয় ওয়াল্টার লাকারকে। তিনি বলেন:

> ইতিহাসের নানাযুগে নানারূপের সন্ত্রাসবাদ দেখা গেছে। সব রূপকে এক সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট আর বিশুদ্ধ ডাকাতিয়া হামলার আন্দোলনেও হিসাবমাফিক সন্ত্রাসের প্রয়োগ দেখা গেছে। অভিন্ন প্রয়োগ দেখা গেছে দেশে দেশে যেসব যুদ্ধ লাগে সেসব যুদ্ধে, জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে চালিত জনযুদ্ধে এবং বিদেশি দখলদারের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধ সংগ্রামেও।

একটু পরে অবশ্য নিজের বুদ্ধি নিজেই খণ্ডন করে তিনি বলেন, তবে 'সন্ত্রাসকে প্রধান অস্ত্ররূপে যাঁরা প্রয়োগ করেন' তাঁরাই সন্ত্রাসবাদী। এতদূর এসে লাকার খানিক দিশা হারিয়ে দাবি করলেন: প্রধান অস্ত্ররূপে সন্ত্রাসের প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র ১৯ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। সায়িদ খেয়াল করে দেখেছেন, লাকার তাঁর নিজ সত্য—সব সন্ত্রাস এক সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না—থেকে শুদ্ধ সরেই গেলেন না, পৌনে এক শতাব্দীর আগে ফরাসি বিপ্লবে সন্ত্রাসের রাজা নামে যেই পার্বণ অতি বিখ্যাত ছিল তার কাহিনীও ভুলে গেলেন।

এডোয়ার্ড সায়িদ কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি বাদবাকি দুনিয়া সবখানেই সমান সম্মান পেতেন। বাংলাদেশেও পেয়েছেন। ওঁর বাদ-এন্তেকাল ঢাকায় প্রকাশিত বাংলা স্মারকগ্রন্থটি তিন মাসের মধ্যে দুইবার ছাপাতে হয়েছে। যতদূর জানি ওঁকে এদেশে কেউ সন্ত্রাসবাদের এজেন্ট বা উকিল মনে করেন না। তাই তাঁর দোহাই পেড়েই কথা বলছি আমি। সায়িদের মতে, সন্ত্রাসবাদকে পটভূমি বা পরিপার্শ্ব থেকে আলাদা করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিচার করা ঠিক নয়। সায়িদ বলেছেন, পশ্চিমা দুনিয়ায় নিত্য প্রচার করা হয় সন্ত্রাসবাদ মাত্রই এসলাম, মুসলমান, ফিলিস্তিন, ইরান বা শিয়া মুসলমানের কাজ।

সায়িদের যে নিবন্ধটি রেহালে নিয়ে আমি এই লেখা লিখছি তার রচনাকাল ১৯৮৮। রাষ্ট্রপতি রেগানের আমল তখনো শেষ হয় নাই। তার শুদ্ধ দুই বৎসর আগে ১৯৮৬ সনের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় রেগানের বোমারু বিমান লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মোয়াম্মার কাজ্জাফির বাড়ি গুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে ওঁর নাবালিকা অবোধ শিশুকন্যা। সমস্যা শুদ্ধ সন্ত্রাস নয়। সায়িদ বলেন, ধরুন কোন এক জিনিস সম্পর্কে আপনি তেমন কিছু একটা জানেন না। আপনাকে বলা হল সেই না জানা জিনিসের সঙ্গে সন্ত্রাসের সম্পর্ক আছে। তাই আপনি মনে করলেন: কে জানে, হয়তো থাকলেও থাকতে পারে! এসলাম বিশেষত পাশ্চাত্যে এমনই এক অচিন হাতি। তাই ঢেঁকি কুলা কলাগাছ যা হাতে ধরা যায় তাই মনে হয় হাতি।

সন্ত্রাসবাদও, আমরা দেখলাম, এক জাতীয় হাতি বৈ নয়। পার্থক্যের মধ্যে এই হাতি ততখানি অচিন নয়। তবে প্রাচীন নিঃসন্দেহে। আমাদের হিন্দু জাতির প্রাচীন গল্পে আছে দ্যাবাপৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে একটা হাতির পিঠে। হাতিটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাহলে? জবাবে বলে, কাছিমের পিঠে। কাছিম কোথায় দাঁড়িয়ে, দাদা? নিশ্চয় আরেক প্রাণীর শিরদাঁড়ায়।... আমি আর জানি না গল্পটা। তবে মনে হয় সন্ত্রাসবাদের নিচেও এ রকম একদল প্রাণীর শোভাযাত্রা বা চিড়িয়াখানা একটা আছে।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দুই কথা না বললেই যদি নয়, তো বাতলে দিতে হবে কিভাবে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়। নেতানিয়াহু সাহেবদের বইয়ের নামেই সেই নির্দেশ আছে—*টেররিজম: হাউ দা ওয়েস্ট ক্যান উয়িন?* তাঁদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত: হাতিটাকে মার, বিষ দিয়ে না হয় বাণ মেরে। এই সত্যে আপনার সন্দেহ থাকলে আপনিও নিশ্চয় 'সন্ত্রাসী'। আপনি সন্ত্রাসবাদের পক্ষে যুক্তি সংগ্রহের ধান্ধায় আছেন। এমনই এক 'সন্ত্রাসী' ছিলেন সম্প্রতি মরহুম একবাল আহমদ। তিনি আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়েছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণসংগ্রামে শরিক হওয়ার অপরাধে বন্দিও হয়েছিলেন। এডোয়ার্ড সায়িদ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে তিনি যত বিশেষ বিশ্লেষণ পড়েছেন তার মধ্যে একবাল আহমদের লেখাই সেরা।

২

১৯৮৬ সালের এক লেখায় একবাল আহমদ দেখিয়েছিলেন উৎস বিচারে সন্ত্রাসবাদ পাঁচ ধরনের। সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা বা কারণবীজ হতে পারে 'রাষ্ট্র, ধর্ম, আন্দোলন-সংগ্রাম বা বিপ্লব, অপরাধচক্র ও মানসিক অসুস্থতা'। এই হাতের পাঁচ থেকে শেষ দুইটা বাদ দিলে বাকি যা থাকে সেই তিন কারণকে তিনি এক কথায় বলেছিলেন 'রাজনৈতিক' কারণ। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে ছয়দফা সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একবাল আহমদ।

এক দফায় তিনি বলেন: সন্ত্রাসবাদ জন্মায় এক প্রকার দরকার থেকে, 'ঘন যামিনীর অন্ধকারে নিজের না বলা বাণী শোনাবার দরকারে।' সুদীর্ঘকাল কথা শোনাবার আইনস্বীকৃত বা সমাজসম্মত কোন পথ না পেয়ে সমাজের ছোটশক্তি বা সংখ্যালঘু মহল সংখ্যাগুরুর বা বড়শক্তির দরবারে এই পথেই তার অস্তিত্ব ও অস্বস্তির কথা জানিয়ে দেয়। দাবি করে ব্যাপক মহলের সহানুভবতা, সহযোগিতা।

দুই নম্বর প্রস্তাবস্বরূপ, একবাল বললেন, 'এক ধরনের রাগ আর অসহায়ভাবই বাধ্য করে শোধতোলা ভায়োলেন্স বা মারদাঙ্গা-রাজনীতির আয়োজন করতে।'

শুদ্ধ ছোট দুর্বলপক্ষ নয়, বড় প্রবলপক্ষও এই পথ ধরতে কোন দিন কসুর করে না। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার জননেতা রাষ্ট্রপতি রেগানও বলেছিলেন: 'যখন একা ছিলাম তখন আমি নিজেও কয়েকটা দেয়ালে কষে কষে ঘুষি মেরেছি।' তিন নম্বরে, একবাল আহমদ প্রস্তাব দেন—আসুন বেদনার সঙ্গে, দুঃখের সহবতে কবুল করি, 'সবলের মার, প্রতিকারহীন অবিচার আর অত্যাচারই দুর্বলকে সন্ত্রাসবাদী বানায়, ইতিহাস অন্তত এই কথাই বলে।'

চার নম্বর প্রস্তাবে একবাল আহমদ আরো বলেন, 'আঘাতের মতন নিশানা হাতের নাগালে পাওয়া গেলে মারদাঙ্গা বাহিনী ঘরের বাইরে হাঁটা শুরু করে। দেয়ালে ঘুষি মারার দরকার পড়ে না আর, দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে মেরে ফেললেই হয়।'

পাঁচ নম্বরে একবাল উল্লেখ করেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা। সেই সময়ে দেখা গেছে নিতান্ত অবাধ্য হওয়ার অপরাধে নিরস্ত্র মানুষের উপর কী হারে এবং কী ভাবে দুনিয়ার সেরা প্রবল সামরিক শক্তিও ক্ষমাহীন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে। বড়র এহেন নির্বিচার বলপ্রয়োগের পর আইনের অনুমোদন আপনা-আপনি মেলে। বলা হয় যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন এটাই আইন। বড়শক্তির এই আচার-আচমনই ছোটদের উত্তম উৎসাহ জোগায়। সন্ত্রাসবাদের এটাই গাঢ় কারণ।

ভায়োলেন্স বা আইনাতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগে বড়-ছোট কোন তুলনাই চলে না। *ব্যাটল অব আলজিয়ার্স* ছবির ইতালীয় শিল্পীরা ফরাসি দখলদার রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের মুখামুখি দণ্ডায়মান মুক্তিযোদ্ধা লার্বি বিন মাহদির কথায় তার আভাস দিয়েছেন: 'তোমাদের বোমা আমাদের দেও আর আমাদের মেয়েদের এই বাজারের ঝুড়ি তোমরা লও তো দেখি!' (সায়িদ ১৯৯৫: ৩৪৪)

অভ্যুত্থানবাদী বিপ্লবী আন্দোলন যত নীতিবান, যত শক্তিমত্ত হয়ে ওঠে, চোখধাঁধানো ত্রাসজাগানো হিংসাযুদ্ধের চাহিদাও তার তত কমে আসে। একবালের শেষ সিদ্ধান্ত এই। তিনি লিখেছেন: বিপ্লবী আন্দোলন বাছবিচার না করে বলপ্রয়োগ করে না। বাছাইটা করা হয় সমাজবিচার আর মানসবিচার দুই দিক থেকেই। দশের চোখে যেসব শক্তি অত্যাচার আর অবিচারের জ্বলজ্যান্ত প্রতীক বলে বহুল পরিচিত, সচরাচর সেসব শক্তিই বিপ্লবী হামলার

লক্ষ্যবস্তু হয়। যেমন মহাজন জমিদার, হারামখোর আমলা, জুলুমবাজ সামরিক বাহিনী। এই জাতীয় হামলার উদ্দেশ্য জুলুমবাজ শক্তির কব্জামুক্ত করে জনগণের সমর্থন বাড়ানো। আমি এখানে একবালের বক্তব্যের সারানুবাদ মাত্র দিলাম। মূল ইংরেজি পাঠের জন্য অনুগ্রহ করে টীকা দেখুন।[১]

একবাল আহমদের সন্ত্রাসবাদ-বিচার সারা দুনিয়ায় পরিচিত। আমি নিজে ঘটনাচক্রে কয় বছর আগে দেখেছিলাম দুনিয়ার নিভৃত, নিরীহ এক ভাষা সুইডিশে পর্যন্ত সায়িদের *ওরিয়েন্টালিজম* যে রকম একবালের *টেররিজম* নামা খুদে পুঁথিটিও সে রকমই বেস্টসেলার তালিকায় বড় বড় মুদিখানা বা সুপারস্টোরে কোকাকোলার মতন বিকোচ্ছে।

এডোয়ার্ড সায়িদকে আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী দুনিয়ার সেরা বুদ্ধিজীবীর সম্মান দিয়ে থাকেন। তাঁদের সম্মানে বলা দরকার একবাল আহমদের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে এডোয়ার্ড পুরাদস্তুর একমত। প্রকৃত প্রস্তাবে একবালের লেখার সার ও উদ্ধৃতি আমি সায়িদের বই থেকেই জোগাড় করেছি। বাংলাদেশের ফরহাদ মজহার দাবি তুলেছেন সন্ত্রাস বিষয়ে মার্কিন চিন্তার নির্বিচার অনুকরণ বা অনুসরণ না করার। আমার ধারণা তাও একবালের বিশ্লেষণের নিরিখেই। সায়িদের মতন ফরহাদ মজহারও নিজেকে একবালের সাকরিদ বলে জাহির করার সুযোগ পেলে ছাড়েন না।

এই মুহূর্তে শোনা যায় পৃথিবীর ১৩২ দেশে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী সরেজমিন হাজির আছে। আর ৮০ দেশে তাঁরা সামরিক অভিযান বা অপারেশনে জড়িত। বলা বাহুল্য এসব দেশে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ছেন তাঁরা সকলেই 'এসলামি' যোদ্ধা নন। সন্ত্রাসবাদীও নন। তাঁদের সবাইকে সন্ত্রাসবাদী বলা—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছাপূরণেরই সামিল।

৩

জাতিসংঘে মীমাংসা হোক বা না হোক, বাদ ও প্রতিবাদ হয়েছে। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ আছে এই সত্যে এতদিনে আর সংশয় নাই। তবে দুঃখ আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে: এই দেশে সন্ত্রাস নিয়ে 'বাদ' আছে, সংবাদ আছে, আছে 'ব্যর্থরাষ্ট্র' পদবাচ্য হওয়ার আগাম দুঃসংবাদও। কিন্তু এই প্রশ্নে কোন 'বিসংবাদ' নাই, নাই কোন 'সাংবাদিকতা' বা আলোচনা। সন্ত্রাস নানা প্রকার, তার উৎসও নানা প্রকার। কিন্তু এর ফলাফল কত প্রকার ও কী কী সেই জিজ্ঞাসা বিশেষ করা হয় না।

ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে বোমা ফেটেছে শত শত, এই সত্যে সন্দেহ নাই। যারা ধরা পড়েছে, ধরা যাক, তারা সকলেই স্বীকার করেছে তারা শায়খ আবদুর রহমান বা বাংলাভাই নামে খ্যাত ছিদ্দিকুর রহমানের লোক। আরো ধরা যাক, তারা সকলেই আরবি আর বাংলা দুই ভাষাতেই ছাপার হরফে এশতেহার বেঁটে বলেছে: এসলামি আইন কায়েমের জন্যই এই বোমাগুলান কুসুমকলির মতন ফুটেছে। এতে কী প্রমাণ হল? বোমাগুলান এসলামি?

পাঁচজন ডাকাত এসে বলল আমরা এসলামের জন্য ডাকাতি করতে এসেছি। আপনিও তাদের 'এসলামি ডাকাত' বলে সম্মান জানাবেন? জানাবেন, তবে যদি আপনার অন্য মতলব থাকে। আমাদের ভয়, এসলামি বোমাবাজ বা এসলামি জঙ্গি পদার্থটাও এই জাতীয় দ্রব্যবিশেষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জাতীয় পদার্থের আমদানি রপ্তানিতে ভালো বিনিয়োগ করে।

বোমা বানানোর বিদ্যা অনেকেই আয়ত্ত করেছেন। লোকমুখে শোনা যায় বর্তমান দুনিয়ায় অনুমান ১০০ কোটি মতন মানুষ এসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন। বোমা বানানো আর বোমা মারা কোনটাই এসলামের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে নাই। আর নিজ নিজ দেশ বা ধর্মবিশ্বাস শুদ্ধ মুসলমান নয়, অন্য ধর্মানুসারীও ভালোবাসেন। 'এসলামি জঙ্গি' কথাটা যাঁরা চালু করেছেন তাঁরা কিন্তু প্রকারান্তরে বলছেন, এসলামের একচেটিয়া ঠিকাদারি এই কথিত জঙ্গিদের হাতে তুলে দেওয়া আছে। হয়তো এটাই ছিল এই সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী মহলের মনের নিগূঢ় বাসনা।

এসলামের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সমস্ত মতভেদ কলমের এক আঁচড়ে নাই করে দেওয়ার এই বাসনা কি একান্তই অকারণ রটনা বা দৈব দুর্ঘটনা? ভুলে গেলে ভুল হবে, এসলাম ধর্মমাত্র নয়, এয়ুরোপের বহিঃসীমায় অবস্থিত কয়েকটা বড় সভ্যতার সর্বশেষ ওয়ারেশও বটে।

সন্ত্রাসবাদের সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নাই। সংজ্ঞা শব্দের আরেক অর্থ কিন্তু বিশেষ্য। সুতরাং বলা যায় সন্ত্রাসবাদের কোন 'বিশেষ্য'ই নাই। কিন্তু তার 'বিশেষণ' ভুরিভুরি আছে, দিব্য আছে, আছে উড্ডয়নশীল। না থাকে তো 'এসলামি জঙ্গি (সন্ত্রাসবাদী)' কথাটা কি আসমান থেকে নাজেল হল? এসলামি জঙ্গি আর এসলামি সন্ত্রাসবাদীতে পার্থক্য কতটা তা আন্দাজ করা সহজ নয়। আমেরিকা থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে এসলামের একটা না একটা যোগ আছে। আমরাও তাই বললাম 'আছে' বৈ

কি। কিন্তু 'সন্ত্রাসবাদ' কাকে বলে না জানলে কিভাবে বলা সম্ভব, এর সঙ্গে এসলামের একটা যোগ আছে?

কথা আরো আছে। খোদ 'এসলাম' কী জিনিস কেউ কি জানেন? নাসারাধর্মের মতন এসলামের কি কোন পোপ বা পিতৃতুল্য ধর্মগুরু আছেন যিনি বলে দেবেন এভাবে বোমা কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণ পরিচালনা করা এসলামের বিধান? না থাকে তো যে কোন হামলার দায় এসলামের ঘাড়ে চাপানোটা আদৌ কোন যুক্তির সমর্থন পায় কি? অথচ আমাদের দেশের একাধিক প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজ এই কাজটাই করে যাচ্ছেন।

শুদ্ধ জানি না: লীলায় না অবলীলায়। 'সন্ত্রাসবাদ' কাকে বলে জানেন না, 'এসলাম' কী ও কত প্রকার, তার ভিতরের রাজনৈতিক পথবাদ বা মতবাদ কত কিসিমের তাও জানেন না, অথচ কোন রকম দ্বিধার জায়গা না রেখেই বলে দিলেন অজানা এসলামের সঙ্গে অজানা সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী!

তাই আক্ষেপ হয় আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে 'সাংবাদিকতা'ও নাই। 'সাংবাদিক' তাও নাই! কেউ যদি কপালদোষে 'সাংবাদিক' হন, তাকে বলে জ্ঞানপাপী। আমরা আগেও জানতাম পাপ, দাগ বা চিন্তা ছাড়া সাংবাদিকতা নাই। পাপ নাই তো গন্দমও নাই, বাসনার প্রতিভাও নাই।

মানুষের প্রথম পাপই জ্ঞানের পাপ। বললে অনেকেই হয়তো বেজার হবেন। তবে যদি বলি মানুষের প্রথম জ্ঞানই পাপ (অন্তত পাপের জ্ঞান) কেউ কেউ হয়তো নতুন করে ভাবার চেষ্টা করবেন। সেমিতিয়া জাতির পুরাণকথায়, বাবা আদম আর মা হাওয়ার ইতিহাসে—অন্তত এই প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া যায়।

জ্ঞানের শুরু ভেদজ্ঞানে, মানে আলাদা করার ক্ষমতায়। পাপ থেকে পূণ্য আলাদা করাও এক ধরনের জ্ঞান বটে। পাপ থেকে পাপ আলাদা করাও তাই। পাপে পাপে ভেদ আছে এ কথা জানাও পাপ-পদবাচ্য নিশ্চয়ই। সন্ত্রাসবাদ নিছক নিরাকার নয়, তার নানা আকারের ছক আছে। এ কথা বললে অতয়েব পাপ হয়। প্রয়াত মহাত্মা একবাল আহমদও মনে হয় এই পাপেই 'পাপবান'। হয়তো এডোয়ার্ড সায়িদও।

ফিলিস্তিনি মুক্তিসংগ্রামকে এসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহল গোড়া থেকেই সন্ত্রাসবাদী বলে আসছে। এয়াহুদি-নাসারা জনগণের মনে পুরানা এসলামবিদ্বেষ ও ভয়ের গুদাম আছে। তা খুলে দেওয়ার মতলবে বলা হয় ফিলিস্তিন শব্দে এসলাম আর এসলাম শব্দে সন্ত্রাসবাদ বোঝায়। এডোয়ার্ড সায়িদ বলেন: আমি তো নাসারার ছেলে, তাতে কী হয়েছে? ওঁকে

বলা হল: হয়েছে না তো কী! তুমি তো এয়াহুদি-নাসারা ট্রাডিশনের বিরুদ্ধে, মানে সন্ত্রাসবাদী।

ফিলিস্তিনে ১৯৮৭ সালে পয়লা দফা 'এন্তেফাদা' বা গণ-অভ্যুত্থান শুরুর পর সাংবাদিকরা অভ্যুত্থানের এক নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনাদের ছেলেমানুষ আর নারীপুরুষ কী করে এ রকম একদম খালি হাতে, কোন প্রকার হাতিয়ারপাতি ছাড়াই, ট্যাংক আর সাঁজোয়া গাড়িওয়ালা এসরায়েলের সশস্ত্রবাহিনীর সমক্ষে রুটিন বেঁধে এমন লড়াইয়ে নামতে পারল?

ঐ নেতার উত্তর অনেকের মনে থাকবে হয়তো: 'আমাদের দেশে ভয় পাওয়া আইনসম্মত নয় যে!' (সায়িদ ১৯৯৫: ৩৪৯) যে দেশে ভয় পাওয়া নিষিদ্ধ সেই দেশে সন্ত্রাস থাকতেই পারে না। এ কথা হয়তো না বললেও শোনা যায়।

....

সমকাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫

§ ১৩

কঙ্করবোমা

ফ্রয়েড, এডোয়ার্ড সায়িদ ও এয়ুরোপের বিজাতি

ইংরেজি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ খ্যাতনামা পণ্ডিত এডোয়ার্ড সায়িদ এন্তেকাল করিয়াছেন—এই কথা সকলেই জানেন। কিন্তু সকলেই জানেন কিনা আমি জানি না, তিনি ২০০১ সালে লন্ডনে 'ফ্রয়েড ও এয়ুরোপের বিজাতি' নামে একপ্রস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২০০৩ সাল নাগাদ তাঁহার সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিনে পাতলা কাগজের মোড়কে আরো একখানা সংস্করণ বাহিরে আসিয়াছে। (সায়িদ ২০০৪/ক)

সহৃদয় সুহৃদ আল-আসাদুল করিম কাগজের মোড়কে ছাপা সেই বহির একখণ্ড লন্ডন হইতে আমার নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। তাহাও এক বছরমতন হইল। আমি কোন আলোচনা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যদিও এ কথা সত্য যে বইপত্রের আলোচনা লিখিয়া আমি আংশিক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকি। ভাবিলাম কে ছাপাইবে এই জাতীয় লেখা? ব্রাত্য রাইসু আমাকে সেই সুযোগ দিয়াছেন। ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাকে ছোট করিতে চাহি না।

১

এই বক্তৃতায় এডোয়ার্ড সায়িদ বলিতে চাহিয়াছেন মহাত্মা ফ্রয়েড এয়াহুদি বংশের সন্তান হইলেও নিজেকে এয়ুরোপাবি মনে করিতেন। তবে এয়াহুদি পরিচয়ও তিনি কদাচ অস্বীকার করেন নাই। ১৯৩০ সালের পর এয়ুরোপ মহাদেশে এয়াহুদি বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার বহু আগেই এয়ুরোপ হইতে এয়াহুদিদের তাড়াইয়া দিয়া অন্য কোথাও উপনিবিষ্ট করিবার পরামর্শ দানা বাঁধিতেছিল। এয়াহুদি জাতির মধ্যে যাঁহারা ফিলিস্তিনে নতুন

এয়াহুদি রাজ্য সংস্থাপনের কল্পনায় উত্তেজনা পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে সচরাচর 'জায়নপথিক' (zionist) বলা হইয়া থাকে। শহর জেরুজালেমে এই নামের একটি পাহাড় আছে। জায়ন কথাটি তাহার নাম হইতেই আসিয়াছে।

টিয়োডর হার্তসল (Theodore Herzol) নামক এক বিশিষ্ট সাংবাদিক এই জায়ন বা এয়াহুদি রাজ্য আন্দোলনের নেতা বনিয়া গেলেন। তিনি দাবি উঠাইলেন প্রস্তাবিত অখিল এয়াহুদি রাজ্যটি মোকাম ফিলিস্তিনেই বসাইতে হইবে। ইহার আগে—বিশেষ ১৯ শতকের শেষভাগে—দক্ষিণ আমেরিকার আর্হেন্তিনা কিংবা আফ্রিকার কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এই রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাবও উঠিয়াছিল।

আমরা জানি ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সালের যুদ্ধ শেষ হইবার আগে ফিলিস্তিন অঞ্চল তুরস্কের ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের তাঁবে ছিল। তখনই এয়ুরোপের এয়াহুদি নেতারা অল্প অল্প জায়গাজমি কিনিয়া ফিলিস্তিনে এয়াহুদি বসতি-বিস্তারের সূচনা করেন। আমাদের কালের ইতিহাসবিজ্ঞরা প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই নতুন অভিবাসন বা হিজরত প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা ঘটে ১৮৭০ সালের পরের কোন এক সময়।

১৯১৪–১৮ সালের যুদ্ধ—যাহা সচরাচর প্রথম মহাযুদ্ধ নামে কথিত আছে—ঘটিবার পর তুরস্কের পরাজয়সূত্রে ফিলিস্তিন রাজ্যও ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনে চলিয়া যায়। যুদ্ধ চলিবার সময়ই এয়ুরোপের এয়াহুদি নেতাগণের নেতা ধনুকবের মহাত্মা রথশিল্ড বরাবর ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা আলফ্রেড বালফুর মহাশয় সেই বিখ্যাত ঘোষণা পাঠাইয়াছিলেন যাহাতে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল ফিলিস্তিনে এয়াহুদি জাতির জাতীয় আবাসভূমি (national home) প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকার সহায় হইবেন। ১৯৪৮ সালের মধ্যে ঐ ওয়াদামাফিক সেই সহায়তাই করা হইল। ততদিনে ফিলিস্তিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলে কি হইবে, এয়ুরোপ হইতে অপর্যাপ্ত জনসংখ্যা আমদানিপূর্বক শ্রেষ্ঠ শক্তি বনিল এয়াহুদি জাতি। প্রতিষ্ঠিত হইল এসরায়েল রাষ্ট্র।

আজ প্রায় ষাট বৎসর হইতে চলিল পশ্চিমের বলবান জাতিপুঞ্জের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা পাইয়া এসরায়েল রাষ্ট্র বিরাজমান রহিয়াছে। এই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে শুদ্ধ এয়াহুদি জাতির বাসভূমি আকারে। দুনিয়ার যে কোন দেশের এয়াহুদি ব্যক্তিকে সহজেই ইহার নাগরিক করা হইতেছে। অথচ এমন একদিন ছিল (ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের যুগে বা তাহার পর যে ব্রিটিশ যুগ কাটিল তাহাতেও) যখন ফিলিস্তিন দেশটিতে আরব মুসলমান, আরব

এয়াহুদি ও আরব খ্রিস্টানগণ একসঙ্গেই বসবাস করিতেন। এক্ষণে সেই অবস্থা আর বিদ্যমান নাই।

মহাত্মা এডোয়ার্ড সায়িদ নিজেও খ্রিস্টান মাতাপিতার সন্তান। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশুদ্ধ এয়াহুদি রাষ্ট্র এসরায়েল সমস্যার কোন সমাধান করে নাই। বরঞ্চ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে । 'ফিলিস্তিন সমস্যা' বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা সায়িদের বিচারে আদৌ 'ফিলিস্তিন সমস্যা' নহে, আসলে ইহা 'এসরায়েল সমস্যা'রই অন্য নাম মাত্র। তাহা হইলে ইহার সমাধান কী? সমাধান স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, বহুজাতীয় বা নিদেনপক্ষে (আরব ও এয়াহুদি এই দুই জাতি ধরিয়া বলিলে) দ্বিজাতীয় এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিহিত। কিন্তু আজ প্রবল প্রতাপযুক্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যের সমর্থনধন্য জায়নপথিকগণ এই ধর্মের কাহিনী শুনিবেন কোন দুঃখে?

এই বিশ্বাসের সমর্থনে আমাদের হাতের ছোট্ট বহিটির মধ্যবর্তিতায় মনীষী এডোয়ার্ড সায়িদ একপ্রস্ত অতিরিক্ত যুক্তি দেখাইলেন। জীবনের শেষ বৎসরে মহাত্মা জিকমুন্ট ফ্রয়েড *হজরত মুসা ও একেশ্বরবাদ* (*Moses and Monotheism*) নাম দিয়া একটি নাতিবৃহৎ বহি বাহির করিয়াছিলেন। ঐ বহির প্রস্তাব অনুসারে হজরত মুসা এয়াহুদি জাতির বহুকীর্তিত একেশ্বর-বিশ্বাসের প্রবর্তক। এই একেশ্বরবাদ জিনিসটি সেকালের মিশর দেশ হইতে আনিয়া এয়াহুদি জাতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন তিনিই। সঠিক বলিতে হইলে বলিতে হয় হজরত মুসা নিজে মোটেও এয়াহুদি ছিলেন না, ছিলেন ফেরায়ুনের দেশ মিশরের লোক। তিনি এয়াহুদি ছিলেন না অথচ এয়াহুদিদের প্রধান কীর্তি ঈশ্বরোপাসনায় এককেন্দ্রিকতা জারি করিয়াছিলেন তিনিই।

মহাত্মা ফ্রয়েড বলিয়াছেন, এই সত্য সত্য হইলে বলিতে হইবে এই দুনিয়ায় জাতিগত শুদ্ধতা বা রক্তের বিশুদ্ধতা বলিয়া কিছুই নাই। এয়াহুদি জাতির উপাস্য যে ঈশ্বর—হিব্রুভাষায় যাহার নাম দাঁড়াইয়াছে এয়াহবে (*YAHWEH*)—তিনিও জন্মসূত্রে এয়াহুদি নহেন, আরব। আরব্য ঈশ্বর আর মিশরিয়া নবি, এই হইতেছে—ফ্রয়েড দেখাইয়া দিলেন—এয়াহুদি জাতির ইতিকথা। ইহার সহিত সায়িদ যোগ করিলেন—এয়াহুদি জাতির একমাত্র আশা এই ইতিহাসেই। ইহা যদি সত্য হয় তো সওয়াল উঠিতেছে বিশুদ্ধ এয়াহুদি জাতির লোক লইয়া এসরায়েল রাষ্ট্র গড়িবার গোড়ার মাটিটা কোথায়?

২

বর্তমানে কে না জানে ফিলিস্তিন দেশে মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল জাতির শিশু ও কিশোর, যুবা ও বৃদ্ধ ছোট ছোট কঙ্কর হাতে লড়াই করিতেছে বন্দুক, ট্যাংক ও যুদ্ধংদেহি উড়োজাহাজের সঙ্গে। এসরায়েল বসাইয়াছে পাথরের দেওয়াল। এয়াহুদি জাতি ও আরব জাতির বসতি আলাদা করিতে হইবে—ইহাই এই দেওয়াল রচনার ভিত। ফিলিস্তিনি কঙ্কর এই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া মতিচুর বা মিহিদানা বানাইবার প্রস্তাব—কথাটি বলিয়াছেন এডোয়ার্ড সায়িদ নিজে নহেন, বরং খ্রিস্টোফার বোলাস নামক একজন এয়ুরোপাবি বুদ্ধিজীবী। ইনি এডোয়ার্ড সায়িদের বহির ভূমিকা লিখিয়াছেন।

বহির উপসংহার লিখিয়াছেন লন্ডনের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা জ্যাকুলিন রোজ। মহিয়সী রোজ নিজেও এয়াহুদি জাতির সন্ততি। কিন্তু তিনি এসরায়েল রাষ্ট্রের পৃথক্‌ককরণ (apartheid) নীতি অনুমোদন করেন না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভিয়েনার 'ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘর' কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সায়িদের বক্তৃতা বাতিল করিয়া বড় মাপের ভুল করিয়াছেন। বলা প্রয়োজন বোলাস ও রোজ প্রমুখই অধ্যাপক সায়িদকে এই বক্তৃতা দিতে ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু ভিয়েনা কর্তৃপক্ষের অজুহাত ছিল খুবই খোঁড়া। মুখে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই' এই বাতিল ঘোষণা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা খেপিয়াছিলেন এডোয়ার্ড সায়িদের হাতে ধরা একটি কঙ্কর দেখিয়া। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি শেষ করিব। ২০০১ সালের মে মাসে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতার দাওয়াত সায়িদকে দেওয়া হয় প্রায় এক বছর আগেভাগে, মোতাবেক ২০০০ ইসায়ি সনের জুলাই মাসে। দুর্ভাগ্যবশত পরবছর অর্থাৎ ২০০১ সনে, দিনমান বলিতে ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে, এই দাওয়াত বাতিল করা হয়। কারণ আগের বছরের একটি ঘটনা ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট প্রচারণা।

এডোয়ার্ড সায়িদ ২০০০ সালের জুন-জুলাই মাসে সপরিবারে লেবাননে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। জুলাই মাসের ৩ তারিখ নাগাদ লেবানন রাজ্যের দক্ষিণ সীমানায় পৌঁছাইলেন তিনি। সেখানে 'খিয়াম' নামক জায়গায় একটি কুখ্যাত এসরায়েলি বন্দিশালা ছিল। ঐ শালায় কয়েক হাজার রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করা হয়, নির্যাতন করা হয় আরো অনেক মানুষকে। ২০০০

সালে যুদ্ধের কারণে সেই জায়গা হইতে ঐ বন্দিশালা উঠিয়া গিয়াছে। সায়িদ ও সঙ্গের জোয়ান মানুষজন শূন্যস্থান লক্ষ্য করিয়া সেদিকে কয়েকটি কঙ্কর ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই শূন্যস্থানে তখন কোন মানুষজনই ছিল না। না সমর-সম্বন্ধীয়, না অন্য ব্যবসা-সম্বন্ধীয়। দুইদিন পর এসরায়েলের পত্রপত্রিকা ও দূরদর্শনে সেই ছবি প্রচারিত হইয়া পশ্চিমে ছড়াইল। সায়িদের পরিচয় দাঁড়াইল 'প্রস্তর নিক্ষেপরত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী'। অবশ্য তাঁহাকে অনেক আগেই 'সন্ত্রাসের অধ্যাপক' পুরস্কার দিয়াছিল এসরায়েলি আর পশ্চিমা প্রচার। (সায়িদ ২০০৪/খ; দেখুন, খান ২০০৮/খ)

ভিয়েনার 'ফ্রয়েড প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘর' সেজন্যই এই বক্তৃতা বিয়োজন করিলেন। ভিয়েনা হইতে খোদ ফ্রয়েডও একবার লন্ডনে সর্বশেষ নির্বাসিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে সেখানেই তিনি এন্তেকাল করেন। হয়তো সেই স্মৃতি জিয়াইয়া রাখিবার মানসেই লন্ডনের ফ্রয়েড জাদুঘর একই কায়দায় ভিয়েনায় বিয়োজিত ফ্রয়েড বক্তৃতার আয়োজন শেষমেশ করিলেন খোদ মহানগর লন্ডনেই।

ফ্রয়েড বিপ্লবী রাজনীতি করিতেন এই অপবাদ তাঁহার চরম শত্রুও দিবেন না। এডোয়ার্ড সায়িদও শক্তি প্রয়োগ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়—তাহা মনে করিতেন না। তাঁহার বক্তৃতায় যেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা যে কোন কঙ্করের সহিত প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত জিতিয়া যাইবে। এমনকি কোন কোন বোমার সহিতও ইহার তুলনা চলিবে। তবে এই বোমা মনে হইতেছে আত্মঘাতী অর্থাৎ আদমবোমা হইবে না।

....

arts.bdnews24.com নভেম্বর ২০০৭

§ ১৪

কাব্রালনামা: প্রাণ, পরিচয় ও ইজ্জত

সকলেই জানেন ইংরেজি সতের হইতে উনিশ শতকের মধ্যে শুদ্ধ আমেরিকা নহে, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ দেশ কোন না কোন এয়ুরোপীয় পরাশক্তির অধীনস্ত রাজ্য বা উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। ইহার কারণও—সকলেই স্বীকার করিবেন—এয়ুরোপ মহাদেশে ধনতন্ত্রের অভূতপূর্ব বিকাশ। এই ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকশিত রূপকেই এখন আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলিয়া ডাকিতেছি। এই নামকরণের পশ্চাতে রুশ তত্ত্বজ্ঞানী রাষ্ট্রনেতা ভ্লাদিমির লেনিনের হাত রহিয়াছে—ইহা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। আমরা 'সাম্রাজ্যবাদ' পদের তলায় নিহিত বা নির্দেশিত পদার্থের নাম দিব 'সাম্রাজ্য'।

১

এয়ুরোপ হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁহারা এশিয়া ও আফ্রিকার নানান দেশ দখল করিয়াছিলেন তাঁহাদের একটা যুক্তির আশ্রয়ও লইতে হইয়াছিল। তাঁহারা বলিতেন, এই সকল দেশের অযোগ্য ও অপকারী শাসকদিগের হাত হইতে দেশবাসী জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা এতটুকুন কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার সিরাজুদ্দৌলা, মহিশূরের টিপু সুলতান কিংবা দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। হালযুগের সাদ্দাম হোসেন বা মোল্লা ওমরও ইহাদেরই দলভুক্ত অযোগ্য বা অপোগণ্ড অপশাসক।

সাম্রাজ্যসাধক বিজেতারা আরো একটি যুক্তি একই সঙ্গে পেশ করিয়া থাকেন। বিজিত দেশের সংস্কৃতির মধ্যেও তাঁহারা পরিবর্তন সাধন করিতে চাহেন। সংস্কৃতির সংজ্ঞা না দিয়া আপাতত দুই তিনটা উদাহরণের সাহায্যে

বিষয়টি স্পষ্ট করিতে হইতেছে। বিজিত দেশের ভাষা, ধর্ম, লেখাপড়া প্রভৃতি এই 'সংস্কৃতি' কথাটির আওতায় আসে। প্রশ্ন হইতেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর এবং দেশের নানা প্রকার ধনসম্পত্তির উপর অর্থনৈতিক একচেটিয়া স্বত্ব কায়েম করিবার পরও সাম্রাজ্যসাধক বীরপুরুষগণ তৃপ্ত হইলেন না কেন? কেন তাঁহারা বিজিত দেশের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতি আদির উপরও স্বত্ব কায়েম করিতে চাহিলেন? ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী পুরুষগণ এ দেশে সতীদাহ নিবারণ হইতে শুরু করিয়া ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারে কেন অগ্রণী হইয়াছিলেন? ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইবে না।

গায়ের জোরে কোন দেশ জয় করা সম্ভব হইলেও চিরকাল শাসন করা চলে না। কালজয়ী হইতে চাহিলে লোকের মন জয় করা চাই। এই মনের নামই সংস্কৃতি। মন বা সংস্কৃতি জয় করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের চেষ্টা সফল করিতে হইলে দুইটা শর্ত পূরণ করিতে হয়। এক নম্বরে, পুরাতন অধিবাসীদের শেষ করিয়া নতুন বাসিন্দা বসাইতে হইবে অথবা পুরাতন বাসিন্দাদের নতুন সংস্কৃতি (ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি) শিখাইতে হইবে। নতুবা সংঘাতের উৎস অমৃত থাকিবে। এই অমৃত উৎসেরই অপর নাম 'জাতীয়' সংস্কৃতি। আমেরিকায় আদিবাসী গণহত্যা প্রথম শর্তের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় শর্তের দৃষ্টান্ত ভারতের তুর্কি সুলতান আর মোগলাই রাজারা। তাঁহারা ভারতের ভাষায় ও আশা ভরসায় দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইংরেজরা তাহা পারেন নাই। তাঁহারা ভারতীয়দের ইংরেজি শিখাইয়া সারিয়া ওঠেন নাই। জাতীয় পরিচয় লোপ করা সম্ভবপর হয় নাই তাহাদিগের দ্বারা।

ইংলন্ডে, খোদ ইংলন্ডে, যখন ইংরেজি সাহিত্য বলিয়া পড়াইবার কোন বিভাগ চালু হয় নাই, তখন হিন্দুস্তানে সেই বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। (বিশ্বনাথন ২০০৪) ইহার গূঢ় কারণ সাম্রাজ্যের গভীর প্রয়োজনে আছে। ঐ পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সতীদাহ একটি অমনুষ্যজনোচিত প্রথা। রাজা রামমোহন রায় এবং ভারতবর্ষীয় আরো অনেক মনীষী ইহার শেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজা তাহা মঞ্জুরও করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষাও এই রকম চাহিদারই উত্তরে দেওয়া সাড়া বৈ নহে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারে যাঁহারা অগ্রণী হইতেন তাঁহারাও ইংরেজ অথবা অন্য জাতীয় এয়ুরোপ মহাদেশীয় মানুষ। তাঁহারাও ভারতের মঙ্গলের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। ইংরেজ সরকার একটা সময় পর্যন্ত গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ হইতে পারে মনে করিয়া উহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখেন। কিন্তু ১৮১৩ সনের পর আর রাখিতে পারেন নাই। অনেকেই মনে করেন, ১৮৫৭ সনে সারা উত্তর ভারত জুড়িয়া

যেই স্বাধীনতার লড়াই বাধে তাহার একটি কারণ এই এয়ুরোপীয় ধর্ম প্রচারাভিযানের মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

ইহার পরকালে উপনিবেশে উপনিবেশে এয়ুরোপের ধর্ম প্রচারের আন্দোলন নূতন নূতন পথ ধরিয়াছে; কিন্তু বন্ধ হয় নাই। ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যসাধনা ১৮৫৭ সনের পর যেই পথ ধরিয়াছিল তাহার নাম 'ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান প্রচার' রাখা যায়। এতদিনে আমরা দেখিলাম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা না দিয়াও ইংরেজি শিক্ষা দিয়া দেশের মন জয় করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই পথের সাক্ষ্য দিতেছে। এই পথ অনেক লম্বা হইয়াছে সত্য; কিন্তু অশেষ হয় নাই।

শেষ কোথায় এই পথের? দেশের সকল লোককে এই রকম শিক্ষার সুবিধা দেওয়া কি সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব? ইতিহাস দেখাইতেছে সম্ভব নহে। এই রকম বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে এয়ুরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সামান্য দীক্ষাও দেওয়া হইল। এই দীক্ষায় দীক্ষিত লোকদের ভিতর হইতে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বী নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। ইঁহারা সাম্রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব প্রচার করিলেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নূতন যুগ শুরু হইল। এয়ুরোপ যেদিন আমাদিগের দেশ দখল করিবার সূত্রপাত করিল, সেই দিন ছোট-বড় অনেক প্রতিরোধ সংগ্রাম, অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। দখলদারগণ এই যুগের নাম রাখিয়াছেন প্যাসিফিকেশন (pacification) বা 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'র যুগ। ইহার পর শুরু হইল নিষ্ক্রিয় বিপ্লব বা বেহাত প্রতিরোধের যুগ।

এই দ্বিতীয় যুগে দেশের মানুষ সাম্রাজ্যকে ঘৃণা করিয়াছে। শুদ্ধ নূতন মধ্যশ্রেণীর বিশেষ মানুষ বাদে আর আর সকল মানুষই এই পরোক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামে বা ঘৃণায় যুক্ত হইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যেই এই যুগে একটা বিভাজন দেখা দিল। কেহ কেহ ইংরেজি সভ্যতার গুণগান করিলেন; কেহ কেহ দরখাস্ত, প্রতিবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

শেষ পর্যন্ত আসিল তিন নম্বর যুগ। পামর হইতে শুরু করিয়া ব্রাহ্মণ পর্যন্ত জনগণ বিদেশি শাসন কামনা করিল না। সেই সময় ইংরেজের দেশীয় সমর্থকরা জনগণের মধ্যে যে সকল অমীমাংসিত বিরোধ নিস্পত্তির অপেক্ষায় ছিল সেগুলি কাজে লাগাইল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। জাতিগত দাঙ্গা, নিপীড়ন বাড়িল। তাহার পর সাম্রাজ্যের খোদশাসন আর সরাসরি সম্ভব থাকিল না। এই যুগেরই নাম দাঁড়াইয়াছে জাতীয় মুক্তির যুগ।

২

১৯৪৫ সনে এয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দুইটির অনেক শরিক দেশ স্বাধীন হইল। ১৯৭৫ সন নাগাদ স্বাধীন হইল এয়ুরোপীয় শক্তি পর্তুগালের হাতে বন্দি আফ্রিকার তিন দেশ অ্যাঙ্গোলা, মোসাম্বিক এবং গিনি বিসাউ ও সবুজ অন্তরীপ দ্বীপপুঞ্জের (Guinea Bissau and Cape Verde Islands) জনগণ। এই শেষ দেশটির মহান নেতা মহাত্মা আমিলকার কাব্রাল ১৯৭৩ সনের ২০ জানুয়ারি তারিখে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক চরদের হাতে খুন হন। তিনি অতি উঁচুদরের তত্ত্বজ্ঞানীও ছিলেন।

আমিলকার কাব্রাল সাহেবের দোহাই দিয়া আমি প্রশ্ন করিব: জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মূল শক্তি আসে কোথা হইতে? ইহা সাম্রাজ্যবাদ জানে বলিয়াই প্রগতির নাম ভাঙ্গাইয়া, সভ্যতার দোহাই দিয়া দেশীয় সংস্কৃতির শিকড় পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে চাহে। সাম্রাজ্যবাদ যদিও শহর-বন্দর পর্যন্ত জয় করিতে পারে, গ্রামগঞ্জে তাহারা পুরোদস্তুর পৌঁছাইতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতি তাই গ্রামেই আশ্রয় লয়। এজন্যই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সময় শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ কৃষকের খবর লইতে শুরু করে, চেষ্টা করে তাহাদের সঙ্গে জোট বাঁধিতে। শুরু হয় জাতীয় আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের পালা। আত্মপরিচয় হইতে শুরু করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা বিশেষ করিয়া ইজ্জতসম্মান অথবা মর্যাদার লড়াইয়ে নামে। সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম হইতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম আলাদা আত্মপরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে। পরিচিতি ক্রমশ ইজ্জতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের প্রথম যুগে এই পরিচয়যুদ্ধ একদফা জয়ী হইয়াছিল। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ নূতন উদ্যমে আবার এখানে প্যাসিফিকেশন বা শান্তি প্রতিষ্ঠার যুগ প্রবর্তন করিতেছে। ইহার নাম দাঁড়াইয়াছে বিশ্ব প্রতিষ্ঠা বা গ্লোবালাইজেশন।

বিশ্ব প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা কিন্তু সেই একটাই: জাতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। এই ধ্বংসাভিযান এখনো গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম যেখান হইতে প্রাণধারা আহরণ করে, সেই গ্রামের 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' আজ আর নাই। সাম্রাজ্যের আশা, তাই আর প্রতিরোধও থাকিবে না। থাকিবে কিনা ইহাই এখন দেখিবার বিষয়। কাব্রাল মনে করেন থাকিবে। (কাব্রাল ১৯৮০: ১৩৮–৫৪)

কিন্তু যখন আমরা এরাকের বা আফগানিস্তানের খবর পড়ি, তখন দেখি একটা বিষয় গোপন করা যায় নাই। যাঁহারা অকাতরে লড়িতেছেন, প্রাণ দিতেছেন, আবার লড়িতেছেন, আবার প্রাণ দিতেছেন, তাঁহারা এই জোরটা কোথা হইতে পাইতেছেন? সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও আকাশবার্তার ফাঁক গলাইয়া যেটুকু খবর আমরা পাই তাহাতেই মালুম, লড়াই যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের পরিচয়েই পরিচিত হইতে চাহেন। বিশ্ব প্রতিষ্ঠার গোলকধাঁধায় হারাইয়া যাইতে তাঁহারা নারাজ। তাঁহারা বলিতেছেন: 'প্রাণের চাহিতে পরিচয় বড় আর পরিচয়ের চাহিতে ইজ্জতসম্মান বড়।' বিশ্ব প্রতিষ্ঠার সাধনায় যাঁহারা নামিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ইজ্জতসম্মান কি আত্মপরিচয়কে খুব তুচ্ছ বিষয় মনে করেন। আর প্রাণবাজি রাখিয়া মুক্তিযোদ্ধার দলে প্রতিদিন যাঁহারা নাম লিখাইতেছেন, তাঁহারা ভাবেন অন্য রকম। আমাদের বিচারে ইহাই সংস্কৃতির সংগ্রাম, মানে পরিচয়ের আর ইজ্জতের সংগ্রাম।

৩

আমার এই প্রস্তাবে অনেকেই হয়তো আঁতকাইয়া উঠিবেন, কিন্তু আবেদন করিব—একটু ভাবিয়া দেখুন। এরাকের বর্তমান যুদ্ধ মোটেও সাম্রাজ্যবাদ কথিত আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ নহে। ইহা সংস্কৃতির—মানে জনগণের—যুদ্ধ। কথাটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়তো দরকার। চেষ্টা করিতেছি।

আমার পরিচয় কী তাহা আমার জন্ম লইবার আগেই কিছু পরিমাণ ঠিক হইয়াছিল। জন্মিবার কয়েকদিন পর আমাকেও ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার সঙ্গে—মানে আর দশ মনুষ্যসন্তানের সঙ্গে—সম্পর্কের উপরই নির্ভর করিতেছে আমার পরিচয়। আমিলকার কাব্রাল কহিতেছেন, 'কোন মানুষ (বা কোন মানবগোষ্ঠী) আরেক মানুষ (বা আর আর মানবগোষ্ঠী) হইতে কতখানি আলাদা বা কতখানি সাদৃশ্যপূর্ণ তাহার ভিতরই পরিচয়ের দুইধারা (বা ডায়ালেকটিকাল) চরিত্র লুকাইয়া থাকে।' (কাব্রাল ১৯৭৩: ৬৪) কিছু কিছু সাদৃশ্য লইয়া যেমন আমরা জাতীয় পরিচয় খুঁজি, তেমনি কিছু কিছু পার্থক্য লইয়া আমরা বিজাতীয়দের আলাদাও করিয়া থাকি। কোন দিক কখন প্রধান হইবে তাহা আগে হইতেই বলিয়া দেওয়া যায় না, ঘটনা হইতে বাহির করিতে হয়। ভদ্রলোকের ভাষায় তাই বলা হয়: জাতির পরিচয় 'জৈবিক' নয়, 'ঐতিহাসিক' সত্য। জাতি তাই

নেহায়েত আদি পরিচয় বা রক্তধারায় থাকে না। থাকে পরিচয়ে বা ভাষা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনায়।

সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিপুঞ্জ সেই জন্যই জাতিতে জাতিতে বিরোধ জিয়াইয়া রাখিবার মধ্যবর্তিতায় নিজ আধিপত্য বজায় রাখিতে চাহে। কিন্তু সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত সফল হইতেছে না। ঔপনিবেশিক ও দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে জাতির আত্মপরিচয়ের চেহারাও দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণীর একাংশের উপর ভর করিতে চাহে। বিশ্ব প্রতিষ্ঠার নামে ইহারাই জনগণের সংস্কৃতিকে হয় দমন করে, নয় করে অপব্যবহার।

বাংলাদেশে আজও ইংরেজিতে ডজনখানেক দৈনিক পত্রিকা কেন চলে? রোমের অক্ষরে বাংলা লেখে কেন? নিম্নমানের সঙ্গীত বা কোলাহল দিয়া কান নষ্ট করে কি এই কারণেই নহে? তাহা হইলে কী দাঁড়াইতেছে? মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই দুইয়ের একটা না একটা বাছিয়া লইতেই হইবে। হয় জনগণের জীবিত সংস্কৃতি, না হয় সাম্রাজ্যবাদের পচা মরা সংস্কৃতি। হয় স্বাধীনতা, সম্মান ও আত্মপরিচয়ের সংস্কৃতি, নয়তো পরাধীনতা, আত্মসমর্পণ ও দাসখতের সংস্কৃতি।

বিশ্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত তাই নির্ধারিত হইতেছে সংস্কৃতির বা আত্মপরিচয়ের তথা জাতীয় ইজ্জতের সংগ্রামে কোন পক্ষ জয়ী হইবে তাহার উপর। কাব্রালের কথা অনুসারে, 'সংস্কৃতি যখন গুছাইয়া রাজনৈতিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার নাম দাঁড়ায় সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামেই প্রমাণ মানুষের পরিচয় আছে, আছে ইজ্জতসম্মানও।' (কাব্রাল ১৯৭৩: ৬৮)

....

সমকাল, ২১ জুন ২০০৭

§ ১৫

আপন ও পরবুদ্ধিজীবী

বাংলা 'বুদ্ধিজীবী' কথাটার চল সম্ভবত ইংরেজি 'ইন্টেলেকচুয়াল' পদের তর্জমা আকারে শুরু হয়। ইংরেজি-নবিশ বাংলার আগের বাংলায় একবচনে 'বিদ্বান' আর বহুবচনে 'বিদ্বৎসমাজ' লেখারই রেওয়াজ ছিল। 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা চালু হওয়ায় সমস্যা অন্তত দুই প্রস্ত বেড়ে গেছে। বিদ্বান মাত্রই বুদ্ধিজীবী তবে বুদ্ধিজীবী মাত্রই বিদ্বান নন। আর 'বুদ্ধিজীবী' পদটির সীমাহীনতাও আমাদের হাতের সমস্যার একমাত্র সীমা নয়।

১

বুদ্ধিজীবী কী বস্তু? এই প্রশ্নের দক্ষিণে আরেক প্রশ্ন আছে, হয়তো আরো গাঢ় নীল সেই প্রশ্ন: বুদ্ধিজীবী কে? সমাজে বুদ্ধিজীবী কী করেন? বুদ্ধিজীবীর ভিতরে কী আছে জানবার আগেভাগেই তাই জানা দরকার বুদ্ধিজীবীর বাইরে, মানে সমাজে কী আছে। 'বাইরে' কথাটা খাস করে বলা দরকার। কারণ বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা যাই হোক, এই সংজ্ঞাকে আগে আলাদা করা চাই তার জুড়ি, তার অপর বা 'অ-বুদ্ধিজীবী' থেকে। তারপর আমরা দেখব সেই সংজ্ঞার অসংজ্ঞা বা অজ্ঞান কী জিনিস।

আমাদের যুগে 'বুদ্ধিজীবীর বাইরে' যে আছে সে কে? সে আর কেউ নয়—স্বয়ং শ্রমজীবী, শ্রমিক, খোদ মজুর। এই সংজ্ঞাটা তৈরি হয়েছিল যে যুগে বা মনে, সেই যুগে বা মনে বুদ্ধি মানেই ছিল 'পরিশ্রমবিমুখতা'। শ্রম করত অন্য লোকে, বুদ্ধিজীবীর বাইরের, বেগানা অপর কেউ। তাই বুদ্ধিজীবী পদের অর্থই তখন দাঁড়িয়েছিল 'যে

লোক পরিশ্রমী নয়, শুদ্ধ পরশ্রমী'। এই কথাটি বিশ্বাসের কথা, কল্পনার কথা, নিরেট সত্য নয়।

বুদ্ধিজীবীর মূলধন বিদ্যা। সে তো চিরকালই সাধনার ধন। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা বুদ্ধির 'স্বভাব' বা অন্দরমহল থেকে তৈরি হয় নাই। হয়েছে তার 'পরভাব' বা সদর থেকে। রাজার জ্যামিতি শেখার সহজ রাস্তা নাই। বাদশাহ সেকান্দর ও তদীয় গৃহশিক্ষক মহাত্মা আরস্তুর এই গল্প সেই সত্যেরই সাক্ষী। বুদ্ধিজীবীর অর্থই একদিন মনে হয়েছিল পরিশ্রমজীবী নয়, নেহায়েত পরশ্রমজীবী। এর কারণ বুদ্ধিজীবীর ভিতরে ছিল না, ছিল বাইরে, সমাজগড়নের অন্দরমহলে।

আগেই বলেছি বুদ্ধিজীবীর বাইরে যে ছিল সে তো আর অন্য কেউ নয়—খোদ শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক, খোদ মজুর। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞার অজ্ঞানটা এখানেই প্রকাশ ছিল। আমরা তা চিন্তাও করি নাই, অতয়েব চিনতেও পারি নাই।

এতক্ষণ যা লিখলাম তা জগদ্বিখ্যাত এয়ুরোপ মহাদেহাতি বুদ্ধিজীবী মহাত্মা আন্তনিয়ো গ্রামসির (১৮৯০–১৯৩৭) কথার অনুবাদ মাত্র। (গ্রামসি ১৯৯৬) তবে একটা কথা এখানে বলে রাখছি: এই লেখার শেষ নাগাদ আমরা দেখব গ্রামসি পর্যন্ত নিজের কথায় শেষ অবধি নিজে স্থির থাকতে পারছেন না। খোদ শ্রমিকই যদি বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন তো বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবীর পুরাতন ভেদভিত্তিক জ্ঞানটা কি আর টিকতে পারে? বুদ্ধিজীবীর মানে তখন কী দাঁড়াবে?

বুদ্ধিজীবীও এখন অধুনাতন যুগে পুঁজির রাজ্যে বেতনভোগী শ্রমিক। ওদিকে গ্রামসি বলছেন এই পরকালে আধুনিক ধনতন্ত্রে খোদ শ্রমিকও কিছু না কিছু বুদ্ধিজীবী হতে বাধ্য। বাধ্য উৎপাদন ব্যবহারের ভিতরকার প্রয়োজনেই। কৃষক সমাজের অনেক লোক বুদ্ধিজীবী হয়, হয়ে উপরের শ্রেণীতে ওঠে, শহরে যায়। ততদিনে তারা আর কৃষক সমাজের বুদ্ধিজীবী থাকে না, উপরের সমাজের পালিত সন্তান হয়ে ওঠে। চাষি চায় তার ছেলে বুদ্ধিজীবী হোক, আলেম হোক, পাদরি হোক। ছেলে চাষি হোক তা চায় না চাষি মা-বাপ। গ্রামসি বলেন, যে শ্রেণী নিজ সমাজে গৃহস্থ বুদ্ধিজীবী লালন বা পালন করতে পারে না সেই শ্রেণী অপূর্ব নয়। এই হিসাবেই গ্রামসি বলেন, এয়ুরোপ মহাদেশে সামন্তবাদ পর্বেও কৃষকশ্রেণী অপূর্বশ্রেণী নয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রমিকশ্রেণী নিজেই নিজের বুদ্ধিজীবী লালন করতে পারে। সে কারণেই এই শ্রেণী 'অপূর্ব' বা আমূল নতুন। বুদ্ধিজীবী মানে যদি

'অশ্রমিক' না হয় তাহলে বাকি থাকে কী? এই বাকি জিনিসটা কোন 'জিনিস'ই নয়। এর নাম 'সত্য'। সত্য কোন 'বস্তু' বা 'চিজ' হতে পারে না। কী তাহলে সত্য? এর উত্তর দেওয়ার জায়গা এখানে নাই। তবে নিশান আকারে বলে রাখি, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই আর এক 'বড় পর' বা পরমের অধীন। সে-ই পরম কারণ তার কোন অপর বা পরম নাই। মানুষের ভাষা এই পরমের সবচেয়ে সহজপাচ্য উদাহরণ। পরমের সাথে অধমের সম্পর্কের মধ্যেই আছে সেই সত্যের ইশারা। নিজের ভিতরের পরকে যে সনাক্ত করতে পেরেছে সত্যের দেখা সে-ই পেয়েছে।

আধুনিক যুগের শ্রমিক তো শুদ্ধ নিজের মজুরি বৃদ্ধিতেই জীবনের মোক্ষ দেখবে না। সমাজের সকলের মোক্ষই তার আপন মোক্ষের অপূর্ব শর্ত হয়ে উঠেছে। এখানেই সেও বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীতে আর মানুষে এই অর্থে ভেদ সামান্য। যে সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, পরমের সঙ্গে প্রাণ যার বাঁধা একমাত্র সেই অধমই বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী মাত্রই তাই নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দান করে। কোন কোন পাখি—পত্রিকান্তরে প্রকাশ—দলে দলে আত্মহত্যা করে। এই পাখিদের নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবী উপাধি দেওয়া যায়।

২

গোটা দুই ডিম ভেজে খায় নাই কিংবা ছেঁড়া কোর্তা রিপু করে গায়ে দেয় নাই এমন মানুষ দুনিয়ায় চারজন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহের বিষয়। তাই বলে লোকে তাদের 'বাবুর্চি' কি 'দরজি' নামে ডাকে না। ঘোড়ার ঘাস কাটতেও সেই রকম কিছু না কিছু বুদ্ধিশুদ্ধির ডাক পড়ে। তাই বলে মানুষ বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেকচুয়াল বলতে ঘোড়ার ঘাসকাটা রাখাল বোঝে না। জগদ্বিখ্যাত আন্তনিয়ো গ্রামসি বলতেন, 'বুদ্ধিজীবী সকলেই, তবে ব্যবহার বিচারে পেশার হিসাবে কেউ কেউ মাত্র।'

বুদ্ধিজীবী সকলেই কারণ সকলেই ভাষায় কথা বলে, সকলেই ভাষার জীব অর্থাৎ পদের অধীন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর পেশা সকলেই গ্রহণ করেন না। বুদ্ধিজীবী কথাটির প্রচলিত অর্থ কিন্তু ভাষা ব্যবহারকারী বা পদের দাস বুদ্ধিজীবী নয়। কথাটির প্রচলিত অর্থ নির্ণিত হয় পেশার বিচারে, 'পদবীর' আকারে। যাঁরা 'পদ বীর' তাঁরাই মাত্র বুদ্ধিজীবী।

ইংরেজির ন্যায় বাংলায়ও 'বুদ্ধিজীবী' এখন আর বিশেষণ মাত্র নয়, বিশেষ্য পদ হয়ে আছে।

'বুদ্ধিজীবী' নিয়ে সমস্যা আছে আরো একপ্রস্ত। এই সমস্যা উঁচু নিচুর। বুদ্ধিজীবীসমাজেও শ্রেণীভেদ, না কথাটি ঠিক বললাম না, জাতিবর্ণভেদ আছে। ১৯৭১ সালে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের অগণিত মানুষ পরান দিয়েছেন, তাঁদের আমরা শহিদ বলি। শহিদের একদলকে আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী বলি। আমাদের গ্রামের শহিদ চাষি, সিপাহি, হোমিওপ্যাথ-ডাক্তার ও আয়ুর্বেদজ্ঞ-কবিরাজকে আমরা শুদ্ধ 'শহিদ' বলি কিন্তু ঢাকা শহরের কি জেলা সদরের শহিদ ডাক্তার, অধ্যাপক, সাংবাদিক আর অ্যাডভোকেট পেলে বলি 'শহিদ বুদ্ধিজীবী'। শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানেও কথা হয় কার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন আর কার কার বাবা বা মফস্বলের কলেজ শিক্ষক ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও কি বুদ্ধিজীবী?

বাংলায় এখন আমরা বুদ্ধিজীবী বলতে উচ্চবর্ণের বিদ্বান বা বিদ্বজ্জন বুঝি। বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব বলতে সম্ভবত এই উঁচুস্তরের কথাই বোঝানো হয়। জন্মসূত্রে ফিলিস্তিন, মার্কিন দেশের অধ্যাপক মহাত্মা এডোয়ার্ড সায়িদ বলতেন, ক্ষমতাবানের মুখের উপর অকপটে সত্য উচ্চারণ করাই বুদ্ধিজীবীর দায়। বুদ্ধিজীবী বলতে সায়িদও যে উঁচুস্তরই বোঝাচ্ছিলেন সে কথা কি পরিষ্কার নয়? এই বুঝেরও সমস্যা আছে। বুদ্ধিজীবীসমাজ কি চিরকালই এক রকম থাকে? না তারও ইতিহাস—মানে রূপান্তর—আছে? থাকলে সেই রূপান্তরের হিসাব কিভাবে মিলবে? হিসাবে গোল বাঁধলে অনেকে গোলে হরিবোল দেয়। আমরা দেখব সায়িদের কথায়ও সত্য আছে। তবে অন্য অর্থে। সায়িদের বুদ্ধিজীবী সত্য বলবেন, কিন্তু প্রশ্ন হল: সত্য কী বস্তু তিনি কিভাবে জানবেন?

৫৬ বছর বয়সে—মোতাবেক ১৮৯৪ সনে—বঙ্কিমচন্দ্র অস্ত যান। তখন অরবিন্দ ঘোষের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। অরবিন্দ লিখলেন, 'তিনি, মানে বঙ্কিম, বানিয়ে দিয়েছেন একাধারে এক ভাষা, এক সাহিত্য আর এক জাতি।' বঙ্কিম আর অরবিন্দ দুজনই বুদ্ধিজীবী লোক। এই ছিল তাঁদের সত্য। কী জাতি বানিয়েছিলেন তিনি? উনি বানিয়েছিলেন সেই জাতি, যারা বলতে পারে 'ইংরেজ মিত্ররাজা।' *আনন্দমঠ* মহাকাব্যের শেষকথা বা মূলমন্ত্র এই নয় কি? অস্বীকার করার জো কোথায়? বুদ্ধিজীবীর জোর সাধারণ জোরজবরদস্তি নয়। বুদ্ধিজীবীর সহজ উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩

বুদ্ধিজীবী নিয়ে সহজ কথা বলা শুদ্ধ মার্কিন মুলুকে কেন, এই সাম্রাজ্যের সব প্রদেশেই—মজুর গরিবের দেশ এই বাংলাদেশেও—নিতান্ত সহজ নয়। সহজ কথা মানে সত্যকথা। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

এই গরিবের জীবন তেমন লম্বা নয়। এই খাট-ছোট নিস্তরঙ্গ মফস্বল জীবনে বুদ্ধিজীবীর দেখাও বেশি পাই নাই। যে দুই চারিজনের সাক্ষাৎ জুটেছে তার মধ্যে রাখঢাক না করে বলা দরকার পায়ের নখ থেকে মাথার খুলি পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী দেখেছি একজন মাত্র । নাম আহমদ ছফা (১৯৪৩–২০০১)। বুদ্ধিজীবী কথাটার তাৎপর্য বিচার তিনি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসীম ক্ষমার সীমার ভিতর ভালো-মন্দ সকলি মিলায়ে আমি বলতে বাধ্য: বুদ্ধিজীবী ঠিক কী বস্তু, কী চিজ তিনিও তা ঠাহর করতে পারেন নাই।

১৯৭১ সালে আগরতলা হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন আহমদ ছফা। সেখানে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের আশ্রয়ে ঘুমানোর সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৮ জুলাই নাগাদ ছফার ধুরন্ধর, জিন্দাবিপ্লবী প্রবন্ধসংগ্রহ *জাগ্রত বাংলাদেশ* নামে ছাপা হয়। 'স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ' ওরফে মুক্তধারা প্রকাশ করেছিল এই বই। লেখকের বয়স তখন টেনেটুনে ২৭–২৮ বছর। ঘটনাচক্রে ৩০ গ্রীষ্ম পর একই তারিখে ২০০১ সালের ২৮ জুলাই মহান আহমদ ছফা ঢাকা শহরে এন্তেকাল করেন। ১৯৭১ সালের আগরতলা কলকাতায় আমাদের এই লেখকের অভিজ্ঞতাই *অলাতচক্র* নামে বাংলা কথাসাহিত্যের এক অসামান্য দলিল হয়ে উঠেছে। (ছফা ২০০৮/ক)

এই সাহিত্যে কলকাতায় আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলানবিশ এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার অবলম্বন করে ১৯৭১ সালের জাতীয় যুদ্ধ পরিচালনা নীতির আমূল বিচার ও সমালোচনা হাজির করেন আহমদ ছফা। পাকিস্তান পালিয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে শামিল তরুণ সেনানায়ক আবু তাহের ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত সমরনীতির যে সমালোচনা সেদিন হাজির করেন তার সঙ্গে আহমদ ছফার নীতিবিচারের ভাব দেখা যায় গলায় গলায়।

১৯৭২ সালে দেশে ফিরতে না ফিরতেই গরিব মহাত্মা আহমদ ছফা *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* নামে একগুচ্ছ প্রচারপত্র প্রথমে *গণকণ্ঠ* পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশ করেন। পরে এশতেহার আকারেও আলাদা

প্রচারিত হয় এই পত্রমালা। বইয়ের প্রথম বাক্যেই ছফা লিখেছেন: 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।' (ছফা ২০০৮/খ: ৬/১৯৫)

বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস বইটির পূর্বাভাস লিখেছিলেন খানদানি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, এক কালের বিখ্যাত অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর। আহমদ ছফার এই প্রচারকাণ্ড, জানালেন উমর সাহেব, বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই একজনের—জনৈক জ্ঞাতি ভাইয়ের—নালিশ বৈ নয়।

বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী (ছফার রেওয়াজে বলতে 'বুদ্ধিজীবীরা') বুদ্ধিলব্ধ সত্যে মোটেও আস্থাবান নন। ওঁরা বেচারা। খালি জীবিকার পিছনে, খালি সুবিধার সন্ধানে ছোটাই ওঁদের নিয়তি। সারানুবাদে আহমদ ছফার অভিযোগের যোগফল দাঁড়ায় এই। ছফা বললেন বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানি ভাবের গান লিখেছেন, পাকিস্তান গাছের গন্ধম খেয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এই একই বুদ্ধিজীবীরাই আবার জয়বাংলার, মানে অধুনাবিস্মৃত চার খাম্বার জয়ধ্বনি আওড়াচ্ছেন। এক কথায় তলারটাও কুড়াচ্ছেন। আহমদ ছফা রচিত এসব ঘটনা যদি মোটের উপর ঘটিত সত্য হয় তবে প্রশ্ন জাগে 'এখান থিকা বাইরে যাইবা কোন পথে?'

ভাই আহমদ ছফাও সেই কয়েকটা কথা পুরাপুরি আমল করেন নাই। যদি করতেন তো তিনি আবারও সেই একই বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকাবেন কেন? নিশিদিন ভরসা রাখার জায়গা তিনি পান নাই—সত্য বলতে—আমিও পাই নাই। এখানে তার দুই একটা তোবা তোবা কথাই বলতে চাই। তবে আমি মনে হয় শুদ্ধ সমস্যার চেহারাটা দেখতে পেয়েছি।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীসমাজ এখন আর আহমদ ছফার মতন 'বাংলার রেনেসাঁস' 'বাংলার রেনেসাঁস' বলে চিৎকার বড় করেন না। তাঁরা এখন আরিস্তোতালেস হতে চান না, হতে চান 'অ্যারিস্টটল ওনাসিস'। 'বাংলার বুদ্ধিজীবী-সমাজ আজ যা ভাবে ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীসমাজ তা ভাবেন কাল'—এই ধরনের সংস্কারেও এখন আর বেশি লোকে ভোগে না। তবু বুদ্ধিজীবীসমাজ এক জাতীয় স্বয়ম্ভূ—এমন কথা আজও অনেকেই ভেবে থাকেন। আহমদ ছফাও ভাবতেন।

৪

তবে এহেন সংস্কার একা আহমদ ছফার নয়। অনেকের সংস্কার বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী বুঝি কোন এক আলাদা শ্রেণীর মানুষ। এই বুঝ কি ঠিক বুঝ? কথাটা পরিষ্কার করে বলেছেন আন্তনিয়ো গ্রামসি। গ্রামসি বলেন 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণী' একটা কথার কথা মাত্র, আলাদা শ্রেণী নয়। প্রত্যেক অপূর্ব বা মৌলিক সামাজিক শ্রেণীই নিজ নিজ বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী গড়ে। কিছু বুদ্ধিজীবী সে পায় উত্তরাধিকারসূত্রে, পূর্বগামী অপূর্ব শ্রেণী থেকে, মৌরসি হিসাবে। আর কিছু পায় নবসূত্রে, ওরা জন্মায় তার নিজেরই ঔরসে। এয়ুরোপের ইতিহাস নিংড়ানো উদাহরণ অনেক দিয়েছেন গ্রামসি। এখানে তার নমুনা মাত্র উল্লেখ করছি।

এয়ুরোপের ইতিহাসে যে পর্ব সামন্তবাদ নামে পরিচিত সেই পর্বের অপূর্ব শ্রেণী একদিকে জমিদার, অন্য দিকে চাষি। হজরত ইসার উম্মতসংঘের সদস্য বুদ্ধিজীবীরাই গ্রামসির দেখা এয়ুরোপি জমিদারশ্রেণীর মৌরসি বা 'পোষা' বা 'পালিত' বুদ্ধিজীবীর পরম উদাহরণ। 'পালিত' কথাটি আমি গ্রামসিরই আঁকশি ব্যবহার করে বাংলার বিখ্যাত হিন্দু বুদ্ধিজীবী ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে পাড়লাম। ভূদেববাবু ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভারতমাতার 'পালিত' সন্তান বলেছিলেন। গ্রামসি যাঁদের 'ট্রাডিশনাল' বুদ্ধিজীবী বলেন তাঁরাও অন্য কারও 'পালিত'। আমরা তাঁদের 'ভাড়াটিয়া'ও বলতে পারতাম। সমাজে বিপ্লব ঘটে। বিপ্লব মানে ওলট-পালট, এক শ্রেণীর জায়গায় অন্য শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়। সম্পর্কের রূপবদল হলে ক্ষমতাসীন নতুন বা উত্তর শ্রেণী উত্তরাধিকারস্বরূপ পুরানো ক্ষমতাসীন বা পূর্বের অপূর্ব শ্রেণীর আপন সন্তানতুল্য বুদ্ধিজীবীদের কাজে নিয়োগ করে। তাঁরা 'পালিত' সন্তান—সন্দেহ কি!

আহমদ ছফা যে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নালিশ খাড়া করেছিলেন তাঁরা এক সময় পাকিস্তানপন্থী ছিলেন, পরে বাঙালি হয়েছেন, ছফার ভাষায় তাও 'ঠেলায় পড়ে'। মহাত্মা ছফা একটা কথা মাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে একদা জনপ্রিয় পাকিস্তান আন্দোলনও একটা আপন সমাজ-জাত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী খাড়া করতে সক্ষম হয়। তাঁদেরই ছোট একটি অংশ বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, অনেকে বাংলাদেশে আর বসবাসও করেন নাই। মোহাম্মদ মোহর আলি কিংবা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইনের নাম এই প্রসঙ্গে নেওয়ায় আশা করি অন্যায় হয় না। কিন্তু সৈয়দ

আলী আহসান, আবুল ফজল, শামসুর রাহমান কিংবা বেগম সুফিয়া কামালের বাঙালি জাতীয়তাবাদী রূপান্তর ছফার কল্পলোকে অকল্পনীয় হবে কেন?

ক্ষমতাসীন নতুন বা অপূর্ব শাসকশ্রেণীর আপন সন্তানবৎ বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর নাম গ্রামসি রাখেন 'ঔরসি বুদ্ধিজীবী' বা 'কোলের সন্তান' বা 'আপনজন'। আমরা বলতে পারতাম 'গৃহস্থ বুদ্ধিজীবী'। ইংরেজি তর্জমাকাররা এঁদেরই নাম রেখেছেন 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল'। সমাজ পরিবর্তনকামী প্রত্যেক অপূর্ব শাসকশ্রেণীর আপন বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী থাকবেই। এই আপন বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর তাঁবেদার হবেন 'পালিত' বা 'ভাড়াটিয়া' বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী। যদি না হয় তো বিপ্লব ফল প্রসব করবে না।

বাংলাদেশে যে সমাজবিপ্লব আহমদ ছফা প্রার্থনা করেছিলেন তা ফল প্রসব করে নাই। কেন করে নাই তার একটা উত্তর তো এখানেই মিলছে। তাই আমাদের খোঁজ করতে হয় 'গৃহস্থ' বুদ্ধিজীবীর। আহমদ ছফার অনেক নালিশের জন্ম এই মনোমালিন্যের ভিতর। মালিকের ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করছিলেন তিনি, কেন তাঁরা শ্রমিকের বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন না?

দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী পরের অধীনে বসবাস করতে করতে মানুষ পরম সত্য ভুলতে বসে। পরাধীনতার নানা বিকারের মধ্যে এই বিকারও পড়ে।

৫

কার্ল মার্কসের নিকটতম আত্মীয় দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কোন এক জায়গায় বলেছিলেন, 'চিন্তা করার মতন দার্শনিক আর লড়াই করার মতন শ্রমিক যখন আমাদের সঙ্গে তখন আমাদের জয়যাত্রা ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কে রাখে!' এই কথার ভিতরে একটা ফাঁকও আছে। এই ফাঁকটাই পরে উন্নীত হয় ফাঁকির মর্যাদায়। এই নীতি মূলধন করেই জার্মান সমাজতন্ত্রী দলের নেতা কার্ল কাউটস্কি প্রভৃতি দার্শনিকের ব্যবহার দাঁড়িয়েছিল। সেই দলের বুদ্ধিজীবীর বেশির ভাগই এসেছিলেন পুরানো শাসকশ্রেণীর আপন বা 'গৃহস্থ' বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী থেকে। তাঁরা নিজেরা তো শ্রমিক হয়ে যান নাই আর শ্রমিকদের বুদ্ধিজীবী বানাবেন—সেই সুযোগও গ্রহণ করেন নাই।

রুশ সমাজতন্ত্রী দলের নেতা বুদ্ধিজীবীশ্রেষ্ঠ লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর দলে একদিকে বুদ্ধিজীবী আর অন্যদিকে মজুর—এই পুরানা ভাগাভাগিটা বিলোপের পথ প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল মানে শ্রমিক শ্রেণীর নতুন বুদ্ধিজীবী। ইংরেজিতে একেই বলে 'ভ্যানগার্ড' বা

সামনের কাতার। ধনিক শ্রেণীর পালিত বুদ্ধিজীবীরা এখানে আসবেন বটে তবে আসবেন পুরানা বুদ্ধিজীবীর জামাটা খুলে। আগের গোঁ ধরে থাকবেন না। আলাদা বসবাস করবেন না।

লেনিনের এই বিচারের সঙ্গে আঠার আনা একমত আন্তনিয়ো গ্রামসি। তবে একটা নতুন কথাও তিনি যোগ করেছেন। সেই কথাটা অপূর্ব। তিনি বললেন, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যেমন সামনের কাতার, নতুন বুদ্ধিজীবী বা নতুন ক্ষাত্রশক্তি হিসাবে নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হবে তেমনি শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজেরও নতুন নেতা হয়ে উঠতে হবে। মহাত্মা মাকিয়াভেল্লির 'রাষ্ট্রনায়ক' মানে অন্য কিছু নয়, বিপ্লবী দল। বিপ্লবী রাজনৈতিক দলই গ্রামসির দৃষ্টিতে একালে আসল রাষ্ট্রনায়ক।

নেতা হতে হলে বুদ্ধিজীবী হওয়া বিনা গতি নাই। খোদ শ্রমিক শ্রেণীরই কর্তব্য দাঁড়ায় সমাজের প্রথম কাতার বা বুদ্ধিজীবী হওয়া। এই সত্যের দেখা না পাওয়া অবধি জাতীয় নেতা হওয়ার যোগ্যতা বা 'এগেমনিয়া' (*'egemonia*) তাঁর আয়ত্তে আসছে না।

পুরানা শাসক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী দিয়ে—কি 'পালিত', কি 'গৃহস্থ'—শ্রমিক শ্রেণীর কাজ হবে কতখানি? গ্রামসি বলেন, সেই উত্তর নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর আপন বা গৃহস্থ বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী কতখানি পাকা তার উপর। একদিন বুদ্ধিজীবী মানে ছিল জাদুকর, জাদুর চেরাগধরা আলা'উদ্দিন। চেরাগের এক ঘষায় সত্য—মানে দৌলত—এসে ঘর ভরে দেবে। আর এক যুগে বুদ্ধিজীবী মানে ধর্মবাদক, অবতার বা পয়গম্বর। মানুষ সত্য ভাবে না, অবতারই ভাবে।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন অধ্যায়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, ভারতবর্ষের বিস্তর মানুষ ভাবত কোন না কোন মন্ত্রের জোরে কিংবা সামান্য মানুষ জানে না এমন কোন অজ্ঞান পথে দেশের স্বাধীনতা এনে দেবেন গান্ধিজি। দুঃখের মধ্যে, অনেকে আরো ধরে নিয়েছিল সে কারণে স্বাধীনতা খাতে কারও আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলার দরকার নাই। যা করবার গান্ধি মহারাজই করবেন। (আজাদ ১৯৮৯)

বর্তমান যুগে বুদ্ধিজীবী মানে 'বৈজ্ঞানিক', 'বিজ্ঞানী' বা 'বিশেষজ্ঞ'। সত্য কী তা বৈজ্ঞানিক জানেন। আর আমাদের চিন্তা করার সময়ই বা কোথায়? খোদ গান্ধিজির রাজনীতি ধর্মাশ্রয়ী বলে অনেক নিন্দামন্দ হয়েছে। ধর্মবাদ্যও এক প্রকার জাদুবিদ্যা ওরফে মোজেজা (ওরফে মুসার লাঠি) আশ্রয়ী বলে গালিগালাজ কম হয় নাই।

আগের যুগের কি জাদু কি ধর্মবাদ্য আর একালের বিজ্ঞান—কোনটাই সত্য আবিষ্কার করতে পারে না। অন্তত আজও পারে নাই। কিন্তু কেন পারে না সেই জিজ্ঞাসা খুব বেশি কেউ আজতক করে সারতে পারেন নাই। গুজব আছে আমাদের জমানা বিজ্ঞানের জমানা। বিজ্ঞানে আমাদের বিশ্বাস অগাধ। একদা আমরা জাদু কিংবা ধর্মে যেভাবে ইমান এনেছিলাম আজ বিজ্ঞানেও আমাদের তেমন আস্থা আমদানি করেছি। আমাদের ইমানদার বিজ্ঞানী বন্ধুদের, বেশি নয়, একখানা সওয়াল করুন: কেন বিজ্ঞান? তাঁরা জওয়াব করবেন, 'বিজ্ঞানে কাজ হয়, দাদা, কাজ হয়!' জাদুতে কাজ হয়, হয় ধর্মবিশ্বাসেও। আজিকালি জাদুবিজ্ঞান আর ধর্মবিজ্ঞানের বেশ চাহিদা ধরেছে। বাজিকর আর পয়গম্বরের জমানা আর নাই। কিন্তু বিজ্ঞানী আর বুদ্ধিজীবীর জমানা দুয়ারে দাঁড়ায়ে।

এই বিজ্ঞান আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? পজিটিভিজম বা বিজ্ঞানবাদ বুর্জোয়া সমাজের বিকার। আফসোস, আমরা অনেকে না বুঝে এই বিকারের আরেক নাম রেখেছি কঠিন গান্ধার, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে নতুন ধর্মতত্ত্ব। বিগ ব্যাঙ্গ।[১]

কিন্তু সত্যের চিরস্থায়ী কোন বন্দোবস্ত কায়েম হয় নাই। সত্যকে প্রতিদিন নতুন করে, আপনার করে পেতে হয়। আন্তনিয়ো গ্রামসির লেখায় আছে বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবীরা মূলত বিজ্ঞানীই। আধুনিক পুঁজির যুগের পরও যদি কোন মানবযুগ কল্পনা করার থাকে তবে সেই যুগেও বুদ্ধিজীবীর পথ হবে এই বিজ্ঞানী ও কারিগরদের পথই।

তবে আমার সন্দেহ গ্রামসিও পুরাপুরি দূর করতে পারেন নাই। বস্তু কী জিনিস তার উত্তর না দিলে বিজ্ঞান কী বস্তু তা আমরা বুঝব কী করে? যে বিজ্ঞান জাদু নয়, ধর্মকল্পনা নয়, সেই বিজ্ঞান তো আজকের ইহবিজ্ঞানও নয়।

বুদ্ধিজীবীর কাজই হয়তো এই। এই অশান্তির বীজ বপন করা।

সত্য বা অসত্য কারিগরি বা কৌশলের মামলা নয়। কাজের মানুষ (*homo faber*) আর রসের মানুষ (*homo sapiens*) আলাদা মানুষ নয়। কাজের মধ্যে রস আর রসের মধ্যেই কাজ। সমাজ গড়ার স্বার্থে মানুষ যে সত্যকে চাপা দিয়েছে—যে সত্যের সঙ্গে দেখা হয় নাই দোয়েলের, ফড়িঙের—সেই সত্যের আবিষ্কার, সেই সত্যের দেখা পাওয়াই বুদ্ধিজীবীর দায়।

....

সমকাল, ৯ জুন ২০০৬

সত্যের প্রয়োগ

§ ১৬

ভারতের পরমাণু বোমা ও মহাত্মা গান্ধি

পোখরানে পরমাণু বোমার শব্দ শুনে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন: ভারতবর্ষ আপনকার মহান শান্তির পথ থেকে সরে গেল। এই শান্তিপথের পথিক তালিকা লম্বা, মহান বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত প্রসারিত। বুদ্ধের কথা তোলার সাহস করি না। মহাত্মাজির বিষয়ে একটি বিনীত প্রশ্ন আমার অসংস্কৃত মনে জেগেছে। সেটাই না হয় পাড়ি।

মহাত্মা কি শান্তির পথের পথিক আদৌ ছিলেন? নাকি আমরা আমাদের প্রয়োজনে দল ভারি করছি মাত্র?

১

মহাত্মা গান্ধি, সকলেই জানেন, 'অহিংসা' কথাটাকে জনপ্রিয় করেছিলেন। 'নন-ভায়োলেন্স' শব্দে এই ধারণারই খানিক ইংরেজি তর্জমা হয়েছে বলে আমাদের প্রত্যয়। অহিংসা মতবাদে ষোল আনা ইমান আনার পর মহাত্মা গান্ধি গেল শতাব্দীর শেষ ও এই শতাব্দীর আগ ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা উপমহাদেশের বুয়র যুদ্ধ নামক বিখ্যাত হিংসায় অংশ নেন। নিজের লেখা জীবনকথায় এই কাহিনী বয়ান করেছেন মহাত্মাজি।

'"যুদ্ধ" ঘোষণার সময় আমার আপন টান ষোল আনা বুয়র পক্ষে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান অবস্থায় নিজের মনের রায় অনুসারে চলার কোন হক আমার হয় নাই—এ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হচ্ছি তখন।' গান্ধিজির অকপটতা অতুলনীয়: 'ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ঠেলায় আমি ঐ যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দিই।' (গান্ধি ২০০১: ২৪০) গান্ধিজির এগারশ সদস্যের

স্বেচ্ছাসেবী দল ছয় সপ্তাহ পর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তবু পত্রপত্রিকায় মন্তব্য জোটে: 'আমরাও সাম্রাজ্যের বেটা।'

১৯১৪ সনের বড় ইঙ্গ-জার্মান জঙ্গেও গান্ধিজি যোগ দেন। এই জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সূচনার কালেই বেগম সরোজিনী নাইডুর লগে গান্ধিজির মোলাকাত ও পরিচয়। 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংসা' দুই ধারণাই ততদিনে পাকা করেছেন, কাজে মাত্র নয়, লেখাতেও। *সত্যাগ্রহ ইন সাউথ আফ্রিকা, হিন্দ-স্বরাজ অর ইন্ডিয়ান হোমরুল* প্রভৃতি বইতে মহাত্মা গান্ধি এর ব্যাখ্যা বিবরণ দিয়েছেন। ১৯২৫ সনে লেখা *আত্মচরিত* বইতেও একই কাহিনীর পুনর্বিবরণ।

লন্ডনে আসছেন গান্ধি। ১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানির সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। দুদিন পর গান্ধির জাহাজ লন্ডন পৌঁছে। লন্ডনে গান্ধি সদলবলে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন—এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মীরা দুখানা টেলিগ্রাম পাঠান। অবাক সকলে। কষে মার খেয়েও যিনি হামলাকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা নীতির খেলাপ জ্ঞান করেন তিনি এই রকম একটা যুদ্ধের পাঁকে জড়ালেন? বিশেষ যখন যুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের ন্যায়-অন্যায়, স্বার্থ-পরার্থ সম্পর্কে ওঁর নিজের তেমন জানাশোনাও নাই।

গান্ধিজির বুঝি মত বদল ঘটেছে—এ কথাই ধরে নিয়েছিলেন বন্ধুগণ। অবশ্য খোদ মহাত্মাজি লিখছেন:

> ঠিক যে যুক্তিতে আমি বুয়র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি এবারও সেই একই যুক্তি আমায় ভর করে। যুদ্ধযাত্রা আর অহিংসা এ দুয়ে যে বিন্দুমাত্র মিল নাই তা আমার পরিষ্কার জানা ছিল। তবে কিংকর্তব্যম—এ প্রশ্নের জবাব অত স্পষ্ট জানার কপাল সবার হয় না। সত্য পূজারীকে প্রায়ই অন্ধকার পথ হাতড়ে চলতে হয়। (গান্ধি ২০০১: ৩৯০–৯১)

মনে রাখা ভালো, বর্ণিত ঘটনার সময় লেখকের বয়স ৪৫ মতন আর লেখার সময় ৫৫ কি ৫৬।

গান্ধিজির আত্মজীবনী ওঁর দেহাতি গুজরাতি জবানে লেখা। আমি মহাদেব দেশাই মহাশয়ের ইংরেজি অনুসারে বাংলা দিচ্ছি। মহাত্মা গান্ধির মতে, হিংসার হাত থেকে মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই নিস্তার নাই। 'জীবন ধারণ, খানাপিনা, চলাফেরা মানেই কিছু না কিছু হিংসা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন নাশ—উপায় নাই এ ছাড়া।' গান্ধির জবানে 'অহিংসা নীতির আওতা সর্বগামী।' এর মানে তাঁর বিচারে একের কৃত হিংসার দায় দশের উপর বর্তায়। কারণ সকল জীবনই এক জীবন—এই সত্য অহিংসার ভিত্তিকথা।

তিনি লিখেছেন: 'সমাজ মানেই হিংসা, তাই মানুষ যতদিন সমাজের জীব ততদিন তাকে হিংসার শরিক থাকতেই হয়।' (গান্ধি ২০০১: ৩৯১)

গান্ধিজির যুক্তির পিছু চলছি আমি। তিনি লিখেছেন:

> দুইটা দেশ যখন যুদ্ধ বাধায়, তখন যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিতে হয় অহিংসার পূজারিকে। যে এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয় নাই, যুদ্ধ থামাবার তাকত যার হয় নাই, যার জন্মায় নাই যুদ্ধ বন্ধ করার যোগ্যতা—যুদ্ধে যোগ সে দিতে পারে। যোগ দেওয়ার পর সর্বান্তঃকরণে নিজেকে, দেশ ও দুনিয়াকে যুদ্ধের কবল থেকে বাঁচাবার কৌশল করতে পারে। (গান্ধি ২০০১: ৩৯১)

'ইংলন্ডে বসবাসের সময় আমি ব্রিটিশ নৌবহরের পাহারায় ছিলাম, তার বাহুবলের আশ্রয়ে তার অন্তর্নিহিত হিংসার ভিতর আমিও প্রত্যক্ষ শরিক ছিলাম।' এই কারণে ভবিষ্যৎ মহাত্মার তৎকালীন চিন্তা ছিল এ রকম।

সাম্রাজ্যের কুটুম হিসাবে তার পতাকাতলে বসবাসের খায়েশ থাকলে তিনটা পথ খোলা। এক, বলা: সমর নীতির রদবদল না ঘটা অবধি আমি সাম্রাজ্য বয়কট করছি। দ্বিতীয়ত: অমাননীয় আইন সকল অমান্যের মাধ্যমে কারাবরণ করা। অথবা—শেষমেশ—সাম্রাজ্যের তরফে যুদ্ধে নামা, নেমে যুদ্ধের হিংসাবিরোধী প্রতিরোধ ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করা। 'এই বিবেচনা করেই স্থির করলাম, যোগ্যতা ও ক্ষমতা পাওয়ার স্বার্থে যুদ্ধে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।'

পাছে কেহ কন তুমি মহাত্মার লেখার ভুল অর্থ করছ, তাই উদ্ধৃতি বাড়িয়ে দিচ্ছি: 'ডাকাত দল কারবার চালাবার সময় যে ব্যক্তি নিজে থেকেই ডাকাতের সাহায্য করে, ওদের হরকরার কাজ করে, ওদের চৌকিদার সাজে কিংবা ওরা জখমটখম হলে ওদের সেবা পরিচর্যা করে সেও খোদ ডাকাতদের সমান দোষে দোষী।' গান্ধিজি গোলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করেন নাই—এ কথা সঠিক। তবে তাঁর জবানিতেই বলি, 'যুদ্ধাহতের সেবার মধ্যেই যাদের করণীয় সীমিত, যুদ্ধের পাপ তাদেরও ছাড়ে না।'

২

গান্ধিজির মতন পূণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্য আরো বড় কাজ বরাদ্দ করেছেন ইতিহাস দেবতা। ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসের জন্য খোদ ভারতবর্ষে সৈন্য জোগাড় করবেন ভারতের নেতা। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল নেতার। স্বাধীনতাকামী

চাষিশ্রেণীর মানুষজন এর আগের খাজনা আন্দোলনে নিজেদের গরুর গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছেন গান্ধিজির দলকে। এবার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। ব্রিটিশ রাজের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সহায় হতে প্রস্তুত নয় গুজরাতের চাষাভুষা। দিনে ২০ মাইল করে পায়ে হেঁটে সৈন্য রিক্রুট করতে হল মাহত্মাকে। হাওয়া গরম তখন। লোকজন চেপে ধরে: 'অহিংসার পূজা দেন আপনে, আর আপনেই আমাগো কইতাছেন হাতে হাতিয়ার লইয়া চলিতে?' (গান্ধি ২০০১: ৪৯৯)

যুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে, মানুষের মনে যুদ্ধপ্রসন্ন ভাব জাগাবার জন্য গান্ধিজি কিছু কিছু প্রচারপত্র লিখতেন। এ রকম একটি পাতায় তিনি লেখেন:

> ভারতে ব্রিটিশ সরকার মেলা খারাপ কাজ করেছে। এর মধ্যে একটা আইন পাশ করেছে যার বলে আস্ত একটা জাতির হাতে হাতিয়ার ধরার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের চোখে এটাই ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে খারাপ কাজ। অস্ত্র আইন যদি আমরা' বাতিল করতে চাই, অস্ত্রের ব্যবহার যদি আমরা শিখে নিতে চাই তো এই সেই সুবর্ণ সুযোগ। আজ এই সঙ্কটকালে মধ্যশ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় সরকারকে সাহায্য দেন, তো অবিশ্বাস উঠে যাবে, উঠে যাবে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞাও। (গান্ধি ২০০১: ৫০০)

প্রাদেশিক ব্রিটিশ কর্মচারীরা প্রচারের এই সুরে খুব খুশি হন নাই, গান্ধি এ কথা আত্মচরিতে লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ে দিল্লির বড় রাজ-প্রতিভূ (Viceroy) ভগবান (Lord) চেমসফোর্ডকে লেখা একটা বড় চিঠিও আত্মচরিতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সে চিঠির কি আবেগ!

> আমার দেশবাসীকে যদি পায়ে পায়ে ফেরাতে পারতাম তো আমি তাদের দিয়ে যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিনের জন্য কংগ্রেসের তাবত সিদ্ধান্ত উঠিয়ে নিতাম, "স্বদেশি শাসন", "কেজো সরকার" প্রভৃতি কথা যাতে কেউ কানে কানেও না বলে নিশ্চিত করতাম। সাম্রাজ্যের এই ক্রান্তিলগ্নে ভারতবর্ষের প্রত্যেক লায়েক বেটাকে সাম্রাজ্যের ওয়াস্তে বলি দিতে ভারতকে রাজি করাতাম।... (গান্ধি ২০০১: ৫০১)

সরকারি হিসাব অনুসারে এই এয়ুরোপীয় মহাসমরে প্রায় ৬৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনে বলি হন। কোন অনুশোচনা গান্ধিকে স্পর্শ করে নাই। পিতার মৃত্যুর জন্য গান্ধিজি সারা জীবন অনুশোচনায় ভুগেছেন। স্ত্রী সহবাসের সময় তিনি অস্বস্তিতে ভুগতেন, কারণ বাবার মৃত্যুকালে তিনি না জেনে আবেগের চাপে সঙ্গমলিপ্ত ছিলেন।

১৯২৫ সালে বুয়র যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

এমনকি আজও আমি এমনধারা যুক্তির ভিতর কোন ফাঁকফোকর খুঁজে পাই না। আমার কাজকর্মের কারণে আমি কোন রকম অনুতাপ বোধ করি না। আমার মন তখন ব্রিটিশঝোঁকা। (গান্ধি ২০০১: ৩৯২)

৩

মহাত্মা গান্ধির মতামত বাংলাদেশে অজানা—এ কথা সাধারণভাবে বলা যায় না। প্রখ্যাত প্রয়াত 'কবি' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'সায়েবদের গান্ধি' রচনাতেও এই বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা আছে। (ইলিয়াস ১৯৯৭) তাহলে গান্ধির শান্তিবাদ কি আমাদের মোহ মাত্র? কী ব্যাখ্যা নেহরু বা কৃষ্ণ মেননকে চণ্ডাল মহাত্মা অশোকের উত্তরাধিকারী বানানোর?

বলা হয়ে থাকে গান্ধিজি চরকার মানুষ আর নেহরুজি কলকারখানার সর্দার। তাহলে গান্ধির নৈতিক হত্যায় নেহেরুজি সম্মত ছিলেন বলতে দোষ কী? কোথায় পড়লাম মনে পড়ছে না, এক সাংবাদিক গান্ধিজিকে জিজ্ঞেস করছেন: 'হোয়াট ডু ইউ থিংক অব মডার্ন সিভিলাইজেশন?'—আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে আপনার কী অভিমত? গান্ধির জবাব: 'দ্যাট উড বি এ গুড আইডিয়া'—হলে ভালোই হত।

গান্ধিজির চরকা আর নেহরুজির পরিকল্পনা একই মুখের দুইটি চোখ। ভারতের কথিত শান্তিবাদী ঐতিহ্য ও জঙ্গিবাদী পথ কি তেমনি একই যাত্রার দুইটি ধকল নয়? এদের মুখোমুখি কল্পনা করে নিছক ভ্রান্তির ছলনা বাড়ে। স্বল্পমেয়াদী সান্ত্বনা জোটে যশস্বী সাংবাদিকের।

দক্ষিণ এশিয়ায় পরমাণু বোমার ভূমিষ্ঠান আজ ২৫ বৎসরের কথা। কংগ্রেসাধীন দিল্লিতে কেন সেদিন বিজেপি পৃথিবীতেও ছিল না। আর আজ ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসও এই পরমাণু বোমার ব্যাপারে বিজেপি'র বাইরে নয়। পাকিস্তানের অঙ্ক এখানে কষার জায়গা নাই। সেখানেও শান্তিবাদ ও জঙ্গিবাদ এই দুই ধারণাকে পরস্পরবিরোধী প্রত্যয় না ঠাউরে যদি পরস্পরের পরিপূরক ধরে লেখাপড়া করি তো কিছু শিক্ষা হয়। আর বলব কি?

আজ ভারতে যাঁরা পরমাণু বোমারু, দেশ থেকে বিদেশি হামলার সকল চিহ্ন মুছে দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের দাবি তুলছেন তাঁরাই। তাঁরা বলছেন, এক্ষেত্রে ইংরেজ যে অর্থে বিদেশি, পাঠান বা মোগল শাসকরাও সেই অর্থেই বিদেশি। দেশি কেউ ভুলে মুসলমান হয়ে থাকলে তাকে না হয় স্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে নে।

অযোধ্যার মসজিদের বিষয়ে গান্ধিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ দল উগ্র হিন্দুত্ববাদের হাতে মার খেয়েছেন—যেমন মাঠে তেমনি ইতিহাস আর সমাজ পাঠেও। উগ্র হিন্দুর মতে ওখানে মসজিদের আগে মন্দির ছিল। ঠাণ্ডা সেকুলার বলেনঃ না, ছিল না। বাবরি মসজিদ তৈরির আগে ঐ জায়গায় কোন মন্দির ছিল কিনা তা ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞান দিয়ে ফয়সালা হোক—এ দাবি উগ্র হিন্দুর নয়, সেকুলার পণ্ডিত, রাজনীতিক দল, এমনকি তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ সরকারেরও।

'যেন মন্দির থেকে থাকলে উগ্রহিন্দুর দাবি যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে'—পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এ মন্তব্য একেবারে লাগসই। পার্থের কথা আর একটু তুলে দেইঃ

> ... জাতীয়তার যে ইতিহাস গত শতাব্দী থেকে লেখা হয়ে এসেছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে রয়েছে এমন সব কাহিনী, ধারণা, ব্যাখ্যা যা আজকের উগ্রহিন্দু প্রচারের প্রধান উপাদান। সত্যি বলতে... হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই প্রতিচ্ছবি, আয়নায় মুখ দেখার মত—তার রূপ, আকৃতি, গড়ন, অবিকল এক। (ভদ্র ও চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮: ১২১)

ভারতীয় জাতীয় প্রকল্পের যে নকশা গান্ধিজির বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, তারও উৎস এক এবং অভিন্ন। সংক্ষেপে তার নাম প্রাচীন আর্য বা হিন্দু সভ্যতা। গান্ধিজি বা কবিগুরু এসলামকে সম্মান দেখান মেহমানজ্ঞানে, ঘরের মানুষ বিচারে নয়। যেখানে এসলাম লোক সংস্কৃতি হয়ে ভারতীয় হয়ে গেছে সেখানে আপত্তি নাই। এসলাম একই সাথে এসলামও থাকবে আবার ভারতীয় সংস্কৃতির শরিকও হবে—এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

অথচ—পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র তাঁদের বিভিন্ন লেখায় দেখিয়েছেন—এয়ুরোপীয় লেখাপড়া এয়ুরোপীয় হইয়াও ভারতীয় গণ্য হতে পারে। এসলামি লেখাপড়া কেন তাহলে যুগপৎ ভারতীয় ও এসলামি হতে পারবে না? ভারতীয় জাতীয়তার মূলধারাতেই সাম্প্রদায়িকতার 'বিষবৃক্ষ' রোপিত আছে। এ বিষয়ে কথা বাড়াবার সুযোগ এই লেখায় নাই।

উগ্র হিন্দুর হাতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন এ তথ্য সত্য জেনেও প্রশ্ন তোলা দরকারঃ গান্ধিজি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, তবে কোন অর্থে? ধর্ম নিরপেক্ষতা কোন চিজ?

৪

বিদায়ের আগে বলি: পরমাণু বোমার অধিকার অখণ্ড সোবিয়েত ইয়ুনিয়নকে খণ্ডের হাত থেকে বাঁচায় নাই। উগ্র হিন্দু যদি ভাবেন পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয়ায় তারা খণ্ড ভারত আবার জোড়া দেবেন, তো তাদের হিসাব ঠিকই আছে। শুদ্ধ কথা থাকে, তার আগে বর্তমান ভারতও গলে যাবে। সারা দক্ষিণ এশিয়া আত্মসাৎ করার আগে বর্তমান ভারতকে ধূলিসাৎ হতে হবে।

সেই অনাগত অখণ্ড ভারতে নতুন অশোক চিনের সাথে পরাজয়ের দায় নেবেন না, চিনে বৌদ্ধ ধর্ম পাঠাবেন নতুন করে। নতুন কোন কবি হয়তো আবার লিখবেন:

> কলিঙ্গ নিরস্ত্র হোক
> এই ভেবে সম্রাট অশোক
> রক্তের ধুলির পরে ওড়ালেন বৈরাগ্যের ছাই।
> (খান ১৯৮১: ৯)

....

চিন্তা, ৩১ মে ১৯৯৮

§ ১৭

স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের অখণ্ড ভারত[১]

> Even if I had not found words for it, I had believed as a child in the wholeness of India.
>
> যখন শিশু ছিলাম তখন আমি ভারতবর্ষের অখণ্ডতায় বিশ্বাস স্থাপন করি, যদিও কথাটা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি নাই।
>
> —বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপল[২]

প্রথম আলো পত্রিকার ৩০ জুন ২০০০ সংখ্যায় 'নাইপলের পাকিস্তান' নাম দিয়ে হাসান ফেরদৌসের একটি লেখা ছাপা হয়েছে। লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় খ্যাতনামা ইংরেজি গদ্যলেখক স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের একটি বই। (দেখুন, সংবর্ধনা ৪) বইয়ের প্রতিপাদ্য ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া—এই চার দেশের মুসলমান সংখ্যাগুরুর রাজনীতি। এই চার মুলুক ভ্রমণ করে স্যার বিদিয়া ১৯৮১ সালে (তখনো তিনি স্যার হন নাই) আরেকটি বই ছেপেছিলেন। সে বইয়ের দ্বিতীয় নাম *এসলামি সফরনামা* (*An Islamic Journey*) থেকে স্যার বিদিয়ার মনে কী আছে খানিক আন্দাজ করা চলে। (নাইপল ১৯৮১) তিনি বেরিয়েছেন এসলামের সমালোচনা করতে—ইরান, পাকিস্তান কিংবা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া তাঁর আক্রোশের বিষয় নয়।

হাসান ফেরদৌস স্যার বিদিয়ার পক্ষ নিয়েছেন। এক বিচারে এসলামের সমালোচনায় স্যার বিদিয়াকেও হার মানিয়েছেন তিনি। তিনি তাঁর লেখার নাম দিয়েছেন 'নাইপলের পাকিস্তান'। পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিল এবং বাংলাদেশের জনগণের উপর

একটি অন্যায় যুদ্ধ—গণহত্যা ও ধর্ষণসমৃদ্ধ যুদ্ধ—চাপিয়ে দিয়েছিল। তা দিয়েছিল এসলামের কারণে বা এসলামের নামে—হাসান ফেরদৌসের যুক্তি এটাই। পাঞ্জাবি শাসকশ্রেণী নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে এসলামের ব্যবহার করেছিল কিনা সেই কথা হাসান বিবেচনায় নেন নাই। হাসানের যুক্তি যদি মানতে হয় তো কবুল করতে হয় দুনিয়ার যেখানেই এসলাম আছে সেখানেই এমন যুদ্ধ, গণহত্যা ও ধর্ষণ ঘটতে বাধ্য। সেই সঙ্গে আরো কবুল করতে হয়—যেসব দেশে এসলামের আধিপত্য নাই সেসব দেশে এমনধারা যুদ্ধ, গণহত্যা ও ধর্ষণ ঘটে না। বলা বাহুল্য, হাসান তা করেন নাই।

হাসান যুক্তি দেখানোর যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা যুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে খুব সম্মানযোগ্য বিবেচিত হয় না। পাকিস্তানের অপকর্মের কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধর, তার চোখে জল আন। তারপর বল এসলাম ছাড়া তোমার চোখের এ জল আনল বল কে? চোখে কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে পাঠকের মন জয়ের যুক্তিকে লাতিন ভাষায় বলা হয় *আদ হোমিনেম* (*ad hominem*)—'টু দি ম্যান' বা 'লোকমাফিক' যুক্তি।

অভিধানে লিখেছেঃ '[an argument] designed to appeal to the personal sentiments or prejudices of the listener.' (ব্লিস ১৯৬৬: ৬৬) শ্রোতার আবেগ বা পূর্বসিদ্ধান্তকে উসকিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধিমূলক যুক্তির নামই *আদ হোমিনেম*। হাসান ফেরদৌস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আবেগ ও পূর্বসিদ্ধান্ত জাগিয়ে স্যার বিদিয়ার মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার দিকটা আড়াল করেছেন।

হাসান ফেরদৌস রচিত বাক্যের গড়ন নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না। কিন্তু তাঁর চিন্তার চলনকথা আমাকে তুলতেই হবে।

'একথা নির্ঘাত সত্য যে, তিনি এসব কাহিনী একটি বিশেষ রাজনৈতিক বা এমনকি আদর্শগত অবস্থানে থেকেই তাদের নির্বাচন করেছেন, তাদের ব্যবহার করেছেন।' এই সত্য কবুল করতে না করতেই হাসান দাবি করলেন, 'কিন্তু এ কথা তো সব লেখকের এবং সব লেখার বেলাই সত্য।' (ফেরদৌস ২০০০; দেখুন, সংবর্ধনা ৪)

একই সঙ্গে হাসান আরো দাবি করেন, নাইপলের বইতে কোন রাজনৈতিক বা আদর্শগত অবস্থানের ছায়া নাই। তাঁর 'এই গ্রন্থ কেবল একটি মানবিক ভ্রমণ কাহিনী।' হাসানের এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে আমাদের একটা গোলযোগ আছে। তাই আমাকে এখানে দুই কথা লিখতে হবে।

১

কিছুদিন আগে মহারানা মেবার ফাউন্ডেশনের একটা পুরস্কার নিতে স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপল ভারত ইয়ুনিয়ন সফর করেন। ওয়াকেবহাল মহলের মতে, তিনি ভারত সফর করলেন এ নিয়ে মোট নয় নয় বার। আজ পর্যন্ত স্যার বিদিয়া মোট ২৫টি বই বের করেছেন। এদের মধ্যে গোটা তিন ভারত বিষয়ে লেখা। তাঁর শেষ সফর উপলক্ষে দিল্লিতে তিনি খ্যাতনামা সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেন। গত ৮ মে (২০০০) দিল্লির *আউটলুক* নামের এক পত্রিকায় সেই কথাবার্তার কিছু অংশ ছাপা হয়েছে। (পটেল ২০০০) *আউটলুকের* এই পাতা কয়টা আমাকে পড়তে দিয়েছেন *প্রথম আলো* পত্রিকার বাড়তি সম্পাদক বন্ধু সাজ্জাদ শরিফ। এখানে তাঁর শোকর আদায় করি।

নাইপলের কাছে খুশবন্তের সহযোগী ভাইচাঁদ পটেল মহোদয়ের জিজ্ঞাসা: 'নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভাগে চলে আসছে—এ বিষয়ে আপনার কোন মন্তব্য?' নাইপল বললেন: 'বিষয়টা আমি তেমন একটা খতিয়ে দেখি নাই। খুশবন্ত, তুমিই বরং বল না কেন আমাকে।' খুশবন্ত বললেন:

> বিষয়টা আমাকে বড় কষ্ট দেয়। যা কিছু হিন্দু নয় এমন সব কিছুর বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার মাত্রা বেড়ে গেছে এবং তা জোরদার হচ্ছে। মকবুল ফিদা হুসেনের বিরুদ্ধে একজন হিন্দুদেবীর নগ্নমূর্তি আঁকার পর যে হামলা চালানো হয় তা এই অসহিষ্ণুতার একটা ভালো উদাহরণ। ওরা তাঁর ছবিটবি সব গুঁড়িয়ে দেয়, তাঁর বাড়ি তছনছ করে। উনি যদি হিন্দু হতেন তো এহেন গুণ্ডামি করা হত না—এ বিষয়ে আমি একদম নিশ্চিত। যে কোন পুরানা শিল্পকর্মের দোকানে গেলেই শিব-পার্বতীর সঙ্গমরত মূর্তি পাওয়া যায়। রাধা ও কৃষ্ণের খোলামেলা মৈথুনদৃশ্য সংবলিত ছবি গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়।

প্রতিবাদে নাইপল বললেন: 'এই ঘটনায় একটা অনুকরণের ব্যাপার আছে, সন্দেহ নাই। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা এসলামি মৌলবাদীদের নকল করছে।' জবাবে খুশবন্ত বললেন:

> আমার ধারণা, ওরা একে অপরের নকল করছে। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা এসব প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে ভারতের অ-মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদের অজুহাত

> আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তাদের প্রতিপক্ষীয় মুসলমানরা অনবরত জেহাদের আহ্বান জানাচ্ছে বলেই তারা পতিক্রিয়াস্বরূপ এই পথ বেছে নিয়েছে।

'কিন্তু এসব তো ছোটখাট উৎপাত মাত্র'—মন্তব্য করলেন নাইপল। খুশবন্ত একটু খেপে গেলেন: 'অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মত ঘটনাকে ছোটখাট উৎপাত বলতে পার না তুমি!' নাইপল জানালেন:

> আমি ঐ ঘটনাকে ঐতিহাসিক শোধ নেওয়া বলতে চাই। অযোধ্যার মসজিদটি বাবর বানিয়েছিলেন ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। বাবর ভারত ভালোবাসতেন না। বাবর যে ভারতকে ঘৃণা করতেন—ঘৃণা করতেন তার জনগণ ও ধর্মবিশ্বাসকে—সে কথা দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে বলেই তো আমার মনে হয়।

খুশবন্ত সিং একটু দম নিয়ে বললেন:

> আমরা তো ধরে নিয়েছিলাম ১৯৪৭ সাল থেকে একটা নতুন যুগের সূচনা হল। অতীতের কথা অতীতেই পড়ে থাকবে। হিন্দু মৌলবাদীরা কোমরে গামছা বেঁধে নেমেছে আর বাইরে থেকে আসা দুই ধর্মের—এসলাম ও নাসারাধর্মের—অনুসারীদের দিকে নিশানা তাক করছে।

নাইপল মনে করেন:

> নাসারাধর্ম ও ইসলাম দুটাই অসহিষ্ণু ধর্ম। ওদের ইতিহাস অসহিষ্ণুতারই ইতিহাস। নাসারাধর্মেরও একটা খারাপ ইতিহাস আছে। এদেশে পর্তুগিজরা যে নাসারাধর্ম নিয়ে এসেছিল সে বস্তু চিন্তাচেতনায় বড় ধরনের অসহিষ্ণু আর ভয়ানক, ভয়ানক নির্দয় ছিল। বিশ শতাব্দীর নাসারাধর্ম সেই তুলনায় বড় নরম।

সবশেষে খুশবন্ত সিং বললেন:

> তবু, আমি চাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভিতরের বিষটা বের হয়ে যাক। ওদের তালিকায় আরো ৩০০ মসজিদ ধ্বংস করার কর্মসূচি আছে। এই তালিকা থেকে দুটি মসজিদ—একটি মথুরায়, আর একটি বারাণসীতে—ধ্বংসের সিদ্ধান্ত বিজেপিও গ্রহণ করেছে। এই ধরনের মাথাখারাপ কাজ দেশে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে।

সিংজির এই কথার পিঠে স্যার বিদিয়াধর কী বলেছেন আমাদের জানার সুযোগ হয় নাই। ততক্ষণে আলোচনার প্রসঙ্গবদল ঘটে।

স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদের এই জাতীয় মতামত থেকে কী ধারণা আমরা করতে পারি? তাঁর বই 'একটি মানবিক ভ্রমণ কাহিনী' মাত্র নয়। কাহিনীর আড়ালে যে ছক লুকিয়ে আছে হাসান তা দেখেন নাই। তিনি

প্রতারিত হয়েছেন। আমাদেরও ঠকিয়েছেন। হাসানের জন্য আমার প্রার্থনা আছে। আমেরিকার খ্যাতনামা ফিলিস্তিনি অধ্যাপক এডোয়ার্ড সায়িদকে তিনি 'প্রাচ্যবিশারদ' উপাধি দান করেছেন। সায়িদ যদি কিছু হয়ে থাকেন তো তাঁকে বলা যায় 'প্রতীচ্যবিদ্যা বিশারদ'। উনি মোটেও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ কিংবা প্রাচ্য বিশারদ কোনটাই নন। উনি বরং প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের গোষ্ঠী উদ্ধার করেই *ওরিয়েন্টালিজম* (*Orientalism*) নামে একখানা কেতাব রচনা করেছেন। হাসান সম্ভবত বইটির নাম শুনেই এই ভ্রমে পড়েছেন।

প্রাচ্যবিদ্যার সমালোচনার সূত্রে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ উপাধি পাওয়া গেলে হাসানকেও আমরা মৌলবাদ বিশারদ উপাধি দিতে পারি। কিন্তু একটি ভালো কথার বাজে খরচ আমরা করব না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় তপন রায়চৌধুরীকে 'দার্শনিক' বলা 'ভালো' কথার বাজে খরচ। প্রতীচ্য বিশারদ সায়িদ ও প্রাচ্য বিশারদ রায়চৌধুরীর নাইপল বিচার হাসান বোধ হয় অগ্রাহ্য মনে করেন। তাই কি এ মশকরা? *আউটলুক* পত্রিকার মোলাকাতি আলাপেও স্যার বিদিয়া বলেছেন:

> কোষ্ঠী অনুসারে ইসলাম জাতে আরব ধর্ম। যে বা যারাই মুসলমান অথচ আরব নয় সে বা তারাই নও-মুসলমান (কনভার্ট)। নও-মুসলমান মাত্রই দুনিয়াকে আর চোখে দেখে। ওদের তীর্থস্থান আরব দেশে, ওদের বেহেশতের ভাষা (স্যাক্রেড ল্যাঙ্গুয়েজ) আরবি। নিজ ইতিহাসে ওদের মতি নাই, আর নিজের ইতিহাসের জমিন থেকে ওরা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে। গভীর গভীর অর্থে নও-মুসলমান মাত্রই গোলাম জাতির মানুষ (এ কলোনাইজড পিপল)!

স্যার বিদিয়ার এই গৌরবোক্তি দুনিয়ার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্পর্কে কতখানি সত্য জানি না তবে এ উক্তি যে স্যার বিদিয়ার আপন ব্যাপারে একান্ত সত্য তা আমি এক প্রকার হলপ করে বলতে পারি। মহাত্মা ফ্রয়েডের আবিষ্কার মোতাবেক আমরা জানি অজ্ঞানলোকের সত্য নিজেকে সোজাসুজি প্রকাশ করতে পারে না। প্রকাশ করে বাধা ডিঙ্গিয়ে, অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে অজ্ঞানের গোলা ছোঁড়ে। মনীষী জাক লাকাঁ বলেন মানুষের অজ্ঞান বাস করে পরচর্চার ভিতরেই (The unconscius is the discourse of the Other)।

লোকে যে কথায় কথায় 'মাদার-ফাকার' বলে—এর বাংলা তর্জমা দিলাম না এখানে—তার তাৎপর্য কী? ফ্রয়েড বলেন: যে এই কথা বলছে সে নিজের

অজ্ঞাতসারে নিজের বাসনাই এ কথায় প্রকাশ করছে। এরই নাম 'অয়দিপায়ুসের বাসনা'।

স্যার বিদিয়ার পূর্বপুরুষ (সম্ভবত পূর্বনারীও) ভারত থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ ত্রিনিদাদে পৌঁছেছিলেন মুচলেকা দেওয়া দাস (বন্ডেড লেবর) হিসাবে। স্যার বিদিয়া বলেন:

> এর মধ্যে কয়েক জেনারেশন পার হয়ে গেছে। একশ বছর পার হওয়ার পর আমার বাপ-দাদার ভিটা কোন জায়গায় ছিল, সঠিক বলা বড় মুশকিলের ব্যাপার। ভারতের নানান ঠাঁই থেকে আমার আটজন বড় বাবা বড় মা (গ্রেট গ্র্যান্ড প্যারেন্টস) এসেছিলেন। আমার নানা মশায়ের বাড়ি ছিল উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, গোরক্ষপুরের কাছাকাছি এক গ্রামে। ১৯৬২ সনে ঐ গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। মাত্র সেই একটি ঠিকানাই আমাদের সত্য জানা ছিল। এখন সেই আত্মীয়তাটুকুও গেছে।

স্যার বিদিয়ার বাড়িতে এক সময় হিন্দি বলার রেওয়াজ ছিল। আজ সবাই কেবল ইংরেজি চালায়:

> নিত্যদিনের আলাপ-আলোচনায় আগে হিন্দি চলত। ১৯৪০ দশকেই—আমি তখন বাচ্চা মানুষ—বাড়িঘরে হিন্দি বলার চল উঠে যায়। ইংরেজির সাথে কুস্তিতে হিন্দি হেরে গেছে।

ত্রিনিদাদে যতই হারুক, স্যার বিদিয়ার ভুবনে হিন্দির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে অনেক গভীরে। ১৮ বছর বয়সে স্যার বিদিয়া বিলেত যান। প্রথম ভারত সফর তাঁর ২৯ বছর বয়সে। ভারতের দারিদ্র্য ও দুঃখ তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা দেয়। যে দুঃখ তিনি ত্রিনিদাদে ফেলে এলেন সে দুঃখের ব্যথা কুড়িয়ে পেলেন স্বপ্নের দেশ ভারতে। ভারতের যে দুঃখের ইতিহাস তিনি তৈরি করলেন সেখানেই হয়ে উঠলেন 'ব্রিটিশ সভ্যতার মুক্তকণ্ঠ ঢোলবাদক' এবং মুসলমান সভ্যতার ঘোর সমালোচক। স্যার বিদিয়ার নিজের ভাষায় তিনিও হয়ে উঠলেন 'গভীর গভীর অর্থে গোলাম জাতির মানুষ'।

বিলাতে পড়ালেখা করতে গিয়ে স্যার বিদিয়া আবিষ্কার করলেন ভারতেতিহাসের নতুন সংস্করণ। স্থির করলেন সাম্প্রতিক ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কারণ ব্রিটিশ শাসন নয়, বরং তার আগেকার মুসলমান শাসন। লক্ষণীয়, তিনি ব্রিটিশ শাসনকে কখনো খ্রিস্টান (বা নাসারা) শাসন বলেন না। ভারতের দুর্ভোগের ইতিহাস তিনি খ্রিস্টীয় ১০০০ সন নাগাদ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেন। স্যার বিদিয়ার এই ইতিহাস-পড়না রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিনায়ক সাভারকর প্রভৃতি ইতিহাসকরের চাইতেও সামান্য বেশি হিন্দু

সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। ১০০০ সনের পরের ইতিহাস তাঁদের চোখে সব মিলিয়ে পরাধীনতার ইতিহাস। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজনৈতিক মতবাদ এই বিচারেরই নৈতিক ফলাফল বৈ কি! বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাষায় স্যার বিদিয়াও তাই সহজেই বলেন—বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা 'ঐতিহাসিক প্রতিশোধ' গ্রহণ বৈ নয়!

২

স্যার বিদিয়ার এসলাম পর্যটন নির্দোষ মানবিক ভ্রমণকাহিনী না ঐতিহাসিক প্রতিশোধ গ্রহণের অংশ—এই বিচারের আগে আসুন আমরা তাঁর জবানবন্দি গ্রহণ করি। 'লেখা ও পড়া: আমার জবানবন্দি' নামের এক লেখায় স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ অকপটে আপন বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। তার ভাবানুবাদ এই রকম:

> আমি যখন একেবারে বালকটি তখনি আমি ভারতের অখণ্ডতায় ইমান এনেছিলাম—যদিও তখন আমার মুখে শব্দটি জোগায় নাই। আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরের খোলা মাঠে *রামায়ণ*-ভিত্তিক *রামলীলা*'র অভিনয়, আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আর আমাদের বাড়ি-ঘরের কেতাকানুন সবই ছিল ঐ অখণ্ডতার খণ্ড; এই অখণ্ড ভারত আমার পিছনে ফেলে আসা ভারত। আমার মনে অতীতের এই নতুন ব্যাখ্যা আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে স্পষ্ট হয় আমাদের বাপ-দাদার যে সভ্যতার উদ্দেশে আমরা দূরদেশি এক উপনিবেশে বসে পূজা নিবেদন করেছি নানান উপায়ে, যে সভ্যতাকে মনে করেছি প্রাচীন এবং ছেদহীন সেই সভ্যতাও মুসলমান হার্মাদদের হামলার মুখে অসহায় অবস্থায় পড়েছিল; আদ্ধেকটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভারতের অসহায়তাকে স্পেনীয়দের তোপের মুখে মেহিকো ও পেরুবাসীদের অসহায়তার সাথে তুলনা করা যায়।

স্যার বিদিয়ার এই নতুন পাওয়া জ্ঞান—এই উপলব্ধি—তাঁকে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যে প্রধান ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে তার মুখামুখি দাঁড় করায়। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সচরাচর 'জাতীয়তাবাদী' ইতিহাস বলা হয়ে থাকে। নাইপল এই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বর্জন করেন। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি কবুল করেন সেই অতীতের নতুন বিচার 'নিউ আইডিয়া অব দি পাস্ট'কে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক' দৃষ্টি বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। নাইপল লিখেছেন:

> ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতের উপর যে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সে ধ্বংসযজ্ঞকে খানিকটা কমিয়ে দেখেছিল। ঐ ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষ্য-প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা ঐ আন্দোলনকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন; ফলে তাঁরা যা দেখবেন না বলে মনস্থির করলেন, তা আর দেখলেন না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের চোখে না পড়া সেই ধ্বংসযজ্ঞ কী বস্তু স্যার বিদিয়া তা চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেখালেন। তিনি লিখলেন:

> হজরত ইসার ১০০০ সনের পরবর্তী ছয়শ বছরেরও বেশি কাল ধরে মুসলমান হার্মাদরা উপমহাদেশকে যেমন ইচ্ছা তেমন ধর্ষণ করেছে। ওরা রাজ্য আর সাম্রাজ্য গড়েছে, একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ওরা দেশের উত্তরাপথের দেশীয় ধর্মমন্দির নিশ্চিহ্ন করেছে। ওরা দাক্ষিণাত্যের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়ে মন্দিরাদি কলুষিত করেছে।

স্যার বিদিয়ার মতে, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঐ কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত পরাজয়ের দিন সম্বন্ধে কী মনোভাব গ্রহণ করা উচিত তা ঠিক করতে পারে নাই। এই সময় ইতিহাস নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। ব্রিটিশ রাজার আগেকার রাজা-প্রজা, প্রভু-দাস, মোমেন-কাফের সবাইকে এক কাতারে টেনে আনা হয়। মহান ব্রিটিশ সিংহের মোকাবেলায় এহেন গড় কাতারের একখানা অর্থই দাঁড়ায়—এ কথা স্যার বিদিয়া অবশ্য জানেন। কিন্তু তবুও তাঁর মানতে বাধে, এ ইতিহাসকে সত্য বলে স্বীকার করতে তাঁর কুণ্ঠা আছে। বিদিয়া বলেন: ব্রিটিশ রাজত্বের আগে নয়, এসলামি রাজত্বের আগেই বরং ভারতবর্ষ অখণ্ড ছিল। এটা দেখাতে জাতীয়তাবাদী লেখকদের তেমন অসুবিধা হয় না। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দে—কারও কারও মতে—ভারত পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি ছিল, চিনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ধর্মযাত্রা করতেন।

ভারতের সবকিছুরই অবনতি হয় মুসলমান শাসনের ফলে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে স্যার বিদিয়া চতুর্দশ শতাব্দের পর্যটক এবনে বতুতার *রেহালা* বা *সফরনামা* সাক্ষী মানেন। স্যার বিদিয়ার মতে এবনে বতুতার সাক্ষ্য অনুসারে ঐ সময় ভারত খণ্ড ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই অবস্থা তখন। স্যার বিদিয়া লেখেন:

> তিনি (এবনে বতুতা) মুসলমানের পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখা দেশ ভারতে এসেছিলেন। তাঁকে পাঁচ গ্রামের খাজনা (বা ফসল) বখশিস দেওয়া হল; এরপর—

> দেশে ভিক্ষার অভাব দেখা দিলেও তাঁকে আরো দুটি গ্রাম দেওয়া হয়। তিনি সাত বছর ছিলেন। শেষমেশ তাঁকেও পালাতে হয়।

স্যার বিদিয়া জানাচ্ছেন:

> এবনে বতুতার পৃষ্ঠপোষক, দিল্লির মুসলমান সুলতানটি রক্তপাত পছন্দ করতেন, তাঁর দরবারের সামনের উঠানে মানুষ জবাই (এবং যন্ত্রণা দিয়ে মারা) পছন্দ করতেন, পছন্দ করতেন লাশ তিনদিন ফেলে রাখতে। এবনে বতুতা তো জানতেন মুসলমান শাসক মাত্রই—সে দুনিয়ার যে দেশেই হোক—এ রকম রক্তপাত পছন্দ করেন। সেই তিনিও ভারতের মুসলমান শাসকের ব্যবহার দেখে ভয় পেতে শুরু করলেন।

এবনে বতুতার বরাত দিয়ে স্যার বিদিয়া বললেন: তখন ভারতীয় হিন্দুরা ছিল গ্রামের ভূমিদাস অথবা সাধারণ দাস। ভূমিদাসের সংজ্ঞা তিনি এভাবে দেন: 'রাজার সম্পত্তির অংশ অথবা গনিমতের অংশ যা পর্যটককে উপহার হিসাবে দেওয়া যায়।' দাসের অস্তিত্ব বিষয়ে নাইপল প্রমাণ দাখেল করলেন খোদ এবনে বতুতার মধ্যবর্তিতায়। নাইপল জানালেন: 'এবনে বতুতা দাস শ্রেণীর মেয়ে (slave girls) নিয়ে দেশ সফর করা পছন্দ করতেন।'

স্যার বিদিয়া মনে করেন: 'দেশীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মুসলমান ধর্মগুরুর কোন কৌতূহল দেখা যায় নাই (অবশ্য তার অদ্ভূত দিকটার কথা বাদ দিয়ে)। দিল্লিতে তাদের মূর্তিটুর্তি—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে বলতে—উৎখাত করা হয়। দেশের জমি দেশের মানুষের হাতছাড়া হয়ে যায়। বিদেশি রাজার হাতে দেশের মাটির পবিত্রতা নষ্ট হয়।'

স্যার বিদিয়ার জবানবন্দি থেকে এইটুকু তুলে দিলাম তাঁর মনের গড়নটা কোনখানে তার কিছু আভাস হিসাবে। এই কাঠামোটা বাদ দিয়ে যদি আমরা শুদ্ধ তাঁর এসলামি ভ্রমণকাহিনীর মানবিক বিশুদ্ধতা খুঁজি একটা বড় আকারের ভুল করব। ব্রিটিশ কেন সারা এয়ুরোপ-আমেরিকার এসলাম-বিদ্বেষও এই গড়নের উপরই দাঁড়ায়। স্যার বিদিয়ার কাজ এর অন্তর্গত।

৩

স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদের এসলাম আর এয়ুরোপের এসলাম নানান কারণে এক হয়ে দাঁড়ায়। এর পুরো তদন্ত করার জায়গা এই প্রবন্ধে নাই। সংক্ষেপে একটি মাত্র নজির আমি পেশ করব।

১৯৫৪ সনে আলজিরিয়া যখন ফরাসি দখলদারদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেয় তখন ফ্রান্সের উপনিবেশ মার্তিনিক (এই দ্বীপটিও নাইপলের দেশের মত দক্ষিণ-মধ্যদক্ষিণ আমেরিকায়) থেকে আগত ফ্রানৎস ফানোঁ আলজিরিয়ায় ডাক্তারের চাকরি করছিলেন। ফানোঁর জন্ম ১৯২৫ সনে। বয়সে নাইপলের সাত বছরের বড় তিনি। দ্বিতীয় এয়ুরোপীয় মহাসমরে ফানোঁ ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সাধারণ সৈনিক হিসাবে। তখন ওঁর বয়স আঠারও হয় নাই। আলজিরিয়ায় ফরাসি দখলদার সরকারের নীতি আর ব্যবহার দেখে ফানোঁ আলজিরীয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দেন। আলজিরিয়া স্বাধীনতা পাওয়ার কিছুদিন আগে—১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে—ফানোঁ মারা যান। তাঁর বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ।

১৯৫৯ সনে ফানোঁ *আলজিরীয় বিপ্লবের পঞ্চম বছর* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ইংরেজি অনুবাদে বইটির নাম *মরণমুখী উপনিবেশবাদ* (*A Dying Colonialism*)। এই বইতে ফানোঁ দেখিয়েছেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় আলজিরিয়ার মানুষ দখলদারদের উপহার দেওয়া ভালো জিনিসটিও যেমন ওষুধপত্র ও বেতারযন্ত্র প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ একই উদ্যোগ যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিজেই গ্রহণ করল তখন কেউ সে সব জিনিস কবুল করতে পিছ-পা হল না। পর্দার ক্ষেত্রেও তাই।

ফানোঁ অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে আছে পর্দাপ্রথা, রেডিও সম্প্রচার এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসায়। আমি এখানে শুদ্ধ পর্দাপ্রথার উদাহরণটাই সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

ফরাসি ঔপনিবেশিক যুগের গোড়ার দিকে—অর্থাৎ ১৮৩০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত একশ বছর ধরে—আলজিরিয়ার মেয়েরা জাতীয় পোশাক হিসাবে মাথা-চাদর (বা হায়েক) পরতেন। কুড়ি বছর আলজিরিয়ায় বসবাস করার পরও বহু ফরাসি নাগরিককে বলতে শোনা গেছে—আমার সহকর্মীর বউয়ের চেহারাটা দেখলাম না। এই যুগে এই পর্দা বা হায়েক দিয়ে নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করার দেশীয় কৌশল পরিণত হল জাতিকে—অন্তত জাতির অর্ধেক অংশকে—বিজাতি থেকে, দখলদারের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার কৌশলে।

এই সময়—১৯৩০ সনের দিকে—ফরাসি পণ্ডিত ও সমাজবিজ্ঞানীরা রায় দিলেন বাইরে বাইরে পিতৃতান্ত্রিক ভেক ধারণ করলেও আলজিরিয়ার সমাজ শেষ বিচারে মাতৃতান্ত্রিক। এই সিদ্ধান্তের অনুবলে, ফরাসি সরকার ঠিক করলেন তাঁরা আলজিরিয়াকে পর্দামুক্ত করবেন। ভাবলেন—আমরা যদি আলজিরিয়ার মেয়েদের জয় করতে পারি তো গোটা জাতি জয় করতে বেশি

দিন লাগবে না। তাই তাঁরা পর্দার বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেন। ফরাসিদের এই ঘোষণার সঙ্গে যোগ হল নানা প্রকার এনজিও সংগঠনের কাজ। বিনা পয়সায় সেমাই বিতরণ হল। হর কিলো সেমাইয়ের সঙ্গে দেওয়া হল লাখ কিলো দামের দীক্ষা—ঘোমটা খোল। আলজিরিয়ার 'বর্বর অসভ্য' পুরুষের হাত থেকে মুক্ত করে নারী স্বাধীনতার ডাক দিলেন ফরাসি সরকার। মজার ব্যাপার, খোদ ফ্রান্সেই তখনো মেয়েদের ভোটাধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

এর প্রতিক্রিয়ায় আলজিরিয়ার পুরুষরা 'ঘোমটা' পরার পক্ষে জেহাদ ঘোষণা করলেন। বেশির ভাগ মেয়েও পুরুষদের পক্ষ নিলেন। কিন্তু কোন কোন মহিলা ঘোমটা পরা বাদ দিলেন। আলজিরিয়ার গোপন সম্পদ প্রকাশ্য হওয়ার পর নতুন এক মজা দেখা দেয়। ফরাসি মেয়েদের একাংশ আলজিরীয় মেয়েদের ঘোমটা ছাড়াটা পছন্দ করলেন না। তাঁরা ভয় পেলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়ার ভয়। ফরাসি নারীদের একাংশ আলজিরীয় পুরুষশাসিত সমাজের পক্ষ নিলেন।

এমন সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে প্রথম দিকে মেয়েরা তেমন একটা অংশ নেন নাই। এক বছর পর মেয়েরা প্রথম যুদ্ধে যোগ দেন বার্তাবাহক ও পাহারাদার হিসাবে। আলজিরিয়ায় পরাধীন শহরের গঠন ছিল এমন যে আরবরা থাকতেন শহরের মাঝখানে আর তার চারপাশে থাকত এয়ুরোপীয় দখলদারের ভিটে। সাধারণত চাকরানি মেয়েরা ছাড়া কেউ—কোন আরব মেয়েছেলে—দখলদার পাড়ায় যেতেন না। বিপ্লবের প্রয়োজনে যখন মেয়েদের সেসব পাড়ায় পাঠানোর ডাক এল, তখন পর্দাত্যাগী মেয়েছেলেদের মূল্য ঢের বেড়ে গেল। এমন দিনে আলজিরীয় মেয়েরা স্বেচ্ছায় পর্দা ত্যাগ করা শুরু করলেন।

পরে যখন এ কথা রাষ্ট্র হয় যে মেয়েরা পর্দাত্যাগের সুযোগটা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগাচ্ছে তখন ফরাসিরা তাঁদের দেওয়া বিশেষ ছাড়টা প্রত্যাহার করতে শুরু করে। শুরু করে সবাইকে নির্বিচারে তল্লাশি করা। ততদিনে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়। ১৯৫৭ সনের পর পর্দা আবার ফিরে আসে। এ পর্যায়ে মেয়েরা অস্ত্র বহন শুরু করেন। গ্রেনেড, রিভলবার ও মেশিনগানের টোটকা বয়ে নেবার কাজে পর্দা বেশ আক্কেলের জিনিস প্রমাণিত হয়। যন্ত্রণা দিয়ে মানুষ মারায় ফরাসিদের ক্ষমতা দুনিয়ার সেরা। এই যন্ত্রণা থেকে আলজিরিয়ার মেয়েরাও ছাড় পান নাই।

তখন ফরাসি সরকার নতুন ক্রুসেড ঘোষণা করে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে। পর্দা ত্যাগ করার জন্য নানা প্রকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ফানোঁ লিখেছেন:

> চাকুরি হারানোর ভয় দেখিয়ে আনা বাসার চাকরানি আর পেশাদার দেহশ্রমিক নারীদের শহরের পল্টন ময়দানে দাঁড় করানো হয়; 'ফরাসি জাতির আলজিরিয়া জিন্দাবাদ'—*ভিভ্‌ লালজেরি ফ্রঁসে*—ধ্বনির সাথে সাথে *নমুনাস্বরূপ* মেয়েদের ঘোমটা খোলা হয় ঘটা করে।[৩]

এতদিন ঘোমটা ফেলে দেওয়া মেয়েরাও তখন মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে শুরু করেন।

এই উদাহরণ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত টেনেছেন ফ্রানৎস ফানোঁ। সেগুলি আমাদের বিবেচনা করে দেখার মত। প্রথমে—ফানোঁ বলেন—দখলদার প্রভুদের অনুসৃত নীতি ও কাজকর্ম অনুসারে অধীন দেশের মানুষ স্থির করে জাতির বেঁচে থাকার ইচ্ছা কোন পথে বা পদ্ধতিতে সংগঠিত হবে। ফরাসিরা যখন পর্দাপ্রথাকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে, তখন আলজিরীয় সংস্কৃতির এই মৃতপ্রায় উপাদানটি নতুন জীবন লাভ করল। জাতীয় প্রতীক হিসাবে জন্ম নিল পর্দাটি। এসলামের ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার নবতর প্রমাণ হিসাবে ফরাসিরা তখন এর ব্যাখ্যা করল। ফানোঁর (১৯৬৫: ৪১) ভাষায়:

> যা সত্য বলতে স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি, ... হিসাবে টিকে থাকার উপযোগী কয়েক গাছা অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার কোশেশ বৈ নয় তাকেই বলা হল ধর্মচিন্তার, জাদুটোনার, উন্মাদনার ফসল।[৪]

জাতির পরিচয়ের স্বাধীনতা বা জাতির বেঁচে থাকার কয়েকটি টুকরা আগলে রাখার এই চেষ্টাকে বলা হল ধর্মীয়, জাদু বিশ্বাসজাত, ধর্মান্ধ আচরণ।

ফানোঁর এই প্রথম সিদ্ধান্ত খুব তাৎপর্যময়। তিনি বলেন: পরাধীন দেশের সংস্কৃতি থেকে একটি বা দুটি অণু-পরমাণু আলাদা করে নিয়ে—বিশেষ পক্ষপাতদুষ্ট পদ্ধতিতে—সেই দেশের সমাজ সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা শুদ্ধ নিষ্ফলই নয়, ক্ষতিকরও। এয়ুরোপীয় দখলদাররা সরাসরি শাসনের যুগে এই পথই ধরেছিলেন। আজ পরোক্ষ শাসনের দিনেও এই চিন্তার কোন বড় পরিবর্তন হয় নাই।

ফানোঁ প্রস্তাবিত দুই নম্বর সিদ্ধান্ত এক নম্বরের আয়নায় দেখা ছবির মত। পরাধীন দেশের মানুষ জবরদখলকারীর দেওয়া উপহার গ্রহণ করবে কি করবে না তা ঠিক করে দখলকারীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর। দখলকারীর আনা উপহারটা যদি এমনিতে ভালোও হয়, তবুও ঐ দুষ্ট এনেছে বলেই মানুষ তা সন্দেহের চোখে দেখে। আলজিরিয়ার মেয়েরা ফরাসি সরকারের ডাক শুনে বা জেনারেল দা গলের আদরে পর্দা ছাড়বে না এ

কারণেই। উপনিবেশ মালিকরা এক সময় হামেশা বলতেন, তোমরা এখনো নিজেদের দেশ নিজেরা চালাবার উপযুক্ত হও নাই। জবাবে একজন আফ্রিকান নেতা বড় এক রাজনৈতিক মেলায় বলেছিলেন: 'আমাদের দেশ খারাপভাবে চালাবার অধিকার আমাদের আছে।'

৪

স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ ১৯৯০ সনের নববর্ষের খেতাবস্বরূপ নাইট উপাধি লাভ করেন। 'অনেকের ধারণা,' হাসান ফেরদৌস স্বীকার করে বলেন, 'তার নাইটহুড যতটা না সাহিত্যে তার সাফল্যের জন্য তারচেয়ে অনেক বেশি তার এই সফল ঢোলক বাদনের জন্য।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঢোল তিনি ভালোই বাজান।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে যে চিন্তাচেতনা স্যার বিদিয়াধরের অনুগ্রহ পেয়েছে সে চেতনা যতটা নতুন তিনি মনে করেন ততটা নতুন নয়। এই চিন্তা আদপে ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তারাই প্রচার করেছিলেন। ১৮১৮ সনে ছাপা জেমস মিলের *ভারতবর্ষের ইতিহাস* থেকেই কি ভারত ইতিহাসের হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ (খ্রিস্টান নয়) যুগ বিভাজন শুরু হয় নাই? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য এখনো দেখা যাচ্ছে অস্ত যায় নাই। হলওয়েল বা মিলের মতন প্রথম দিনের সূর্য যে প্রশ্ন করেছিল বৎসর বৎসর পর দিবসের শেষ-সূর্য স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদও করলেন সেই প্রশ্নই: কে তুমি? বলা বাহুল্য, 'পেল না উত্তর।'

১৯১৯ সনের ১৩ এপ্রিল ছিল নববর্ষের দিন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়েছে। পরবর্তী বিবরণ আমি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বই থেকে টুকে নিয়েছি:

> এই দিনে হাজার হাজার লোক অমৃতসরে জড়ো হয়ে থাকেন। বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিলেন ওখানকার জালিয়ানওয়ালাবাগে। সেখানে বক্তৃতা চলছিল। অমৃতসরে সামরিক আইন জারি হওয়ার কোনো ঘোষণা তখনও ছিল না। এই বাগের চারদিকে পাকা প্রাচীর। যাতায়াতের পথ মাত্র একটি। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা সমবেত জনমণ্ডলীর ওপরে গুলি চালাতে লাগল। ষোলো শ' রাউন্ড গুলি চালানোর পরে গুলি ফুরিয়ে যায়। জেনারেল ডায়ার বুক ফুলিয়ে বলল, গুলি না ফুরিয়ে গেলে আরো গুলি চালানো হতো। লোকেদের বেরুবার কোনো পথ ছিল না। প্রায় চার শ' লোক হত

> হলেন, আর আহত হলেন বারো শ' লোক। এটা সরকারী হিসাব। আসলে আরো অনেক বেশি লোক হতাহত হয়েছিলেন। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হলো। অত্যাচার-অপমানের স্রোত বয়ে চলল অমৃতসর, লাহোর (লাহোরেই সর্বাপেক্ষা বেশী), শেখপুরা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত ও কসুর প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে। বহুলোক প্রাণ হারালেন, বহুলোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন, আর জেলের বাইরে যাঁরা থাকলেন তাঁরা যে-ভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে লাগলেন তা ভাষায় অবর্ণনীয়। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তবু কিছু কিছু খবর বাইরে পৌঁছাল। পাঞ্জাবের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে নানা স্থানে মিছিল বার হলো, আবার এই প্রতিবাদ মিছিলগুলির ওপরেও গুলি চলল। কলকাতায়ও গুলি চলেছিল, নিহত হয়েছিলেন ছয় জন, আর আহত বারো জন। (আহ্মদ ১৯৭১: ১৫)

এর মধ্যে নতুন কেলেঙ্কারি ঘটালেন ছয় বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুজফ্ফর সাহেব লিখেছেন:

> ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পাঞ্জাবের এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাব বর্জন করলেন। ... রবীন্দ্রনাথের খেতাব বর্জনে বিশ্বে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তা এই থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বছরের পর বছর কবির খেতাব বর্জন মেনে নিলেন না। ইংরেজরা কবিকে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই লিখে চললেন। (আহ্মদ ১৯৭১: ১৫-১৬)

উদ্ধৃতি বড় হলেও আমি পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করে আর একটু উদ্ধার করি:

> পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে গবর্নর জেনারেলের এক্‌সেকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য স্যার শঙ্করণ নায়ার তাঁর বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজার দেওয়া নাইট খেতাবটি ছাড়তে পারলেন না। (আহ্মদ ১৯৭১: ১৬)

কেলেঙ্কারির শেষ সেখানেই হয় নাই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যা করলেন তা থেকে অনুমান করা কষ্টকর হবে না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'স্যার' উপাধিটি কি মিষ্টি জিনিস! এই মিঠাই খাওয়ার লোভে মুখে লালা কত লোকের ঝরে তার হিসাব রাখা সহজ কাজ নয়। স্যার বিদিয়ার লেখার কদর আমি সব সময়ই করি। তাই।

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার অনেক আগে সাব্যস্ত হয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯১৯ সনের বার্ষিক সভা অমৃতসরেই বসবে। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন:

> পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছিল তার পরেও অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া উচিত, কি উচিত নয়, এই নিয়ে কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন।... কংগ্রেসের এই অধিবেশনে চাকরি ত্যাগ করার জন্যে স্যার শঙ্করণ নায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হলো। কিন্তু নাইট খেতাব ত্যাগ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নন্দিত করে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল তা কংগ্রেসে তুলতেই দেওয়া হলো না। এটা ছিল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের আর একটি কলঙ্কজনক ঘটনা। কংগ্রেস তখনো ব্রিটিশের দেওয়া খেতাবের নেশায় বিভোর ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ নন্দিত হলেন না। (আহ্মদ ১৯৭১: ১৬–১৭)

স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলকে 'বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ' লিখে আমরা যতই আত্মীয়তা পাতাই না কেন, আমাদের শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হবে তাঁর শৈশবের স্বপ্নলব্ধ অখণ্ড ভারতের মুখোমুখি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা কি বহু জাতির মিলনমেলা বসাব, না অখণ্ড ভারতে লুপ্ত হব?

এ প্রশ্নের জবাব আমাদের একদিন দিতে হবে।

৫

১৩৫৪ বাংলা সনে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হয়। পাকিস্তান তৈরির কিছু আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বেশ আলোচনা শুরু হয়। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় জানান, ১৩৫০ সনের কার্তিক সংখ্যা *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় আবুল মনসুর আহমদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'পূর্ব-পাকিস্তানের জবান' প্রকাশিত হয়। নাসিরউদ্দীন লিখেছেন:

> এতে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তথা জাতীয় ভাষা করা না হলে কি সংকট দেখা দিতে পারে তার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ এবং অন্যান্য চিন্তানায়কের সতর্কবাণী উচ্চারণ ও রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করা সত্ত্বেও একশ্রেণীর বাঙালির উর্দুপ্রীতির বিন্দুমাত্রও ঘাটতি ঘটেনি। ১৩৫২ সালে রচিত ও মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত কবি ফররুখ আহমদের একটি ব্যঙ্গ-কবিতায় এই উর্দুপ্রীতিওয়ালাদের পরিচয় বিধৃত...। (দেখুন, মাহফুজউল্লাহ ও সৈয়দ ১৯৭৯: ভূমিকা)

কবিতাটির নাম 'উর্দু বনাম বাংলা'।

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা

বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্য (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।

পূর্ণ মোগলাই ভাব, তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী, (জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বলো হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে)
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।

পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।
(ফররুখ আহমদ ১৯৭৯)

অনেক দিন আগে এই কবিতার প্রথম তিন ও শেষ তিন পঙ্ক্তি জুড়ে দিয়ে (মাঝখানে কোন লোপ-নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহার না করে) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ সনৎকুমার সাহা এক খিচুড়ি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। (সাহা ১৯৯২) এই উদ্ধৃতির সঙ্গে সনৎবাবু দুটি মন্তব্যও যুক্ত করেন। সনৎবাবুর মতে ফররুখ আহমদ কবিতাটি লিখেছিলেন 'অবশ্য এক বিরল মুহূর্তে'। এই প্রথম মন্তব্যটি সত্য নয়। তা আমরা একটু পরেই দেখাব।

সনৎবাবুর দ্বিতীয় মন্তব্য, 'একে আমরা প্রক্ষিপ্ত ভাবনার আকস্মিক প্রকাশ বলেই মনে করি। নইলে ফররুখ আহমদের মত অসাধারণ কবির সততা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।' আমরা দেখব সনৎবাবুর এই মন্তব্য প্রমাণ করে ফররুখ আহমদের লেখার সাথে হয় তিনি পরিচিত নন, নয় সে লেখার মর্ম বোঝার ক্ষমতাই তাঁর নাই।

৬

সম্প্রতি মহাত্মা হাসান ফেরদৌস সনৎবাবুর এই মন্তব্যের চেয়েও হীন এক কাজ করেছেন। একদিকে যাঁরা শরাফতির নামে বাংলা ভাষার স্থলে উর্দু ভাষা গ্রহণ করতে চাইছিলেন ফররুখ আহমদ তাঁদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞানে যাঁরা 'অস্পৃশ্যা নারীর মত বর্ণাশ্রম শৃঙ্খলে

পীড়িত' করছিলেন তাঁদেরও বিরুদ্ধে। এই দুই ধরনের বিরোধিতার মধ্যে কোন বিরোধ আছে ধরে নিয়েই সনৎকুমার সাহা 'ফররুখ আহমদের মত অসাধারণ কবির সততা নিয়ে প্রশ্ন' তুলেছিলেন। আসলে এ দুয়ে তো কোন বিরোধ নাই। আমি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এবং সেই বাংলা চাই মৃত সংস্কৃতের বেড়াজাল মুক্ত। এতে বিরোধ কোথায়?

হাসান ফেরদৌসের সততা নিয়েই বরং আমার মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের থিসিস—মোতাবেক অনারব মুসলমানরা স্ব স্ব মাতৃভাষার চাইতে আরবিতে বেশি উৎসাহী, মাতৃভূমির চাইতে আরব দেশের প্রতি বেশি অনুগত—প্রমাণের খাতিরে হাসান সাহেব দাবি করেছেন চল্লিশ বছর আগের বাংলা কবিতায় 'কবিদের ভাষা বাহ্যত বাংলা হলেও আরবি শব্দের উপস্থিতি তাতে প্রবল ও তীব্র।' হাসান লিখেছেন: 'আর যে স্বপ্নে ভরা কবিদের চোখ, সেখানেও আঁকা আরবি দুলদুল, মরুর হাওয়া, শুষ্ক খর্জুর।' হাসান ধরে নিয়েছেন 'আরবি শব্দের উপস্থিতি' 'প্রবল ও তীব্র' হলে কবিদের ভাষা অন্তরে আর বাংলাই থাকে না, 'বাহ্যত বাংলা' হয় মাত্র।

ফররুখ আহমদকে সনৎকুমার সাহা 'আরব ভূখণ্ডে শিকড় সন্ধানী' কবি বলে ডেকেছিলেন। ফররুখের কবিতায় আরবি শব্দ ও আরব্য প্রসঙ্গ দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল এই কবির পক্ষে বাংলা ভাষার পক্ষাবলম্বন সম্ভব নয়। তাই তিনি ফররুখের 'উর্দু বনাম বাংলা' সনেটটিকে 'বিরল' মুহূর্তের রচনা আর 'প্রক্ষিপ্ত ভাবনার আকস্মিক প্রকাশ' বলে ভুল করেছিলেন। হাসান ফেরদৌসও উদ্ধৃতি সহযোগে দেখান ফররুখ আহমদ বাংলায় আরবি শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন। 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতার প্রথম দুই লাইন এই রকম:

> দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
> বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা

এই দুই লাইন উদ্ধারপূর্বক হাসান দাবি করলেন: 'বলাবাহুল্য উর্দুর সাথে এক নিকাহ বাসনার ফল যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর বাংলা ভাষার হরফ বদলে আরবি করার অপচেষ্টা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

আরবি হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টায় কতখানি শামিল হয়েছিলেন ফররুখ আহমদ? এ প্রশ্নের উত্তর হাসান দেন নাই। হাসানের আলোচনার ক্রম ও ধরন দেখে মনে হতে পারে ফররুখ আহমদের 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতাটি

স্বীকারোক্তিমূলক (confessional/apologetic)। সত্য মোটেও তা নয়। কবিতাটি প্রকৃত প্রস্তাবে বক্রোক্তিপূর্ণ। সে কথা হাসান ফেরদৌস ধরতে না পারলেও সনৎবাবু কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

সনৎবাবু ও হাসান সাহেব দুজনেই ধরে নিয়েছেন ফররুখ আহমদ আরবি শব্দ বেশি ব্যবহার করার কারণে উর্দুবিরোধী হতে পারেন না। ফররুখের স্পষ্ট উর্দুবিরোধিতা সনৎবাবুর চোখে হয় আকস্মিক, দৈব ঘটনাময় অসৎ রচনার প্রমাণ। হাসানের চোখে ওটা উর্দুবিরোধিতাই নয়। পক্ষপাত বরং।

ফররুখ আহমদ যে রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের আদি পর্বেই বাংলার পক্ষ নিয়েছিলেন তা হিসাবে নিলে সনৎবাবু স্বীকার করতেন কাজটি মোটেও আকস্মিক ছিল না। *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষ্য অনুসারে: '১৩৫৪ সালের ভাদ্র মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মাসেই তিনি (মানে ফররুখ আহমদ) সওগাতের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' নাম দিয়ে। এ প্রবন্ধটি পরবর্তী সংখ্যা আশ্বিনের *সওগাত* পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছিলেন:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তা-ই হয়, তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।

ভাষা সম্পর্কে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই ফররুখ আহমদ এ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ফররুখ আহমদের এই প্রবন্ধ এখন তাঁর রচনাবলির প্রথম খণ্ডে ছাপা হয়েছে। (দেখুন, মাহফুজউল্লাহ ও সৈয়দ ১৯৭৯) প্রবন্ধটির শেষভাগে তিনি লেখেন:

> গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারীরা তাঁর চোখে 'প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী'। ফররুখ আহমদ লিখেছেন:

> পাকিস্তানের, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাবা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা

ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাঁদের অভিমত।

এই অভিমতকে ফররুখ বলেছিলেন 'কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি'। একজন মানুষ একই সঙ্গে বাংলা ভাষার অনুরাগী এবং এসলাম প্রচারে উৎসাহী হতে পারেন এই তথ্যটি সনৎকুমার সাহা, স্যার বিদিয়াধর বা হাসান ফেরদৌস কারও কাছেই সম্ভবপর ঘটনা নয়। অথচ ফররুখ আহমদ ছিলেন তেমনই একজন মানুষ। শুদ্ধ তাই নয়, ফররুখ আহমদ গণতন্ত্রবাদীও ছিলেন। ফররুখ স্পষ্ট বুঝেছিলেন, বাংলাদেশের ভাষা উর্দু এই দাবির প্রধান প্রেরণাটা অভিজাত বা শরাফতি মানসিকতাজাত। এসলাম প্রচারের সুবিধা এর প্রধান কারণ নয়। ফররুখ আহমদই বরং বাংলার পক্ষ নিয়েছিলেন এসলাম প্রচারের পথ আরো সুগম করার খাতিরে। ফররুখ আহমদ লিখেছেন:

> যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দুশো বছর বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলাটিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আরো দুঃখের কথা এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন মানুষ আছেন (সংখ্যায় যত অল্পই হোক না কেন) যাঁরা একমাত্র মানসিক দুর্বলতার জন্যই মাতৃভাষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অস্বীকার করে ইসলামী ঐতিহ্যের মহান দায়িত্ব অপর একটি প্রাদেশিক ভাষার কিঞ্চিৎ-পরিপুষ্ট ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

কারণ: এক নম্বরে ঐ প্রাদেশিক ভাষাটি তথাকথিত শরিফদের ভাষা। দুই নম্বরে ঐ প্রাদেশিক ভাষায় কয়েকখানি এসলামি তমদ্দুনমূলক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়েছে। প্রথম কারণটি হাস্যকর। দ্বিতীয়টি অযৌক্তিক। হাসান ফেরদৌস লিপিবদ্ধ করেছেন:

> পাকিস্তানের মতো আমরাও নামের আগে সৈয়দ জুড়ে আরবের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি। আরবের সমরনায়করা আমাদেরও সমরনায়ক হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলার ইতিহাস আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত, গৌড়ের ইতিহাস আমাদের কাছে ভিন্নদেশীয়। অথচ আরব, তুর্কি ও মোগল বিজয়ী সেনাপতিদের শৌর্যে আমরা মুগ্ধ। আমরা এতটাই হীনম্মন্য যে নিজের ভাষা বাংলা হওয়ায় তা নিয়ে পর্যন্ত বিব্রত। (ফেরদৌস ২০০০)

হাসান হয়তো জেনে অখুশি হবেন যে আরবি শব্দের প্রতি পক্ষপাত আছে এমন লোক মাত্রই 'নিজের ভাষা বাংলা হওয়ায়' বিব্রত নয়। উদাহরণ খোদ ফররুখ আহমদ এবং উদাহরণ হাসান ফেরদৌস নিজেও।

ফররুখ আহমদের পিতার বংশে সৈয়দ উপাধি লেখার চল ছিল। প্রথম দিকে তিনিও হয়তো সৈয়দ ফররুখ আহমদ নামে লিখতেন। লেখক হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি—তাঁর নিজ কথায়—'ফালতু ল্যাজটা' কেটে বাদ দেন। *ফররুখ রচনাবলী* গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ—বলেন: 'মানবতাবাদী ফররুখ আহমদ "আশরাফ", "আতরাফ"-এ বিশ্বাস করতেন না, তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সব মানুষই সমান। তিনি "সৈয়দ" তাঁর নামের সাথে কখনো ব্যবহার করেছেন কিনা, জানা যায়নি।'

হাসান ফেরদৌসের পিতৃদত্ত নাম শেখ গোলাম হাসান। ইংরেজি কাগজে তেঁহর নাম ছাপা হয় এস. জি. হাসান।[৫] বাংলায় তিনি শেখ (এস) এবং গোলাম (জি) দুটাই বর্জন করেছেন। নাকি করেন নাই? হীনম্মন্যতা আর কাহাকে বলে? বিব্রত হওয়াও বা কয় প্রকারের?

নিশ্চয় আল্লাহতা'লা পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

....

প্রথম আলো, ১৪ ও ২৮ জুলাই ২০০০

§ ১৮

একবাল আহমদের ১৯৭১

... [L]ack of success does not justify the crime of silence in the face of criminal, arbitrary power.

ক্ষমতা যখন অধর্মে ও অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন প্রতিবাদে কাজ হইবে না ভাবিয়া চুপ থাকাও কিন্তু অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

—একবাল আহমদ (২০০৬/খ [১৯৭১]: ৪২০)

১

এখন যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সেখানে একদা—মানে ১৯৫৫ হইতে ১৯৭১ পর্যন্ত—ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তাহার আগে (১৯৪৭–১৯৫৫) এই দেশের নাম ছিল পূর্ব বাংলা। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনস্ত প্রদেশ না শরিক স্বাধীন দেশ এই লইয়া যাঁহাদের মনোবিবাদ এখনো ভঞ্জন হয় নাই, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ প্রশিক্ষিত সদস্য লেফটেনেন্ট জেনারেল গুল হাসান খাঁর স্মৃতিকথা পড়িলে উপকার পাইবেন। ১৯৭১ সনে পরাজয় বরণ করিবার অনেক অনেক দিন পর—১৯৯৩ সনে—প্রকাশিত স্মৃতিকথায় তিনিও কবুল করিয়াছেন, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের 'উপনিবেশ'। অন্তত ইহাই ছিল অনেক পশ্চিম পাকিস্তানির সত্য ধারণা।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তিনি কয়েক প্রস্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন। পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তারা পূর্ব বাংলাকে প্রকৃত প্রস্তাবেই মনে করিতেন তাঁহাদের উপনিবেশ। বাংলা শিখিতে হইবে বলিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া যাইতেন। গুল

হাসান উদাহরণের ছলে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে মন্ত্রীরা ডাকিলে সেক্রেটারির দেখা করিতে যাওয়ার কথা সেখানে আজিজ আহমদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য খোদ মন্ত্রীদের—বাঙালি মন্ত্রীদের—যাইতে হইত। শুদ্ধ তাহাই নহে, পূর্ব হইতে সময় ঠিক করিয়া আসিবার বন্দোবস্ত যাঁহারা করিতেন, সেই মন্ত্রীদেরও আজিজ আহমদ খাড়াইয়া রাখিতেন। এভাবে তিনি তাঁহার দেশের কর্তৃত্ব জাহির করিতেন। (খান ২০০৭: ৩৪০)

জেনারেল গুল হাসানের কথা অবিশ্বাস করিয়া ফায়দা নাই। নিজের দোষও তিনি আংশিক কবুল করিতে কসুর করেন নাই। এই নাটকের শেষ অঙ্কে পাকিস্তানের ভাগ্যে যে পরিণতি জুটিয়াছে তিনি নিজেও তাহার কুশীলব। কিন্তু তিরস্কারই পাপের একমাত্র প্রতিকার নহে। গুল হাসান যেই কথা—তাঁহার জবানবন্দি অনুযায়ী—১৯৭১ সনের ১৯ ডিসেম্বর নাগাদ বুঝিয়া উঠিলেন সে কথাই যদি আর কেহ তাহার তিন দিন আগ পর্যন্তও বলিবার সাহস করিতেন তাহার পরিণতি ভালো হইত না। (খান ২০০৭: ৩৪৫)

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাহাদের পূর্ব পাকিস্তানে যে সন্ত্রাসী অভিযান শুরু করে তাহা সারা পৃথিবীকেই ব্যথা দেয়। কিন্তু সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে ইহার প্রতিবাদ করার মতন লোক কেন খুঁজিয়াই পাওয়া যায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলেই বোঝা যাইবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অধীনস্ত প্রজার দেশ, না স্বাধীন দেশ ছিল। সারা পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর অপরাধকে বিশুদ্ধ অপরাধ বলিবার লোক একজনও পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ ছিল। শুদ্ধ 'ছিল' বলিলে হইবে না। এখনো 'আছে' বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত পাকিস্তানের ইতিহাস বিষয়ক একখণ্ড বইতে লেখা হইয়াছে পাক সেনাবাহিনীর হাতে বাঙালি মারা পড়িয়াছিল ৩০,০০০ আর বাঙালি সংগ্রামীদের হাতে অবাঙালি নিহত হইয়াছিল ১০০,০০০। ইহার সূত্র আর কিছুই নহে, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত পাকিস্তানের সরকারি শ্বেতপত্র। যেন খবরের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আগেভাগে বলা হইয়াছে: ভারতীয় সংবাদপত্র আর সংগ্রামীরা দাবি করিয়াছেন বাঙালি মৃতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। (আফজাল ২০০৭: ৪৩২–৩৩)

১৯৭১ সনের ২ সেপ্টেম্বর *নিউ ইয়র্ক রিবিয়ু অব বুকস* পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন একবাল আহমদ। একবাল লিখিয়াছিলেন, নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসারে বিহারিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামায়

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের হাতে নিহত ও আহতের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি হইবে না। পাকিস্তান সরকার এই তথ্য সঠিক নয় বলিয়া কোন প্রতিবাদও জানায় নাই। অথচ আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে (৫ আগস্ট) প্রকাশিত সরকারি শ্বেতপত্রে বলা হইয়াছে বাঙালি বিরোধীদলের হাতে নিহতের সংখ্যা এক লাখ। (আহমদ ২০০৬/খ: ৪১৯) পাকিস্তান সরকারের নির্জলা মিথ্যার প্রতিবাদ করিতে গিয়া একবাল আহমদ যে সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে কিনা সন্দেহ আছে।

১৯৭১ সনের ১ হইতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক নম্বরে বাঙালি হত্যা, দুই নম্বরে অবাঙালি (প্রধানত বিহারি) হত্যা। পাকিস্তানি ইতিহাসবিদ রফিক আফজাল বলিতেছেন, বাঙালি হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছিল দুই দফায়। প্রথম দফা ২ হইতে ৪ মার্চের মধ্যে। তখন বাঙালি আন্দোলনকারীরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করিতেছিলেন। দ্বিতীয় দফা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল তখন যখন বাঙালিরা সামরিক বাহিনীর লোকজনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় কিংবা জাহাজ হইতে পাক সেনা নামিতে বাধা দেয়। আওয়ামী লীগ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার দাবি করিয়াছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, যদি বড় সংখ্যায়—মানে হাজার হাজার—অবাঙালি নিহত হইয়া থাকে তবে সেই খবর তখন কেহ জানিল না কেন? পাকিস্তানি ইতিহাসবিদের যুক্তি চমৎকার। তাই আমি তাঁহার কথা হুবহু তর্জমা করিতেছি:

> বাঙালি সংগ্রামীরা সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া নির্বিচারে অবাঙালিদের হত্যা করে। তাহাদের পক্ষ লইয়া কথা বলিবার মতন কেহ ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার ছিল উল্টাই—পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিদের উপর পাছে কেহ প্রতিশোধ লয় এই ভয়ে পাকিস্তান সরকার এই সমস্ত হত্যার খবর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রকাশ করিতে বারণ করে খুব কড়াকড়ি কায়দায়। এই মর্মে বারংবার সাবধান করিয়া তাঁহারা আদেশনামাও পাঠায়। (আফজাল ২০০৭: ৪১৮)

অথচ এই রফিক আফজালই বলিতেছেন ২৫ মার্চের পর আওয়ামী লীগের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার স্বার্থে পাকিস্তান সরকার এই সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার নজির তুলিয়া ধরে। তাঁহারা মে মাসে একটি আট পাতার সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং একপ্রস্ত তথ্যচিত্র প্রচার করে। আগস্ট মাসের শ্বেতপত্রের কথা তো আমরা আগেই আমল করিয়াছি। এই সমস্ত অসঙ্গতির গোড়ায় পৌঁছিবার শক্তি এমনকি একবাল আহমদেরও হয় নাই। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়স্বজনও নিহত তালিকায় উপস্থিত।

অনেক দিন পর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় পাক সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের আরেক কর্মকর্তা—সেই সময় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগের প্রধান—ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহমান সিদ্দিকি দেখাইয়াছেন পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র কি পরিমাণ অসঙ্গতিতে ভরপুর ছিল। তাঁহার দেওয়া উদাহরণের মধ্যে দেখা যাইতেছে, শ্বেতপত্রের এক জায়গায় বলা হইয়াছে বাঙালিদের হাতে অবাঙালি হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে ২৫ ও ২৬ মার্চ রাতের আগে। ইহার উল্লেখ পাইতেছি তৃতীয় অধ্যায়ে, মোতাবেক ২৯ পৃষ্ঠায়। অথচ আরেক জায়গায়—পরিশিষ্ট 'জি', মোতাবেক ৬৪ পৃষ্ঠায়—লেখা হইয়াছে বাঙালির হাতে অবাঙালি হত্যার প্রথম ঘটনা ঘটে চট্টগ্রামে ২৬ মার্চ হইতে ৩ এপ্রিলের মধ্যে। পরিশিষ্ট 'জি' অনুসারে এই হত্যাকাণ্ড ১৭ এপ্রিল হইতে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত চলিতে থাকে। তাহার পর—৫ আগস্ট তারিখে শ্বেতপত্র প্রকাশ পর্যন্ত—আর কোন হত্যাকাণ্ড ঘটিল কিনা তাহার আর উল্লেখ নাই। আরো মজার ব্যাপার, এই সকল হত্যার খবর জোগাড় করা হইয়াছে শুদ্ধ বিদেশে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে। (সিদ্দিকি ২০০৬: ১৬০)

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি শুনিয়াছেন শ্বেতপত্রটির লেখক ইয়াহিয়া সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী অধ্যাপক গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী। তিনি বাঙালি জাতির লোক এবং লন্ডনে বসিয়াই এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। মার্কিন দেশের পাকিস্তান বিশেষজ্ঞ লরেন্স জায়ারিং জানাইতেছেন এই গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরীই তাঁহার বইতে উল্লেখ করেন বাংলাদেশে নির্বিচার গণহত্যা বন্ধ করিবার অনুরোধ জানাইয়া জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে তিনি লন্ডন হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে কাজ হয় নাই। (জায়ারিং ১৯৯৭: ৩৬১)

এতগুলি কথা বলিলাম শুদ্ধ একটি কথা বলিবার জন্য: একবাল আহমদের মতন তথ্যনিষ্ঠ গবেষককে পর্যন্ত সেদিনের প্রচারণা কিছু পরিমাণে কাবু করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমি বলিতেছি না যে বাংলাদেশে সেই সময় কোন অবাঙালি হত্যা বা জখমের ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু তাহা কি করিয়া দশ হাজার সংখ্যায় পৌঁছাইল? আর হইলই বা কখন কেহ জানিলই না! খোদ পশ্চিম পাকিস্তানে যদি বিহারি হত্যার খবর এই হারে গোপন রাখা সম্ভব হয় তবে বাঙালি হত্যার খবর ঐ দেশে গোপন রাখা তো কোন ঘটনাই নহে।

একবাল আহমদ সরাসরি পাক সামরিক বাহিনীকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিয়াছেন। তাহাদের সহিত ভুট্টো সাহেবের দায়ও অস্বীকার করা যায় না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবের অনেক পরে বিদেশি লেখকরাও

এতদিনে তাঁহার সহিত একমত। যেমন ব্রিটিশ জাতির পাকিস্তান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইয়ান টালবোটও লিখিয়াছেন:

> পাকিস্তান রাষ্ট্র টুকরা টুকরা হইয়াছে বাঙালি সঙ্কীর্ণতা কিংবা ভারতের নাড়া কলকাঠির কারণে নহে, ইহার দায়-দায়িত্ব মূলবিচারে এসলামাবাদকেই ঘাড়ে লইতে হইবে। বাঙালিদের দাবি পূরণ করিয়া তাঁহাদের অংশীদার করিয়া লইতে পাকিস্তান সফল হয় নাই বোকামির কারণে। আর জাতীয় সঙ্কীর্ণতার পঙ্কে পড়িয়া এই বোকামি বহুগুণে বাড়িয়া যায়। (টালবোট ২০০০: ২৫৮–৫৯)

২

একবাল আহমদ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়াছেন: পাকিস্তান সরকারের এই প্রচারণার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ২৮ জুনের বক্তৃতায় ইয়াহিয়া খান জানাইয়াই দিয়াছিলেন যে পাকিস্তানের সংবিধান লিখিবার যোগ্যতা জাতীয় গণপরিষদের আর নাই। গোপন সেনা আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ১২ আগস্ট তারিখে শুরু হইতেছে বলিয়া ঘোষণাও প্রচার করা হইল। অপরাধীদের তালিকায় পাকিস্তানের নির্বাচিত অনাহূত জাতীয় সংসদের ৭৯ সদস্যের নামও তোলা হইল। একবাল আহমদ এই পর্যন্ত জানিতেন বলিয়া তাঁহার ২ সেপ্টেম্বর তারিখের লেখায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইহাই আসল মতলব। তাই তাহারা বিহারি হত্যার গল্প প্রচার করিতেছেন।

একবাল বলিলেন, বিহারি হত্যার ঘটনা সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু পাক সেনাবাহিনী সেই হত্যা বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে নাই। কারণ কথিত হত্যাকাণ্ডের সময় তো জেনারেলরা পরিষদের বাহিরে রাজনীতিবিদদের সহিত দরকষাকষি করিয়াই সময় কাটাইতেছিলেন। হত্যা ও দরাদরি তো তাহা হইলে সেই একই সময়ে ঘটিল।

একবাল আহমদ লিখিলেন, বাঙালি আন্দোলনকারীদের হাতে বিহারি নিহত হইলেও তাহা কোনক্রমেই পাকিস্তানি বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। তাহা বিশুদ্ধ অপরাধ। তদুপরি অপরাধ দিয়া তো অপরাধ ঢাকা যায় না। অপরাধবৃত্তি ব্যবসায় করিবার বিষয় হইতে পারে না। আর একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম এই জগতে নাই।

একবাল জানিতেন, পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করিবার কোন প্রকারের অধিকার—কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি নৈতিক—পাক সেনাবাহিনীর

নাই। পাকিস্তানের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচনে যেই দল নিরঙ্কুশ জয় পাইল সেই দল দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবে না—এই রায় দিবার অধিকার সেনাবাহিনীকে কেহ তো দেয় নাই। আওয়ামী লীগ যদি দেশকে খণ্ড খণ্ড করিতেও চায়, সেই অধিকার তাহার আছে।

পাক সেনাবাহিনীর সমস্ত যুক্তি নস্যাৎ করিবার পর একবাল আহমদ আরো লিখিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশভাগ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা শুদ্ধ দাবি করিয়াছিলেন, যে দাবি পূরণের ওয়াদা দিয়া তাঁহারা জনগণের সমর্থন আদায় করিলেন, তাহা পূরণ করিবার সুযোগ তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। ইহারই নাম ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। প্রদেশের শাসনভার প্রদেশবাসীর হাতে থাকিবে আর তাহা প্রদেশবাসীর স্বার্থেই চালিত হইবে।

একবাল আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'সেনাবাহিনী যেদিন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকিতে অস্বীকৃতি জানাইল আর ১৯৭১ সালের মার্চের ২৫ তারিখে পশুর মতন আক্রমণ শুরু করিল তখনই মাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘোষণা করে।' (আহমদ ২০০৬/খ: ৪১৮)

এই অবস্থায় সকল পশ্চিম পাকিস্তানির কর্তব্য—একবাল আহমদের মতে—একটাই। তাহা ছাড়া অন্য কিছুই কাজ করিবে না। তাঁহাদের দাবি করা চাই—ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আর কোন প্রকার শর্ত আরোপ না করিয়াই সামরিক বাহিনীর শাসন তুলিয়া লইতে হইবে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকিতে হইবে। আর শপথ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে, ঐ পরিষদে সংখ্যায় যাঁহারা ভারি তাঁহারা যে সিদ্ধান্তই লইবেন না কেন তাহা সকলেই মানিবেন। সেই সিদ্ধান্ত যদি এহেন সিদ্ধান্তও হয় যে পাকিস্তান আর দেশ হিসাবে এক থাকিবে না—পূর্বে আর পশ্চিমে ভাগ হইয়া যাইবে—তবুও। তিনি জোর দিয়া বলিলেন, যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের পূর্বভাগকে তাঁহাদের স্বশাসনের কিংবা দরকার হইলে স্বাধীন হইবার অধিকার না দেওয়া হইবে ততদিন পাকিস্তানে জনগণের সরকার সত্যি সত্যি পুনরায় কায়েম হইবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানি 'বন্ধু'র উদ্দেশে লেখা এই নিবন্ধে একবাল আহমদ যুক্তি দেখাইয়াছেন কেন এই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন পথই আর খোলা নাই। তিনি তাঁহার যুক্তি সাত দফায় সাজাইয়া দেখাইলেন কেন সেসব যুক্তির বিকল্প বলিতে নাই। এক নম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে অন্যায় ও অবিচার করা হইয়াছে তাহা পাকিস্তানের সবচেয়ে জঘন্য স্বার্থপর ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে

পারিতেছেন না। বিশেষ শেষ বার বছর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ থাকিবার সময় এই অন্যায় বহুগুণ বাড়িয়াছে।

ক্ষমতার ছোট তরফ যেটুকু হিস্‌সা পায় বাঙালিরা তাহাও পায় নাই। দ্বিতীয়ত, এই কারণেই স্বশাসনের দাবি জনগণের সমর্থন পাইয়াছে। হইতে পারে গরিবের উপর সাধারণভাবে ধনীর যে চিরাচরিত শোষণ তাহার ফলেই সব ঘটিয়াছে কিন্তু মানুষ যাহা বুঝিয়াছে—অর্থাৎ এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের শোষণ বজায় আছে—তাহাও ভুল বুঝ নহে। তিন নম্বর, জাতীয় পরিষদের বাহিরে দরকষাকষির চেষ্টা বিফলে যাইবার পর সেনাবাহিনী নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করিবার মানসে ২৫ মার্চের আক্রমণ শুরু করিয়াছে। চার নম্বর কথা, চার মাস সন্ত্রাস চালাইয়াও সেনাবাহিনীর দখলদারির পক্ষে বিন্দুমাত্র জনসমর্থন আদায় করা যায় নাই। পাঁচ নম্বর, এই যুদ্ধের ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর থাকিলেও ইহার—এই পরদেশ দখলে রাখিয়া সোহবত করার—খরচা অনেক বেশি। তাহা বহনের ক্ষমতাও পাকিস্তানের নাই।

ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক পত্রিকা বন্ধ করা হইয়াছে। অনেক রাজনৈতিক নেতা যেমন আফজাল বাঙ্গাস, মুখতার রানা ও জি. এম. সৈয়দ বন্দি হইয়াছেন। আবদুল্লাহ মালিক ও শেখ আয়াজ প্রমুখ বুদ্ধিজীবী এবং জি. এম. শাহ্‌র মতন শিক্ষাবিদ বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন। লায়ালপুর, শিয়ালকোট প্রভৃতি জায়গায় অনেককে প্রকাশ্যে বেত মারা হইয়াছে। এসব বিলক্ষণ পূর্ণ স্বৈরাচারের লক্ষণ।

এই যুক্তিধারা আমাদের অপরিচিত নহে। তবে কম আলোচিত—এই কথাও সত্য। একবাল আহমদ আমাদের দেশে কম আলোচিত আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তখন পাকিস্তানে নানান বিবৃতি ও সম্পাদকীয়যোগে প্রচার করা হইতেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে ভারতীয় ও মার্কিন এয়াহুদি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। একবাল আহমদ তাহা কলমের এক খোঁচায় নাকচ করিয়া বলিলেন, 'মনে রাখিতে হইবে, এখনো মার্কিন সরকারের অস্ত্র ও টাকা পাকিস্তানের হত্যাকারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের পিছনে যাইতেছে। পাক সেনাবাহিনী হিন্দুদের যে আলাদা করিয়া হত্যা ও নির্যাতন করিতেছে তাহার প্রভাব ভারতের আট কোটি মুসলমানের উপর কিভাবে পড়িবে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। ধর্মীয় জোশ ছড়াইয়া পাক সেনাবাহিনী সেই বিপদের পথই প্রশস্ত করিতেছেন বলিয়া তিনি মনে করেন।

সবশেষে একবাল আহমদ বিশ্বব্যাংক সহ অনেক বিদেশি সূত্রের বরাত দিয়া সেনা কবলিত বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দিলেন। তিনি বলিলেন, শুদ্ধ রিলিফ দিয়া এই মন্বন্তর বন্ধ করা যাইবে না। জনগণের শাসন পুনরায় চালু না হইলে খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধপত্রের চালান মানুষের হাতে পৌঁছাইবে না। বিদেশি সাহায্য সংস্থাদিও কোন কাজে আসিবে না।

একবাল আহমদ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, ১৯৭১ সনের আগস্ট নাগাদ বাংলাদেশের ৬০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে শরণ লইতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন ৬০,০০০ হইতে ১০০,০০০ পর্যন্ত মানুষ আসিয়া শিবিরে শিবিরে যোগ দিয়াছে। আর ততদিনে আনুমানিক ২৫০,০০০ নিরস্ত্র মানুষ পাক বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারায়। একবালের এই উল্লেখের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে মার্কিন বিশেষজ্ঞ সিডনি শেনবার্গের অনুমানের। ঢাকায় অবস্থিত পশ্চিমা কূটনীতিকমহলের বরাতে তিনি ১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসে অনুমান করিয়াছিলেন, সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বাঙালি মৃতের সংখ্যা ২০০,০০০ পর্যন্ত দাঁড়ায়। সোবিয়েত বিশেষজ্ঞ ও কূটনীতিক লিয়োনিদ কুতাকবও এই অনুমান অনেক পরে—১৯৮৩ নাগাদ—সমর্থন করিয়াছেন। (আহমদ ২০০৬/খ: ৪১৭; শেনবার্গ ১৯৭১: ১২৯; কুতাকব ১৯৮৬: ১৫৬)

সম্প্রতি *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল* নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধযোগে জানা যায়, তিন জন পশ্চিমা গবেষক অনুমান করিতেছেন ১৯৭১ সনের 'যুদ্ধ-সংঘাতে' বাংলাদেশে নিহত মানুষের সংখ্যা মোট ২৬৯,০০০ জন। যে জরিপের ভিত্তিতে এই অনুমান তাহার নমুনা-পরিসর বেশ বড়ই, মোটামুটি ৩৬,০০০ পরিবার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০২-২০০৩ সনে ৭০টি দেশে পরিচালিত জরিপে পাওয়া তথ্যই এই অনুমানের ভিত্তি। তাঁহাদের অনুমানের গণ্ডি ১২৫,০০০ হইতে ৫০৫,০০০ এই দুই সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ। অবশ্য গবেষকরা বলিয়াছেন এই অনুমান প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় কমই হইবে। তবে তাঁহারা ইহাও উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই যে অন্য একটি তথ্যসূত্র অনুসারে (সুইডেনের উপসলা বিশ্ববিদ্যালয় ও নরওয়ের অসলোভিত্তিক 'শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' পরিচালিত পরোক্ষ জরিপ) নিহতের সংখ্যা হইবে মাত্র ৫৮,০০০। এই দুই অনুমানের প্রভেদ যে বিস্তর (একটির তুলনায় অন্যটি ৪.৬ গুণ) তাহা স্বয়ং গবেষকরাই উল্লেখ করিয়াছেন। (ওবেরমেয়ার গয়রহ ২০০৮: ২-৫)

এসব সংখ্যার আলোকে দেখিলে একবাল আহমদের অনুমান সত্যি সত্যিই বিস্ময়কর মনে হয়।

১৯৭০ সনের ঝড়-বন্যা আর ১৯৭১ সনের সমর মিলিয়া বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশ লাখ টন খাদ্যশস্য (চাউল) নষ্ট করে। একবাল দেখাইলেন, এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। বিশ্বব্যাঙ্কের জরিপ, সেনেটর এডোয়ার্ড কেনেডির ফাঁস করা মার্কিন সরকারি তথ্য, সাহায্য সংস্থা অক্সফামের ইয়ান ম্যাকডোনাল্ড, *ফিনান্সিয়াল টাইমস* পত্রিকার রিপোর্ট এবং বিবিসির এলান হান্টের বরাত দিয়া একবাল বলিলেন, সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাস হইতে শুরু করিয়া বাংলাদেশে কমপক্ষে দুই কোটি দশ লাখ মানুষ না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। তিনি দাবি করেন, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অধীনে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছানো সম্ভব হইবে না।

৩

একবাল আহমদ যখন এই নিবন্ধটি প্রচার করিতেছেন তখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঙ্গারকে অপহরণের ষড়যন্ত্রসহ কয়েক দফা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁহার বিচার চলিতেছে। মানসিকভাবেও তিনি পর্যুদস্ত। তাঁহার ছোট ভাই সগির আহমদ—১০ এপ্রিল তারিখের গণহত্যাবিরোধী বিবৃতিতে যিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন জুলাই মাসে। তারপরও একবাল আহমদ আপনকার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার পথ ধরিয়া তিনি তখন মার্কিন সরকারের কোপানলে পড়িয়াছেন। সেই সময় নিজ দেশের সরকারের সহিত বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে জলে নামিয়া কুমিরের সহিত বিবাদ করা। একবাল আহমদ তাহাকেই কর্তব্য স্থির করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:

> আমেরিকায় যাঁহার বিচার চলিতেছে—যে বিচারে গুরুদণ্ডের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না—সেই মানুষের পক্ষে নিজ দেশের সরকারের সঙ্গে বিবাদ ডাকিয়া আনা মোটেও সহজ কাজ নহে। তারপরও আমি তাহা ডাকিয়া আনিতেছি একটি কারণে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিরুদ্ধে আমার দেশের সরকার যে অপরাধ করিতেছে তাহা যদি আমি মানিয়া লই তবে আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন অপরাধ কিংবা কাশ্মিরে ভারতীয় দখলদারির বিরোধিতা করিতে পারি না। (আহমদ ২০০৬/খ: ৪১৯)

সবশেষে একবাল আহমদ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন, হয়তো ততদিনে—মানে সেপ্টেম্বর নাগাদ—দেরি যাহা হইবার হইয়াই গিয়াছে। হতাশার সুরে তিনি লেখা শেষ করিলেন। তাঁহার দেশের সরকার তো জনগণের কাছে জবাব দিতে বাধ্য নহে, দুনিয়ার আর দশ জাতি কী বলে তাহাও তাহারা শুনিবে না। ফলে জাতির যা কিছু সহায়সম্বল সব শেষ করিয়া দেশটাকে নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সব ধরনের মাপে একেবারে দেউলিয়া করিয়া ছাড়িবে এই সরকার। 'তাহার আগে হয়তো আমাদের প্রতিবাদে কোন ফলই ফলিবে না'—বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিলেন তিনি। কিন্তু তাহারও পর আছে। তিনি নিবন্ধ শেষ করিলেন এই বলিয়া: 'ক্ষমতা যখন অধর্মে ও অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন প্রতিবাদে কাজ হইবে না ভাবিয়া চুপ থাকাও কিন্তু অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

হয়তো এই নৈতিক সততার বিরল উদাহরণ বলিয়াই একবাল আহমদ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ আমাদের অনেকের তুলনায় অনেক বেশি সততার সহিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ প্রকাশিত এই লেখাতেই তিনি উল্লেখ করিতেছেন, ততক্ষণে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ লাগিবে এই সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। তুলনীয়: সেই সময় পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিরাও ভাবিতেছেন ভারত যুদ্ধ লাগাইবার সাহস করিবে না।

একবাল আহমদ দেখিতে পাইয়াছিলেন, চিন ভারতকে শাসাইতেছে না। তাঁহারা পাকিস্তানকে শুদ্ধ জানাইয়া দিয়াছিলেন, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে—ইহা আমরা চাহি না। একবাল আহমদ একবাক্যে বলিলেন, 'চিনের আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক।' আর ঐদিকে ভারত সোবিয়েত ইয়ুনিয়নের সহিত চুক্তি একটা তো করিয়াই ফেলিয়াছে। ১৯৬৬ সালের তাসখন্দ চুক্তিতে সোবিয়েতরা কথা দিয়েছিলেন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবেন। তাহার উপর পাকিস্তানকে আলাদা সাহায্যও দিবেন। আর ১৯৭১ সালের চুক্তিতে তাঁহারা ভারতের পক্ষেই দাঁড়াইলেন।

পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান সাহেব চিনের সহিত মার্কিন সরকারের সম্পর্ক পাতাইতে দূতিয়ালি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারাও পুরস্কারস্বরূপ মার্কিন তাবিজ আশা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব (ও তাঁহার আওয়ামী লীগ দল) বহুদিন ধরিয়া মার্কিনপন্থী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিপদে মার্কিন নেতাদের বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন—মার্কিন সমরনীতিতে পাকিস্তান যে জায়গা দখল করিয়াছিল তাহার সম্মুখে বাংলাদেশ সংগ্রামের নেতারা পরাজয়

বরণ করিলেন। এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে একবাল আহমদ মোটেও শরমিন্দা হন নাই।

একবাল আহমদের সম্মানে আমি মাত্র আর একটা কথার উল্লেখ করিব। ১৯৭১ সালে অনেক বিশ্লেষকই মনে করিয়াছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্রুত আসিতেছে না—মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। ইহা শুদ্ধ কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠীর দূর কল্পনামাত্র ছিল না। খ্যাতনামা মার্কিন বিশারদ সিডনি শেনবার্গ ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলার সময়—একবাল আহমদের লেখার এক মাস পরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে—সেই রকম কল্পনারই আভাস দিয়াছিলেন। শেনবার্গ লিখিলেন:

> বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন মতবাদভিত্তিক আন্দোলন নহে, এই আন্দোলন জাতীয়তাভিত্তিক। যদি যুদ্ধ চলিতেই থাকে তবে ইহার স্বভাব বদলাইয়া যাইতে পারে। নেতৃত্ব মাওয়ের অনুসারীদের কিংবা আরো উগ্র কাহারো হাতে চলিয়া যাইতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে কিছু কিছু চিনপন্থী মুক্তিযোদ্ধা ইহার মধ্যেই মাঠে নমিয়াছে। বিদেশি শক্তির দৃষ্টিতে ইহার ভাগফল গুরুতর বটে। যাঁহারা এশিয়া গবেষক তাঁহাদের কাহারো কাহারো চোখে আগাম বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের বেষ্টনী গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা ধরা পড়িতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন ইহার বিস্তার ভারতের অশান্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হইতে বাড়িয়া সারিয়া পূর্ব পাকিস্তান ফুঁড়িয়া বর্মা পর্যন্ত ছড়াইবে। ইহার তুলনায় ভিয়েতনাম যুদ্ধকে অনেক ছোট সংঘাত বলিয়া মনে হইতে পারে। (শেনবার্গ ১৯৭১: ১৩০)

এই কল্পনায় একবাল আহমদ পুরাদস্তুর শরিক হন নাই। চিনের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হইয়াছে। পাকিস্তান বিশেষজ্ঞ লরেন্স জায়ারিং একবালের কথাই নিজমুখে তুলিয়া লইয়াছেন এতদিনে: 'পাকিস্তানের পিছনে চিনের সমর্থন লোক-দেখানো কথা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।' (জায়ারিং ১৯৯৭: ৩৬৫) সত্য হইয়াছে পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় এক প্রকার পূর্বনির্ধারিতই ছিল বলা চলে।

৪

একবাল আহমদের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বিস্ময়কর। কিন্তু এই বিস্ময় যুক্তিনির্ভর বিস্ময় বৈ নহে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালের মধ্যেই পরাজিত হইয়াছে বলিয়া রায় দিয়াছিলেন এই তরুণ মনীষী। তখন

তাঁহার কত বয়স? ১৯৩৩ সনে জন্ম ধরিয়া লইলে মাত্র ৩২। আর ১৯৭১ সনের জানুয়ারি মাসে যখন মার্কিন কংগ্রেসে তাঁহার বিচার শুরু হয় তখন আরো ছয় বৎসর যোগ করিতে হইবে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে একবাল যে স্বচ্ছতার সহিত বিচার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা এখনো আমাদের মনে প্রথম আলোর—অর্থাৎ সুবহে সাদেকের—মত সত্য।

একবাল আহমদ নিজেই বলিয়াছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার সমর্থন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আবেগ ছিল না। তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে বিহারি, আর বাড়িয়াও উঠিয়াছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সময়। বাংলাদেশ সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবকে তিনি খুব উঁচুদরের নেতা কি মনীষীও মনে করিতেন না। মনে করিতেন: তিনি আবেগতাড়িত এবং কল্পনাশক্তিতে ক্ষীণ পুরুষ। তদুপরি রাজনীতিতে মার্কিনপথের পথিক।

সবচেয়ে বড় কথা একবাল আহমদ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার অনুরাগী মোটেই ছিলেন না। দেশ আলাদা হইলেই সামাজিক অন্যায়ের শেষ হয়, ইহাও তিনি ভাবিতেন না। তাই তিনি বিস্ময়কর।

....

বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

সংবর্ধনা

§ সংবর্ধনা

১

Abel et Caïn

Charles Baudelaire

I

Race d'Abel, dors, bois et mange;
Dieu te sourit complaisamment.

Race de Caïn, dans la fange
Rampe et meurs misérablement.

Race d'Abel, ton sacrifice
Flatte le nez du Séraphin!

Race de Caïn, ton supplice
Aura-t-il jamais une fin?

Race d'Abel, vois tes semailles
Et ton bétail venir à bien;

Race de Caïn, tes entrailles
Hurlent la faim comme un vieux chien.

Race d'Abel, chauffe ton ventre
À ton foyer patriarcal;

Race de Caïn, dans ton antre
Tremble de froid, pauvre chacal!

Race d'Abel, aime et pullule!
Ton or fait aussi des petits.

Race de Caïn, cœur qui brûle,
Prends garde à ces grands appétits.

Race d'Abel, tu croîs et broutes
Comme les punaises des bois!

Race de Caïn, sur les routes
Traîne ta famille aux abois.

II

Ah! race d'Abel, ta charogne
Engraissera le sol fumant!

Race de Caïn, ta besogne
N'est pas faite suffisamment;

Race d'Abel, voici ta honte:
Le fer est vaincu par l'épieu!

Race de Caïn, au ciel monte,
Et sur la terre jette Dieu!

....

Les Fleurs du mal, 1857

§ সংবর্ধনা

২

হাবিল ও কাবিল

শার্ল বোদলেয়ার

১

হাবিলের জাত, ঘুমাও, পিয়ে যাও আর খাও
দিলখোশ মাবুদের মুখে মিঠা হাসি

কাবিলের জাত, দাও গড়াগড়ি দাও
পচা কাদায়, আর দাও নিজের গলায় ফাঁসি।

হাবিলের জাত, তোর লোবান আতরদান
নজরান সুড়সুড়ি দেয় ফেরেশতার নাকে!

কাবিলের জাত, তোর যাতনার অবসান
কখনো হবে না হাজার কাতর ডাকে?

হাবিলের জাত, তোর মাঠের ধান বাড়ে
মোটা তাজা হয় তোর গরু যত

কাবিলের জাত, তোর পেটের ভোক ঘাড়ে
খালি কঁকায় নেড়ি কুত্তার মত।

হাবিলের জাত, চোদ্দপুরুষের চুলা জ্বেলে
পোহা রে আগুন, গতর তাতা

কাবিলের জাত, মাটির তলায় গর্ত মেলে
কাঁপ তোরা, গায় দে খেকশিয়ালের কাঁথা!

হাবিলের জাত, প্রেমে মশগুল হ, বাড়া!
ঝাড়বংশ, বাড়া রে সোনাদানা।

কাবিলের জাত, হে প্রাণ পোড়া
প্রেম করতে তোর মানা।

হাবিলের জাত গাল ফোলা পেট খোলা
খেয়ে খেয়ে যেমন ফোলে ঘূণপোকা!

কাবিলের জাত, পথে পথে বস পথভোলা
সংসার তোর পথে বসা হে বোকা।

২

আহা, হাবিলের জাত, একদা তোর লাশ
করবে সবুজ পোড়া ছারখার জমিন!

কাবিলের জাত কাজ তোর নাগপাশ
আজও হয় নাই ছেঁড়া, জীবন কি সঙ্গিন

হাবিলের জাত, তোর লাজ ঢাকবে কে আজ
লোহা খান খান হবে যে চেলাকাঠে!

কাবিলের জাত, উঠ আসমানে আসমানবাজ
যা মাবুদরে ঠেলে ফেল এই দুনিয়ার মাঠে!

....

সলিমুল্লাহ খান, জাতীয় কবিতা উৎসব
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

§ সংবর্ধনা

৩

স্যামসন

শামসুর রাহমান

ক্ষমতামাতাল জঙ্গী হে প্রভুরা ভেবেছো তোমরা,
তোমাদের হোমরা-চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?
মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি? কত শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেওতো আছে জানা। রক্তারক্তি
যতই কর না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্র-মিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।

আমাকে করেছো বন্দী, নিয়েছো উপড়ে চক্ষুদ্বয়।
এখন তো মেঘের অঢেল স্বাস্থ্য, রাঙা সূর্যোদয়
শিশুর অস্থির হামাগুড়ি, রক্তোৎপল যৌবন নারীর আর
হাওয়ায় স্পন্দিত ফুল পারি না দেখতে। বার বার
কী বিশাল দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি খুঁজে মরি। সকাল সন্ধ্যার
ভেদ লুপ্ত; মসীলিপ্ত ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে চকিতে মন্দার
জেগে উঠলেও অলৌকিক শোভা তার থেকে যাবে নিস্তরঙ্গ
অন্তরালে। এমন-কি ইঁদুরও বান্ধব অন্তরঙ্গ
সাম্প্রতিক, এমন নিঃসঙ্গ আমি নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি; দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের। পদে পদে
কেবলি হোঁচট খাই দিন-রাত্রি, তোমরা অটল মসনদে।

শক্র-পরিবৃত হয়ে আছি, তোমাদের চাটুকার
উচ্ছিষ্ট-কুড়ানো সব আপনি-মোড়ল, দুস্থ ভাঁড়
সর্বদাই উপহাস করছে আমাকে। দেশবাসী
আমাকে বাসেতো ভালো আজো—যাদের অশেষ দুঃখে কাঁদি হাসি
আনন্দে? পিছনে ফেলে এসেছি কত যে রাঙা সুখের কোরক,
যেমন বালক তার মিষ্টান্নের সুদৃশ্য মোড়ক।
আমাকে করেছো অন্ধ, যেন আর নানা দুষ্কৃতি
তোমাদের কিছুতেই না পড়ে আমার চোখে। স্মৃতি
তাও কি পারবে মুছে দিতে? যা দেখেছি এতদিন—
পাইকারি হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্ষান্তিহীন
রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত
দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ, তাড়িত, ক্লান্ত; ভীত
—এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এ-সব ভীষণ
দৃশ্যাবলি আমূল উপড়ে নিতে আমার দু-চোখের মতন?
দৃষ্টি নেই, কিন্তু আজো রক্তের সুতীব্র ঘ্রাণ পাই,
কানে আসে আর্তনাদ ঘন-ঘন, যতই সাফাই
তোমরা গাও না কেন, সব-কিছু বুঝি ঠিকই। ভেবেছো এখন
দারুণ অক্ষম আমি, উদ্যানের ঘাসের মতন
বিষম কদম-ছাঁটা চুল। হীনবল, শৃঙ্খলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছো দলিত।

আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ
ফেলবো উপড়ে, দেখো কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করবো লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।

....
দুঃসময়ে মুখোমুখি, ১৯৭৩

§ সংবর্ধনা

৪

নাইপলের পাকিস্তান

হাসান ফেরদৌস

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে দুটুকরো হয়েছিল। তা নাহলে ভি এস নাইপল আমাদেরকে পাকিস্তানের মতো 'ক্রিমিনাল' বলে গাল দিতেন। আমাদেরকেও ফানডোস—অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে পরিহাস করতেন।

পাকিস্তান নিয়ে এই পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে ভি এস নাইপলের সর্বশেষ ভ্রমণ রিপোর্টাজ *বিয়োন্ড বিলিফ* গ্রন্থে (*বিয়োন্ড বিলিফ*, ভি এস নাইপল, র‍্যানডম হাউস, নিউইয়র্ক, ১৯৯৮)।

এর আগে, ১৯৭৯ সালে নাইপল পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া—এই চারটি ইসলামিক দেশে ভ্রমণ শেষে লিখেছিলেন তার প্রবল বিতর্কিত *অ্যামং দি বিলিভার্স* (প্রকাশকাল ১৯৮১)। প্রায় বিশ বছর পর সে চারটি দেশে ফিরতি ভ্রমণে আসেন নাইপল। প্রথম গ্রন্থে মৌলবাদের উত্থান নিয়ে প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় ভ্রমণে এসে সে উদ্বেগ প্রশমিত হয়নি মোটেই, বরং এবার তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রচ্ছন্ন পরিহাস।

নাইপলের এই বই নিয়ে এরই মধ্যে বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ উঠেছে। পূর্বেই বলুন আর পশ্চিমে, প্রায় সর্বত্রই নাইপলের 'অজ্ঞতার' কড়া সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন খ্যাতিমান প্রাচ্যবিশারদ অ্যাডওয়ার্ড সায়ীদ। তার কথায়, চারশ পাতার এই ঢাউশ বইটিতে নাইপল তার 'নির্বোধ ও অপমানজনক' তত্ত্ব প্রচার ছাড়া আর কিছুই করেননি। সায়ীদ নাইপলকে এক কথায় 'ইডিওটিক' বলে খারিজ করে দিয়েছেন ও তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নাইপলের মতো এমন একজন ধীমান কথাশিল্পী এমন একটা বাজে বই লিখলেন কী করে? প্রশ্ন করেছেন সায়ীদ (দেখুন: *দি প্রগ্রেসিভ*, নভেম্বর ১৯৮৮)।

খ্যাতনামা বাঙালি ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক তপন রায়চৌধুরীও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নাইপলের সমালোচনা করেছেন, তার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন রক্ষণশীল ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গিতে নাইপল ইসলামকে বিবেচনা করেছেন। তিনি ইসলামী মৌলবাদবিরোধী বলে নিজেকে প্রকাশ করলেও নিজেই যে এক ধরনের মৌলবাদী মনোভাবে আক্রান্ত তা থেকে এড়াতে পারেননি। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিষয়ে তার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত। ড. চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, নাইপলের কাছে ইসলামি বিপ্লব মানেই তা 'ইন্টারচেঞ্জেবল রেভ্যুলিউশানস'। অর্থাৎ তারা মূলত সবই এক, একটার জায়গায় আরেকটি বসিয়ে দিলেই হলো। অথচ নাইপল নিজেই তার বইতে এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন (দেখুনঃ *দেশ*, ২২ জানুয়ারি ২০০০)।

নাইপল তার গ্রন্থের উপনাম দিয়েছেন *ইসলামিক এক্সকারসানস অ্যামং দি কনভারটেড পিপল।* তিনি তার পরিব্রাজ্য দেশসমূহের মুসলমানদের কনভার্ট বা ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মান্তকরণের আগে এসব দেশের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিল। তার কোনোটি স্থানীয়, কোনোটা বা আঞ্চলিক। ধর্মান্তরীকরণের ফলে তাদের স্বজাতধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আনুগত্য পরিবর্তিত হয়েছে, তা স্থানান্তরিত হয়েছে ইসলামে ও আরব দেশে। নাইপলের কথা, ইসলাম ধর্মের উৎস আরব দেশে। যে আরব নয় এমন মুসলমান মাত্রই ধর্মান্তরিত বা কনভার্টেড। এই ধর্মান্তরীকরণের ফলে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমানের বিশ্ববীক্ষ্যা—তার ওয়ার্ল্ডভিউ বদলে যায়, তার নিজের ভাষার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে আরবের ভাষা। স্থানীয় বা দেশজ পবিত্র স্থানসমূহের জায়গা দখল করে নেয় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ। এমনকি ধর্মান্তরিত মুসলমানের স্বাদেশিক ইতিহাস পর্যন্ত বদলে যায়। আরবের ইতিহাস হয়ে পড়ে তার ইতিহাস।

অ্যাডওয়ার্ড সায়ীদ, যিনি একজন আরব/ প্যালেস্টাইনি খ্রিস্টান, তীব্রভাবে নাইপলের এই তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন। তার কথায়, শুধু আরবরাই 'অথেনটিক' মুসলমান—অন্যরা কৃত্রিম, এই হাস্যকর যুক্তি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো এই কথা বলা যে, শুধু রোমের স্থানীয় নাগরিকরাই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অকৃত্রিম অনুসারী। অন্যান্য রোমান ক্যাথলিকরা, যেমন ইতালিয়ান, স্প্যানিশ বা ফিলিপিনো, তারা সবাই কৃত্রিম বা ইন-অনেথটিক রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। তারাও ধর্মান্তরিত, ফলে তারাও তাহলে ইরানি বা মালয়েশীয় মুসলমানের মতো নিজ শেকড় থেকে উৎপাটিত।

একই কথা বলেছেন তপন রায়চৌধুরী। তার কথায়, নাইপলের যুক্তি মানলে বলতে হবে শুধু প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টানরাই জন্মসূত্রে খ্রিস্টান, আর সবাই নানা পৌত্তলিক ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত। নাইপলের দাবি সব মুসলমানের পুণ্যক্ষেত্র আরবে, স্বদেশে নয়। ড. চৌধুরীর বক্তব্য, তাহলে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান জুড়ে হাজার পীরের দরগা, ঐতিহাসিক মসজিদ—এগুলো কি পুণ্যক্ষেত্র নয়? নাইপলের যুক্তির সম্ভাব্য অপব্যবহার ব্যাখ্যা করে ড. চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, এই বিচিত্র যুক্তির অনুরণন মেনে হিন্দু রাষ্ট্রের ধ্বজাধারীদের চিন্তায়—ভারত যাদের জন্মভূমি ও ধর্মভূমি তারাই শুধু খাঁটি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ নিজামউদ্দিন আউলিয়া বা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগা যাঁদের কাছে পুণ্যস্থান তাদের এ হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে, কারণ তাদের ধর্মের উৎপত্তি হেজাজ অঞ্চলে, বলেছেন ড. চৌধুরী।

নাইপলের বই নিয়ে এই গেল প্রথম আপত্তি।

অন্য আপত্তি হলো ইসলামের বাইরে অন্য কোনো মৌলবাদ চিহ্নিত করতে তার ব্যর্থতা নিয়ে। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন, অক্সফোর্ডের নানা সেমিনারে 'মুসলিম ফ্যানাটিসিজম' কথাটি বহুবার শুনেছি। 'ক্রিসটিয়ান ফ্যানাটিসিজম' বলে কিছু আছে বলে শুনিনি। অথচ শহরটির প্রায় কেন্দ্রস্থলে প্রোটেস্ট্যান্ট শহীদদের পুড়িয়ে মারার স্মৃতিতে সুউচ্চ ফলক রয়েছে।

একই যুক্তি দেখিয়েছেন ব্রিটিশ লেখক ডেভিড গিলমোর। 'ফানডোস'-একা ইসলামের সমস্যা নয়। হিন্দু মৌলবাদ মসজিদ ভেঙে ফেলতে দ্বিধা করে না, ইহুদি মৌলবাদীরা গণখুনি বারুখ গোল্ডস্টিনের নামে সমাধি নির্মাণ করে আর পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতিকর মৌলবাদী রয়েছে আমেরিকান খ্রিস্টানদের মধ্যে। তাছাড়া গিলমোর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ইসলাম অন্তর্গতভাবে মোটেই মৌলবাদী নয়। স্পেনের করডোভায় তার দীর্ঘ শাসনকালে একমাত্র মুসলমান শাসকেরাই ইহুদিদের সমানাধিকার দিয়েছিল। (দেখুন: *দি স্পেকটেটর*, ২ মে ১৯৯৮)

নাইপলের প্রদত্ত তত্ত্বের নিখাদ চরিত্র নিয়ে সংশয় ও ভিন্নমত পোষণ করলেও অধিকাংশ সমালোচক অবশ্য এই ব্যাপারে একমত যে, নাইপলের গ্রন্থটি সুপাঠ্য। গল্প বলার যে কৌশলটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত কুশলী। 'তার লেখায় সত্যিকারের মুনশিয়ানা ব্যক্তিচেতনার সূক্ষ্ম বর্ণনায়। তার ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক মূল্য যাই হোক, সাহিত্যমূল্য অসাধারণ' বলেছেন তপন রায় চৌধুরী। খ্যাতিমান লেখক ইয়ান বুরুমা তার এই গ্রন্থটিকে 'এক্সট্রা অর্ডিনারি, হন্টিং বুক' বলে অভিহিত করেছেন।

(*নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস*, ১৬ জুলাই ১৯৯৮) একমাত্র অ্যাডওয়ার্ড সায়ীদই নাইপলকে অতিরিক্ত কোনো বাহবা দিতে অনাগ্রহী। পুরো গ্রন্থটিকেই তিনি একটি মহাবিপর্যয়— 'ইনটেলেকচুয়াল ক্যাটাস্ট্রফি অফ দ্য ফার্স্ট অর্ডার' বলে অভিহিত করেছেন।

পণ্ডিতকুলের এই নির্মম সমালোচনাসমূহ পাঠের পরই নাইপলের গ্রন্থটি আমার পড়ার সুযোগ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক চৌধুরীর দীর্ঘ সমীক্ষাটি না পড়লে এই বই হয়তো আমার পড়াই হতো না। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, পণ্ডিতকুলের অধিকাংশ ব্যাখ্যার সঙ্গে কমবেশি অভিন্ন মত পোষণ করেও বলছি, স্যার বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপলের এই গ্রন্থটি আমার কাছে অসাধরণ আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। ধর্মান্তরিত মুসলমানের বিশ্ববীক্ষা তার চেয়ে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্য আর কেউ দেখেনি। সে কথাও আমার মনে হয়েছে। এও মনে হয়েছে, পাকিস্তান প্রশ্নে তার যে পর্যবেক্ষণ তা কেবল সত্য তাই নয়, তা গভীরভাবে ভবিষ্যৎমুখী। পাকিস্তানিরা তার এই পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু পাক বা না পাক আগুয়ান মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধরত দেশগুলোর একটির নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশীরা তা থেকে বিস্তর শিক্ষা লাভ করতে পারি। আমার এই আলোচনায় আমি সে প্রসঙ্গেই মনোনিবেশ করব।

২

স্যার বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নাইপল ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও জন্মেছেন ত্রিনিদাদে (১৯৩২ সালে)। কর্মজীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছেন নিজ দেশের বাইরে, শেকড়হীন অবস্থায়, প্রধানত ইংল্যান্ডে। লেখা ছাড়া অন্য কোনো পেশা তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। উপন্যাস তার নির্বাচিত সাহিত্য মাধ্যম। তবে তার ভ্রমণ কাহিনীর জন্য তিনি সমধিক পরিচিত। উন্মুল মানুষ হলেও বারবার ভারতে ফিরে এসেছেন সে দেশকে বুঝতে, তার সঙ্গে পরিচিত হতে। কিন্তু ভারত, ত্রিনিদাদ বা ইংল্যান্ড কারো সাথেই ঐতিহ্যগত নৈকট্য অর্জন করতে পারেননি নাইপল। তার এই ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রে তার উপন্যাসসমূহের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি ব্রিটিশ সভ্যতার মুক্তকণ্ঠ ঢোলবাদক হিসেবেও তার খ্যাতি ও কুখ্যাতি রয়েছে। অনেকের ধারণা তার নাইটহুড যতটা না সাহিত্যে তার সাফল্যের জন্য তারচেয়ে অনেক বেশি তার এই সফল ঢোলক বাদনের জন্য।

বিয়োন্ড বিলিফ—বাংলায় তার নামকরণ করা যাক 'বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে'—নাইপলের ২৩তম গ্রন্থ। *অ্যামং দি বিলিভার্স*-এর সাথে মিলিয়ে পড়লে এই বইয়ের তাৎপর্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তবে স্বতন্ত্রভাবে তা পড়ায় আনন্দ ও আগ্রহের কমতি হয় না। এর একটা বড় কারণ নাইপলের কথন টেকনিক।

নাইপল নিজে বলেছেন তার এই বই মতামতসর্বস্ব নয়। বরং এটি মানুষের কাহিনীর, তাদের গল্পের একটি সংকলন। ১৯৯৫ সালে পাঁচ মাস একটানা চারটি ইসলামি দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। সেখানে নানা রকম মানুষের সাথে কথা বলেছেন, তাদের কাহিনী উদ্ধার করেছেন। সাংবাদিকের অনাগ্রহী কলমে নয়, লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, তার বর্ণনা করেছেন অনুপুঙ্খ। নাইপলের বর্ণনার বড় জোর তার ভাবালুতাহীন—আনসেন্টিমেন্টাল পর্যবেক্ষণ। নিজে কথা না বলে তার চরিত্রদের দিয়েই, তাদের কাহিনী শুনিয়েছেন। কাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ততা ধরে রাখার জন্য কাগজ-কলম বা টেপরেকর্ডার নিয়ে যাননি, সে কাহিনী মাথায় রেখেছেন। পরে লিখতে বসে যখন সন্দেহ জেগেছে বা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, আবার ফিরে গেছেন সেসব কাহিনীর উৎসে।

এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, নাইপল তার বইতে মতামত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। না, মোটেই না। একথা নির্ঘাত সত্য যে, তিনি এসব কাহিনী একটি বিশেষ রাজনৈতিক বা এমনকি আদর্শগত অবস্থানে থেকেই তাদের নির্বাচন করেছেন, তাদের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ কথা তো সব লেখকের এবং সব লেখার বেলাই সত্য। লেখকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বাচিত কাহিনীসমূহ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, কতটুকু কনভিনসিং। নাইপল মৌলবাদের ইতিহাস লিখছেন না, তা নিয়ে ডকুমেন্টারিও বানাচ্ছেন না। তার এই গ্রন্থ কেবল একটি মানবিক ভ্রমণ কাহিনী। মানবিক, কারণ তার পরিব্রাজ্য দেশের মানুষের কাহিনীতেই তার আগ্রহ। গভীর সন্দেহবাদী পাঠকও স্বীকার করবেন নাইপলের উদ্ধারকৃত চরিত্রসমূহ ও তাদের কাহিনী নিয়ে সংশয় কোনো পর্যায়েই জাগে না। তাদের স্পষ্ট নির্ভরযোগ্যতার জন্য এসব কাহিনী ও তার কথকদের সাথে অনায়াসে সংহতি অর্জনও কষ্টকর হয় না। ভ্রমণনির্ভর কাহিনীর সাফল্যের জন্য এই বিশ্বাসযোগ্যতা একদম প্রাথমিক পূর্বশর্ত। নাইপল সে শর্ত পূরণ করেছেন।

তবে তপন চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, নাইপল আর সব ধরনের মৌলবাদ বাদ দিয়ে শুধু ইসলামি মৌলবাদকেই বেছে নিয়েছেন তার বিবেচনার জন্য।

কিন্তু সেই নির্বাচন সমালোচনার বিষয় কেন হবে আমার কাছে তা বোধগম্য নয়। ইসলামি মৌলবাদই তার বিবেচ্য বিষয়, *অ্যামং দি বিলিভার্স* গ্রন্থে তাই ছিল, *বিয়োন্ড বিলিফ*-এও তাই। অন্য কোনো মৌলবাদী রাজনীতি তিনি যে বিবেচনা করেননি তার অর্থ এই নয় যে, সে সবের অস্তিত্ব তিনি মানেন না। এ কথাও ঠিক, ইসলামি মৌলবাদকে তিনি প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন। এই মৌলবাদকে তিনি 'মোস্ট আনকমপ্রোমাইজিং কাইন্ড অফ ইমপেরিয়ালিজম' বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা ইরান বা আফগানিস্তানে ইসলামি মৌলবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত, তারা নাইপলের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্ভবত দ্বিমত পোষণ করবেন না। আমার সন্দেহ হয়, কোনো কোনো সমালোচক নাইপলের মৌলবাদবিরোধী অবস্থানকে ইসলামবিরোধী বলে ধরে নিয়েছেন। ইসলামের প্রতি বাড়তি কোনো ভালোবাসা তার নেই—এ কথা সম্ভবত ঠিক, কিন্তু এই গ্রন্থে শুধু রাজনৈতিক ইসলাম বা পলিটিক্যাল ইসলামকেই বিবেচনায় এনেছেন তিনি। যারা পলিটিক্যাল ইসলাম সম্বন্ধে যৎসামান্য জানেন, তাদের ধর্মের এই রাজনীতিকরণ নিয়ে ভীত হওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়। একাত্তরে এই ধর্মের নামেই তো হাজার হাজার বাঙালি খুন হয়েছিল। ধর্ষিতা হয়েছিল অগুনতি নারী। সে সময় ধর্মের রাজনীতিকরণ পাকিস্তানে এত প্রবল ও সর্বব্যাপী ছিল, তার প্রভাব এত আপসহীন ছিল যে পুরো (পশ্চিম) পাকিস্তানে একজন লোককেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে দাঁড়িয়ে ওঠে সে হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ করে। ঠিক একই আপসহীনতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মীয় রাজনীতির সমর্থকরা সোৎসাহে সে হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছে, প্রতিবেশী ভাই-বন্ধুকে হত্যা করেছে। ধর্মীয় রাজনীতি এমনি কঠোর, এমনি নির্দয়।

৩

নাইপলের গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে। এই দেশ, তার মানুষ ও তার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নাইপলের বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তান প্রসঙ্গে নাইপলের নির্দয় পর্যবেক্ষণ: জন্মের চার দশক পরেও দেশটি এখনো একটি অপরাধী শাসন ব্যবস্থা বা ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে দেশের মানুষ এখনো কার্যত অধিকারহীন, যেমন তারা ছিল তার সৃষ্টির আগে। দুর্নীতি ও লুটপাট সেখানে সর্বব্যাপী, সশস্ত্র সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী।

পাকিস্তানের এই অবনমনের উৎস সন্ধানে নাইপল ধর্মের রাজনীতিকরণের প্রশ্নে ফিরে গেছেন। শুধু ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল দেশটি। ধর্ম

ছাড়া জাতীয় সংহতির কোনো বাহ্যিক প্রতীক বা সিম্বল পর্যন্ত নেই সে দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে। ভারতবিরোধিতা এক ধরনের সংহতিস্থাপক প্রতীক বটে, তবে তাও ওই ধর্মের ভিত্তিতেই। বিভিন্ন জাতির ব্যবহৃত ভাষা ভিন্ন, ভিন্ন তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এমন একটা দেশ টিকে থাকবে কী করে? ওই এক ধর্ম নিয়ে?

নাইপলের কথায়, খুব তড়িঘড়ি করে বানানো হয়েছিল পাকিস্তান। এর পেছনে কোনো কার্যকর বা বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা ছিল না। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের বাসভূমি হিসেবে কল্পনা করা হলেও সব মুসলমানকে সে দেশে স্থান দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভক্তির ফলে পাকিস্তানে যত মুসলমান আশ্রয় পায় তার চেয়ে বেশি রয়ে যায় ভারতে। এক অর্থে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে অধিকারহৃত হয় কোটি কোটি ভারতীয় মুসলমান। নাইপলের কথায়, মনে হয় শুধু হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিজয় ঘোষণা করতেই যেন তৈরি হলো দেশটি।

নাইপল দেশবিভাগের সময় মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি স্লোগান উদ্ধৃত করেছেন :

বাটকে রহেগা হিন্দুস্তান
বানকে রাহেগা পাকিস্তান।

ভারত ভেঙে টুকরো হবে
টিকে থাকবে এক পাকিস্তান।

বলা বাহুল্য, তার ইতিহাসের তিন দশকও কাটাতে পারেনি অবিভক্ত পাকিস্তান। তার আগেই ছিটকে পড়েছে, তার পূর্বাংশ—সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ধর্মভিত্তিক আইডিওলজি ছাড়া ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ফায়দার ব্যাপারটাও যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কথাও নাইপল উল্লেখ করেছেন। কারো কারো জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি ছিল টাকা বানানোর মস্ত মওকা। (পশ্চিম) পাকিস্তানের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করত হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। দেশ ভাগের পর তাদের অধিকাংশকে হয় ঠেলে পাঠানো হলো ভারতে, নয়তো আক্ষরিক অর্থেই নির্মূল করা হয় তাদের, তারপর যে যেভাবে পারল হিন্দু ও শিখদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। ধর্ম দিয়ে যে রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত, তার যাত্রা শুরু হলো এইভাবে এক নির্মম লুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে।

ঈশ্বরের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও সে রাষ্ট্রে খুব দ্রুতই ঈশ্বরের স্থান দখল করে নিল লোভ ও দুর্নীতি।

স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানি নেতারা মার্কিন সামরিক প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে আরো বিস্তৃত হয় দুর্নীতি ও স্বৈরশাসন। আফগানিস্তানে রুশবিরোধী ও পরে তালেবানি যুদ্ধের ফলে সশস্ত্র সহিংসতা দেশটির আগাপাশতলা ছেয়ে ফেলে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এত সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে যে, সেখানে খোদ রাষ্ট্রব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার সম্মুখীন হয়। আর এইভাবে দেশটি নিজেই রূপান্তরিত হয় একটি অপরাধী চক্রে। ভাবা হয়েছিল ধর্মবোধ সেখানে শুদ্ধি ঘটাবে, আনবে মুসলমানের ক্ষমতায়ন। বাস্তব সত্য হলো এই যে, ধর্মের রাজনীতির ফলে দেশটি ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে। নাইপল মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পাকিস্তান যে উপমহাদেশের সবচেয়ে কম শিক্ষিত দেশে পরিণত হয়, তা মোটেই কাকতালীয় নয়।

নাইপল তার বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে দুটি আশ্চর্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার কথায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, নিজস্ব বাসভূমি ছাড়া সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের পক্ষে বসবাস অসম্ভব। মোহাম্মদ ইকবালের একটি পরিচিত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, তার অর্থাৎ ইকবালের—পাকিস্তান প্রস্তাবের পেছনে মোদ্দা যুক্তি ছিল এই যে, মুসলমানদের পক্ষে একমাত্র মুসলমানদের সাথে থাকাই সম্ভবপর। আর সে জন্য চাই পাকিস্তান যা হবে শুধু মুসলমানদের আবাসভূমি। নাইপলের মন্তব্য, ইকবালের এই যুক্তি যদি সত্যি হয় এবং অন্য সকল জাতি বা গোষ্ঠী তা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু করে, তাহলে মানুষের পৃথিবী রূপান্তরিত হবে 'ট্রাইবাল ওয়ার্ল্ডে'। সেখানে থাকবে না অভিন্ন কোনো মানবসংহতি, থাকবে না অভিন্ন মানবিকতা। প্রতিটি উপজাতি বা ট্রাইব-যার যার কোনায় থাকবে, অন্যের সাথে যোগাযোগহীন, সম্পর্কহীন।

তার দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ আরো তীক্ষ্ণ। নাইপল বলেছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে তাদের, যারা এই দেশটি চেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তারাই ক্ষতি স্বীকার করেছে সবচেয়ে বেশি। এখানে নাইপল ভারত থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে আগত হাজার হাজার বিহারি নাগরিকের কথা বলেছেন। নিজের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন দেশে চলে এসেছে এইসব উদ্বাস্তু। ধর্ম তাদের মুক্তি দেবে তাদের দেবে সংহতি। ধর্মরাষ্ট্রের তারা শক্তিশালী খুঁটি হবে, এই স্বপ্ন তাদের ছিল। অথচ বাস্তব সত্য হলো এই যে,

আজকের পাকিস্তানে বিহারি উদ্বাস্তুরা সবচেয়ে কম অধিকারভোগী, রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে পর্যুদস্ত। বিহারিদের প্রধান জমায়েত করাচিতে। সেখানে গত ২০ বছর ধরে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ চলছে। মানুষ মরছে মাছির মতো। আইন বা বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অনেক আগেই।

তাহলে এ কেমন পাকিস্তান যার জন্য এত রক্তগঙ্গা?

পাকিস্তানের এই যে কাহিনী, নাইপল তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের চোখে দেখেননি। দেখেছেন লেখক হিসেবে, সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে। খ্যাতনামা বা অখ্যাত বিভিন্ন মানুষের জবানীতে তাদের কাহিনীই বলেছেন তিনি। পাকিস্তান পর্বে নাইপল প্রায় এক ডজন মানুষের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন এক 'ট্রাইবাল ও টোটালিটারিয়ান' পাকিস্তানের চিত্র।

নানা ধরনের নানা ভাবনার মানুষের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেন নাইপল তার গ্রন্থে। এদের অধিকাংশ হতাশ, ক্রুদ্ধ, উত্তরাধিকারহীন। নির্মম দক্ষতায় পাকিস্তানে টিকে থাকা সামন্তবাদী বৈষম্যের ছবিটি তুলে ধরেন তিনি। সন্দেহ নেই, অন্য যেকোনো সামন্ততান্ত্রিক দেশের মতো পাকিস্তানেও সবচাইতে প্রান্তবর্তী ও অন্তজ্য হচ্ছে মেয়েরা। তার একাধিক উদাহরণও দিয়েছেন নাইপল।

নামবিহীন এক রমণীর কথা লিখেছেন নাইপল। অভাবী, অধিকারহীন শ্রেণীর একজন। স্বামী ও এক দেবরের আক্রমণে তার নাকের একটা অংশ থেতলে গেছে। পরে দীর্ঘদিন তাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। এখন মেয়েটি বিচারের আশায় আইনজীবী খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে দুজনেই পিতার আশ্রয়ে। মেয়েটি তাদের ফেরত চায়।

আরেকটি মেয়ের কথা লিখেছেন নাইপল। এটি অবস্থাসম্পন্ন ঘরের কলেজ-শিক্ষিতা। বাবার মৃত্যুর পর ৬ হাজার একর জমির উত্তরাধিকারী হয় সে। এক আত্মীয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল মেয়েটি, কিন্তু পিতৃব্য চাইলেন মেয়েটি লেখাপড়া ছেড়ে পর্দার অন্তরালে থাকুক এবং তার নিজের নাবালক পুত্রটিকে বিয়ে করুক। তাতে রাজি না হয়ে ঘর ছেড়ে পালাল সে, পালিয়ে সেই আত্মীয়কে বিয়ে করল। তারপরে শুরু হলো লঙ্কাকাণ্ড। দুই পরিবারের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত বন্দুকের নল ঠেকিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করা হলো। পিতা ও স্বামী উভয়ের পরিবারের সম্মানের হানি করেছে, এই কারণে গুলি করে হত্যা করা হলো তাকে।

একটি বেলুচ রমণীর কথা লিখেছেন নাইপল। দাসী হিসেবে ১০ বছর বয়সে তাকে কিনে আনেন এক জমিদার। তখন থেকেই মালিকের রক্ষিতা

সে। সে জমিদার মারা গেলে তার ছেলের রক্ষিতা হয় সে। অবশেষে যখন নতুন জমিদারের সুপুত্রটি তাকে ভোগ করতে চায়, তখন এক পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে পালায় সে। আশ্রয় নেয় অন্য এক জমিদারের কাছে। তখন তুমুল দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয় দুই জমিদারের মধ্যে। দাসী পালিয়েছে, এতে করে তাদের প্রবল অসম্মান হয়েছে। মেয়েটি নতুন মালিকের হাত-পা ধরে অনুনয় করে, আমাকে পাঠাবেন না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত দুই জমিদারে রফা হয়, মেয়েটি এখানেই থাকবে তবে তার ছয় বছরের পুত্রটিকে তার বদলি হিসেবে পুরনো জমিদারকে অর্পণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। যেদিন ছেলেকে জমিদারের লোক এসে নিয়ে যায়, সেদিন তাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল অভাগা সেই মা। ছেলেটি কাঁদছিল আর মা তাকে বারবার আশ্বাস দিচ্ছিল এই বলে যে, সেও সাথে সাথে আসবে। আর কখনো সে ছেলের দেখা পায়নি সেই একাকী ও দুঃখী মাতা।

সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অথচ কার্যত ক্ষমতাহীন এমন বেশ কিছু মানুষের কথাও লিখেছেন নাইপল। রানা তাদের একজন। এক সময় সে চেয়েছিল পুলিশ হতে, কারণ পুলিশ প্রবল শক্তিমান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতার পরামর্শে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করে। কিন্তু আইন ও বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি আমুণ্ডু। তা দেখে হতাশ সে। এখন পালাতে চায় দেশ ছেড়ে। তার এক বন্ধু সোহেল বলে, পাকিস্তানে দুধরনের মানুষ রয়েছে, টাকাওয়ালা নামীদামি মানুষ আর কীটের মতো ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষ।

লাহোরের বেশ্যাপাড়া হীরামণ্ডিতে নাইপলের দেখা মেলে এক মাস্তানের সাথে। 'বলো, কোন মেয়েকে তোমার চাই। পয়সা আমি দেব, আমার টাকা আছে', অভয় দেয়, 'পুলিশ নিয়ে ভয় নেই। বখরা পেলেই ওরা খুশি।' শাহবাজ নামে আশ্চর্য সাহসী ও স্বাপ্নিক এক যুবকের কথা বলেন নাইপল তার গ্রন্থে। বিলাতে পড়াশোনা করা উচ্চশিক্ষিত। মার্কসবাদে শিক্ষিত যুবকটি পাকিস্তানে এসেছিল বেলুচিস্তানের সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণবিদ্রোহে অংশ নিতে। পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে সে কাহিনী লিখেছেন নাইপল। বাংলাদেশ বিভক্তির কয়েক বছরের মধ্যেই সে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু নির্মম হাতে পাকিস্তানি সমরনায়করা সে বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেয়। অথচ পৃথিবীর মানুষ জানেও না কী নির্দয় ও রক্তক্ষয়ী ছিল সে সামরিক অভিযান।

একাধিক ফান্ডোস বা মৌলবাদীর সাথেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন নাইপল। এসব মৌলবাদীর নিজস্ব কোনো কণ্ঠ নেই, তাদের নিজস্ব কোনো বিশ্বাস নেই। জামায়াতে ইসলামীর যা বিশ্বাস, তার প্রতিই আমুণ্ডু আনুগত্য

তাদের। জামায়াতের বক্তব্য, পাকিস্তান কখনই পুরোপুরি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। তারা ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত সে স্বপ্ন বাস্তবায়িতও হবে না। একমাত্র জামায়াতই পারবে সে স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথ দেখাতে। নাইপল স্মরণ করেছেন, ১৯৭৯ সালে তার প্রথম ভ্রমণের সময় জেনারেল জিয়াউল হকের কাছ থেকেও একই কথা শুনেছেন তিনি। জিয়াও প্রকৃত ইসলামি পাকিস্তান চেয়েছিলেন। ধর্মের নামে সন্ত্রাস ছিল তার অস্ত্র। এখন জামায়াতিরা বলে জিয়া যথেষ্ট ইসলামি ছিলেন না। মৌলবাদীদের কাছে নাইপলের প্রশ্ন, ইসলামে তো মিথ্যা অহঙ্কারের স্থান নেই। অথচ তারা কীভাবে বলে, যেসব হাজার হাজার মানুষ তাদের আগে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিল, তারা সবাই ভ্রান্ত আর একমাত্র তারাই সঠিক?

মোহাজের নিয়ে যে দীর্ঘ অধ্যায়টি তিনি লিখেছেন, নাইপল তার নাম দিয়েছেন 'লস'। যে স্বপ্নরাজ্যের আশায় তারা স্বদেশ ছেড়ে ইসলামি পাকিস্তানে এসেছিল, অধিকাংশ বিহারির জন্যই এখন তা অহর্নিশ দুঃসহ দুঃস্বপ্ন। ক্ষমতা অর্জনের বদলে তারা এখন ক্ষমতাহীন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বদলে তারা দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সামাজিক নিরাপত্তার বদলে এক সামরিক সন্ত্রাসের শিকার। বিহারিদের অধিকাংশই আশ্রয় নেয় সে দেশের প্রধান নগর করাচিতে। কিন্তু স্থানীয় সিন্ধিরা তাদের কখনই সাগ্রহে গ্রহণ করেনি। একই ধর্মের হলে কী হবে, তাদের চোখে বিহারিরা ছিল বহিরাগত—আউটসাইডারস। গত অর্ধ শতাব্দীতেও এই বিভক্তি কমেনি বরং বেড়েছে। এখন এই দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। সিন্ধিদের নিজের বাসভূমি আছে, তা থাকবে। কিন্তু মোহাজির পাকিস্তানির তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সর্বত্রই সে বহিরাগত।

তার বর্ণনার এক পর্যায়ে নাইপল ধর্মান্তরিত মুসলমানের মানসিকতার ইতিহাস ও ভূগোল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, পাকিস্তান এমন এক দেশ যেখানে নিজের ইতিহাসের বদলে তার ধর্মীয় ইতিহাস অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের নিজস্ব ইতিহাস সেখানে ইসলামের ইতিহাসের একটি পর্যায় মাত্র। আরব থেকে সামরিক অভিযানে এসেছিলেন যারা, এই নতুন রাষ্ট্রের তারাই আসল নায়ক।

সাংবাদিক সালমানের উদ্ধৃতি দিয়ে নাইপল জানান, উপমহাদেশের সব মুসলমানই তাদের কোনো না কোনো আরব পূর্বপুরুষ আবিষ্কারে ব্যস্ত। তাদের অনেকেই নিজেদের 'সৈয়দ' বংশের বলে দাবি করে থাকে। আরবের সাথে এই নামের সূত্রে কাল্পনিক বন্ধন সৃষ্টি করে তারা আত্মতৃপ্ত

হয়। অথচ খোদ আরবরা যখন এসব ধর্মান্তরিত মুসলমানের সাক্ষাতে এসেছিল, তাদের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের। সালমান জানায়, আরব পর্যটক ইবনে বতুতা তার গ্রন্থে কোনো স্থানীয় অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমানের উল্লেখ করে এ কথা যোগ করতে ভোলেননি যে মুসলমান হলে কী হবে, লোকটা আসলে ভারতীয়। নাইপলের মন্তব্য, আরব পূর্বপুরুষের প্রতি পাকিস্তানিদের এই তীব্র আগ্রহের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আরব অভিযানের আগে এই দেশটির কোনো ইতিহাস ছিল বলে মনে হয় না। মনে হয় না তাদের নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি ছিল, ছিল কোনো উত্তরাধিকার।

রক্তাক্ত করাচিতে সবচাইতে উত্তরাধিকারহীন হচ্ছে বিহারিরা। আবদুল নামে একজন মাঝবয়সী ব্যক্তির জবানীতে মোহাজিরের আশাভঙ্গের কথা বলেছেন নাইপল :

> করাচিতে এখন কী অবস্থা?
> খুব ভালো।
> কেন?
> এখন সরকারই সব করছে।
> মানে? খুন-জখমের কথা বলছেন?
> হ্যাঁ।
> তো সেটা ভালো কেন?

এখন যারা মারা যাচ্ছে তারা সবাই উর্দুভাষী। এইটা হলো তাদের আত্মত্যাগ, তাদের কোরবানি। কিছু পেতে হলে আপনাকে আগে কিছু দিতে হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ২০ লাখ জান দিতে হয়েছে। আমাদের অধিকার আদায়ের জন্যও জান দিতে হবে।

৪

ধর্মান্তরিত মুসলমানের উত্তরাধিকারহীনতা প্রসঙ্গে নাইপলের বক্তব্যের যে তীব্র প্রতিবাদ এডওয়ার্ড সায়ীদ করেছেন, সে কথা গোড়াতেই বলেছি। তপন রায়চৌধুরীও নাইপলের বক্তব্য হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। আরেক ভারতীয় লেখক শশী থারুর বলেছেন, ভারতের মাটিতেই তিনি মুসলমানদের পুণ্যস্থান সফর করেছেন। কে বলেছে ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য একমাত্র আরবের মাটিতে?

কথাটা ঠিক, কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও ঠিক যে, ধর্মীয় আনুগত্যের কারণে বা তার রাজনৈতিক বৈপরীত্যের কারণেই হোক আমরা অনেকেই রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে ধর্মীয় ইতিহাসকে গুলিয়ে ফেলি। প্যালেস্টাইনে সায়ীদকে সে সমস্যায় পড়তে হয় না। অথচ উপমহাদেশে তা খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। সম্ভবত একই কারণে আমাদের দেশেও নিজস্ব ইতিহাস-বিস্মৃতির প্রকোপ দেখা গেছে, এখনো যায়। পাকিস্তানের মতো আমরাও নামের আগে সৈয়দ জুড়ে আরবের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি। আরবের সমরনায়করা আমাদেরও সমরনায়ক হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলার ইতিহাস আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত, গৌড়ের ইতিহাস আমাদের কাছে ভিন্নদেশীয়। অথচ আরব, তুর্কি ও মোগল বিজয়ী সেনাপতিদের শৌর্যে আমরা মুগ্ধ। আমরা এতটাই হীনম্মন্য যে নিজের ভাষা বাংলা হওয়ায় তা নিয়ে পর্যন্ত বিব্রত। চল্লিশ বছর আগের বাংলা কবিতা পড়ে দেখুন। কবিদের ভাষা বাহ্যত বাংলা হলেও আরবি শব্দের উপস্থিতি তাতে প্রবল ও তীব্র। আর যে স্বপ্নে ভরা কবিদের চোখ, সেখানেও আঁকা আরবি দুলদুল, মরুর হাওয়া, শুষ্ক খর্জুর।

১.জ রর জোব্বা, শেরোয়ানি আর আমামার সজ্জায়
আতরের পানি, মেশকের রেণু খোসবু বিলায়ে যায়,
নেকাব খুলেছে নতুন কুমার—রাত্রি হয়েছে ভোর
ইয়াকুতি আর জুমররাতের লেবাস পরিয়ে
সুলতানা আছে তখতের পরে বসি।
বেদনাহীন সেতারা, নেমেছে মাটিতে আসমান হতে খসি।
(বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন, সৈয়দ আলী আহসান)

২. বে-নেকাব গুলে বকাউলি রাত।
তুমি এনেছিলে একদা এখানে প্রভাত-আরগাওয়ানী
ওগো রুখপাখী, জবীন দিনের বয়জাতে তাও দানি...
মুসা-কলীমের জাম্বিলে আজো থাকি।
(বে-নেকাব, মোফাখখারুল ইসলাম)

৩. কোন সন্ধ্যার বিয়াবনে আজ
থামলো কাফেলা সিপা'সালার
পেরেশান পথযাত্রীর, ঢুলে
তন্দ্রায় নত উটের সার।
(কোন বিয়াবনে, ফররুখ আহমদ)

এখানে উদ্ধৃত শেষ কবি ফররুখ আহমদ এক সময় লিখেছিলেন, 'দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন/ বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা।' বলাবাহুল্য উর্দুর সাথে এক নিকাহ বাসনার ফল যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর বাংলা ভাষার হরফ বদলে আরবি করার অপচেষ্টা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তরাধিকারহীন ও হীনম্মন্য কনভার্টের বিবেচনা থেকেই সৈয়দ আলী আহসান তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, আমরা অনায়াসে রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে পারি। আরেক পণ্ডিত সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন আরো সরাসরি পথ নির্দেশ করেছেন। তার কথায়, 'বাংলাকে মুসলিম তমদ্দুনের উপযুক্ত বাহনে পরিণত করিতে হইলে আমাদের যে আরবি-ফারসি আলফাজ এস্তেমাল করিতে হইবে, তা অস্বীকার করা চলে না। এবং যে সমস্ত শব্দ বিজাতীয় তমদ্দুনের পরিচয় বহন করে সেইগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইসলামি তমদ্দুনের নামগন্ধবর্জিত বঙ্কিমী-বিদ্যাসাগরী ভাষা পাকিস্তানের তরুণ শিক্ষার্থীরা শিখিবে, ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে?'

(এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন: *ভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*, হুমায়ুন আজাদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০)

আরবি-ফারসি আলফাজ এস্তেমাল করার সাথে ধর্ম পালনের কোনো সংশ্রব যে নেই তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সে আলফাজ যারা এন্তার এস্তেমাল করেছেন তাদের অনেকের হাতই খুনি রক্তে সিক্ত। ধর্ম নয়, ধর্মের রাজনীতিই তাদের কাছে প্রধান ছিল।

ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাস প্রসঙ্গে চল্লিশ বছর আগের এই বক্তব্য, এখন তা আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা যারা বলেন তারা নির্ঘাৎ আজকের বাংলাদেশের সাথে সম্যক পরিচিত নন। সহিংস ও সশস্ত্র মৌলবাদ এখন সেখানে ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছে, বিস্তৃত হচ্ছে। এইসব মৌলবাদীর চোখে এখনো উটের কাফেলা, খর্জুর বৃক্ষ ও রুখপাখী। বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস মুছে ফেলতে এদের আগ্রহ ও উদ্যম এখনো অসীম, এমনকি বাংলা ভাষার 'অ-ব্রাহ্মণীকরণে' তাদের তৎপরতা এখনো বর্তমান।

পাকিস্তানের মতো ট্রাজেডি ঠেকাতে হলে মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের তর্জনি আমাদের তুলতেই হবে। এখনই, আজকেই।

....

প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০০০

§ সংবর্ধনা

৫

কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ?

আহমদ ছফা

খবর পেয়েছি বিনা চিকিৎসায় কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে মারা গেছে। এই প্রতিভাধর কবি যাঁর দানে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে—পয়সার অভাবে তাঁর মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেননি, ওষুধ কিনতে পারেননি। কবি এখন বেকার। তাঁর মৃত মেয়ের জামাই, যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন বলে খবর পেয়েছি তাঁরও চাকুরি নেই।

মেয়ে তো মারাই গেছে। যারা বেঁচে আছেন, কি অভাবে, কোন অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিনগুলো অতিবাহিত করছেন, সে খবর আমরা কেউ রাখিনি। হয়ত একদিন সংবাদ পাব কবি মারা গেছেন, অথবা আত্মহত্যা করেছেন। খবরটা শোনার পর আমাদের কবিতাপ্রেমিক মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হবে? ফররুখ আহমদের মৃত্যুসংবাদে আমরা কি খুশি হব, নাকি ব্যথিত হব? হয়ত ব্যথিতই হব এ কারণে যে, আজকের সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে ফররুখ আহমদের মত একজনও শক্তিশালী স্রষ্টা নেই। এমন একজন স্রষ্টাকে অনাহারে রেখে তিলে তিলে মরতে বাধ্য করেছি আমরা, ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের ক্ষমা করবে না, অথচ কবি ফররুখ আহমদের মরার সমস্ত ব্যবস্থা আমরাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছি। আমরা তাঁর চাকুরি কেড়ে নিয়েছি, তাঁর জামাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সৎভাবে পরিশ্রম করে বাঁচবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। রাস্তা-ঘাটে কবির বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় সবগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা ত্রুটি রাখিনি।

কবি ফররুখ আহমদকে আমরা এতসব লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলেছি তার কারণ তো একমাত্র কবিতাই। ফররুখ আহমদের একমাত্র অপরাধ তিনি একদা পাকিস্তানের সপক্ষে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় একটি বিশেষ

জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। আমার মনে হয় সে জীবনাদর্শটি দুষ্টলোকের ভাষায় ইসলামি জীবনাদর্শ। এখন কথা হল, তখন কি পাকিস্তানের সপক্ষে কবিতা লেখা অপরাধ ছিল? আমরা যতটুকু জানি পাকিস্তান এবং ইসলাম নিয়ে আজকের বাংলাদেশে লেখেননি এমন কোন কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই চলে। অন্য অনেককে বাদ দিয়েও কবি সুফিয়া কামালের পাকিস্তান এবং জিন্নাহর ওপর নানা সময়ে লেখা কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে 'সঞ্চয়িতা'র মত একখানা গ্রন্থ দাঁড়াবে বলেই আমাদের ধারণা। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে মস্কো ভারত ইত্যাদি দেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন, আর ফররুখ আহমদ রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে অপমানের লাঞ্ছনায় মৃত্যুর দিন গুনছেন। ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে বাংলাভাষার সতীত্ব হানি করেছেন। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ নিজে বলেছেন, তিনি শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দোষনীয় নয়। বিশেষত বাংলাদেশে এমন একটা সময় ছিল, কবি-সাহিত্যিকেরা উর্দু, ফারসি ঘেঁষা দেখাতে পারলে বর্তে যেতেন। তাদের অনেকেই এখন বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন। তাছাড়া ইংরেজি, জার্মান, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কবিতা, গল্প লিখতে চেষ্টা করছেন, তাঁদেরকে সে সকল রচনার জন্য পুরস্কৃত করতেও আমাদের বাধছে না। ও সমস্তের ফলে যে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে সত্যিকার অর্থে সে বিচার কে করবে? অথচ অন্য কবি-সাহিত্যিক সকলে বাইরে রয়েছেন। কিন্তু শাস্তি ভোগ করছেন একা ফররুখ আহমদ—এ কেমন ধারা বিচার? ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নালিশ রয়েছে, সেগুলো হল—তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চল্লিশজন স্বাক্ষরকারীর একজন। তিনি স্বশ্রদ্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বাক্ষরদানকারী চল্লিশজনের অনেকেই তো এখনো বাংলাদেশ সরকারের বড় বড় পদগুলো অলংকৃত করে রয়েছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদকে একা কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না কে? আজকের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তো এক সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাতই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাশাপাশি জয়-বাংলা এবং জয়-পাকিস্তান শব্দ দু'টো উচ্চারণ করেছিলেন, তাহলে ফররুখ আহমদের অপরাধটা কোথায়? বলা হয়ে থাকে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে তিনি অনেকবেশি সাম্প্রদায়িক বিষোদগার করেছিলেন। সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সমস্ত

প্রমাণ এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি। বাংলাদেশের সমস্ত লেখক-কবি-সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে কে কার চাইতে বেশি যেতে পারেন সে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। মানুষের স্মৃতি এত দুর্বল নয় যে, হিং টিং ছট ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলো ভুলে গেছে। ঐ সমস্ত প্রোগ্রাম যারা করেছে সংস্কৃতির সে সকল কলমধারী গুণ্ডারা বাংলাদেশে বুক চিতিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির আসন দখল করে আছে—কি আশ্চর্য। চাকুরি হারাবেন, না-খেতে পেয়ে মারা যাবেন একা ফররুখ আহমদ।

এতসব দোষের মধ্যেও ফররুখ আহমদের কতিপয় গুণের কথা আমরা না-উল্লেখ করে পারছিনে। সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরে কবি ফররুখ আহমদকে যখন প্রাইড অব পারফরমেন্স দেয়ার কথা ওঠে, তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আমরা শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, একজন কবির ক্ষমতাদর্পীর হাত থেকে নেয়ার কিছুই নেই। খবর পেয়েছিলাম, সে প্রাইড অব পারফরমেন্স এমন একজন সাহিত্যসেবীকে দেয়া হয়েছিল এখন যত্রতত্র তাঁর শোকসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি দলের সকলে তাঁর কথা মনে করে শোকাশ্রু বর্ষণ করছেন। মজার কথা হল, তিনিও দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। যাকে নিয়ে এত লাফালাফি হচ্ছে, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন আজ হয়ত কারাগারেই থাকতেন। আমাদের কথা হল, ফররুখ আহমদের মত একজন শক্তিমান স্রষ্টার চাকুরি কেড়ে নিয়ে সপরিবারে তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার পেছনে ন্যায়-নীতিসঙ্গত যুক্তিটা কি হতে পারে?

আমরা বাংলাদেশের আরো একজন খ্যাতনামা কবির কথা জানি। যিনি পাকিস্তানি দখলদার সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকটির সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন। ঐ পত্রিকার চাকুরি করেন আর একজন কবি সম্পর্কে কানা-ঘুষো শোনা যাচ্ছে যে, তিনি পাকিস্তানি মেজর ক্যাপ্টেনদের সাহায্যে নাম ভাঙ্গিয়ে লাহোর করাচি ছুটোছুটি করেছেন। কেউ যদি আমাদের বক্তব্যকে অসত্য মনে করেন, বাস্তব প্রমাণ দাখিল করতে পারব।

কত মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামের গুণ্ডা, এনএসএফ-এর চর সরকারি আনুকূল্যে পুনর্বহাল হয়েছে, তাদের সংখ্যা হাজারকে হাজার। একজন দুজন নয়। কিন্তু শাস্তিভোগ করবেন একজন আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন কবি। এধরনের অবিচার আমাদের এ বাংলাদেশেই হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত ভূতপূর্ব পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার কুখ্যাত বার্তা-সম্পাদক এ. বি. এম.

মুসার নাম বলতে পারি। এই মুসা সাহেব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোলকাতায় যেয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছিলেন, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মন থেকে সে স্মৃতি এত তাড়াতাড়ি মুছে যায়নি। মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমিক সম্মানটি দিতেও রাজি ছিলেন না।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে তাদের রোবল বলে অন্তর্হিত করেছিলেন। সেই মুসা সাহেব এখন বাংলাদেশের সংসদ-সদস্য। ফররুখ আহমদের অপরাধ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মত স্লোগান বদল করতে পারেননি। সৎ কবিরা অনেক সময় ধরতাই বুলিতে গা ঢেলে দিতে পারেন না। সেটাই তাদের একমাত্র অপরাধ। কবি ফররুখ আহমদও এই একই অপরাধে অপরাধী।

অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক যাদের কোন রকমের আদর্শবোধ নেই, চরিত্র নেই, সুবিধেটাই নীতি। আমরা জানি, তারা আজ ফররুখ আহমদের নামে দুটো সমবেদনার কথা কইতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তারপরেও আমরা মনে করি ফররুখ আহমদ একজন বীরচরিত্রের পুরুষ। একজন শক্তিমন্ত কবি। আমাদের সাহিত্য থেকে তাঁর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। এই সরকারের কাছে কবি ফররুখ আহমদের রুটি-রোজগারের পথ খুলে দিতে আবেদন করার কোন সার্থকতা নেই। কেননা এ. বি. এম. মুসা সাহেবের মত মানুষেরা এই সরকারের সংসদ-সদস্য, হিং টিং ছটের কলমধারী গুণ্ডারা এই সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণাদাতা। তাদের যদি বিবেক থাকত, যদি সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রতি প্রেম থাকত কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত না। কবিকে বৃদ্ধ বয়সে উপোস করতে হত না। আমরা কবি ফররুখ আহমদকে বাঁচাবার জন্য, তার পরিবারকে বাঁচাবার জন্য 'ফররুখ আহমদ সাহায্য তহবিল' গঠন করার জন্য কবির অনুরাগীজন এবং দেশপ্রেমিক, সংস্কৃতিপ্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখছি।

....

গণকণ্ঠ, ১৬ জুন ১৯৭৩

§ সংবর্ধনা

৬

কালো আণ্ডা

কুরিহারা সাদাকো

প্রবেশিকা

এই তর্জমা কয়টি আমি করেছিলাম ইংরেজি ১৯৯৮ সালে। তখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য ইয়র্ক শহরে থাকতাম। কবি কুরিহারা সাদাকো লোকান্তরিত হয়েছেন। খানিক পরিমার্জিত করে এই কবিতা—শুদ্ধ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের উপায়স্বরূপ—প্রকাশের প্রস্তাব করলাম। কুরিহারা সাদাকোর কবিতার ইংরেজি তর্জমা আমি প্রথম পড়ি খুব সম্ভব *জার্নাল অব কনসার্নড এশিয়ান স্কলারস* নামক (বা এ জাতীয় কোন) স্বল্প প্রচারিত পত্রিকায়। পরে খবর পাই, ১৯৯৪ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জাপান বিদ্যা কেন্দ্র থেকে একটি বড় সঙ্কলন ছাপা হয়েছে ওঁর কবিতার। এই সঙ্কলনে প্রায় সোয়া তিনশ পাতা। নাম *কালো আণ্ডা* (*Black Eggs*)। (সাদাকো ১৯৯৪)

সাদাকো সম্পর্কে আমি যা জানি তা সামান্য। উপরে যে সঙ্কলনের কথা তুললাম তার মধ্যে নাই এমন কোন কথা আমার জানা নাই। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমায় বোমা পড়ে। বেগম কুরিহারা সেদিন বোমার মূল আঘাত যেখানে পড়ে তার চার মাইল দূরে নিজ বাড়িতে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের বিভীষিকা কুরিহারার কবিতায় অনেক বড় জায়গা জুড়ে আছে। অবশ্য যুদ্ধের আগেও তিনি যুদ্ধবিরোধী যুদ্ধে জড়িত ছিলেন।

সাদাকো বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রেমিককে বিয়ে করেছিলেন। ওঁরা দুজনই জাপানি সমরবাদ ও ধনতান্ত্রিক বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আজীবন। ওঁর স্বামী যুদ্ধাহতদের সেবার সময় পরমাণু বোমার তেজে আক্রান্ত হন।

অনেক দিন যন্ত্রণা সহ্য করার পর সেই বেদনাতেই তিনি মারা যান। অন্তিম যাত্রার সময় তার বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর।

সাদাকোর দুই মেয়ের নাম জুনকো ও মারিকো—এখানে অনূদিত 'জুনকোর জন্ম' কবিতায় তার উল্লেখ আছে। জাপানের অস্ত্র সমর্পণের পর এক মার্কিন ধর্মপ্রচারকের কাছে বেগম কুরিহারা কিছু কিছু ইংরেজি শেখেন। সে প্রসঙ্গ এসেছে 'ভাষা' নামক কবিতায়। সাদাকোর কবিতায় পরমাণু বোমার অভিজ্ঞতার সূত্রে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে হুঁশ ও হুঁশিয়ারি এসেছে। সেই কথার নমুনা পাই 'বিষ্টি' কবিতায়। যুদ্ধবিরোধী মনুষ্যত্ববাদের প্রকাশ অপর কবিতাটিতেও আছে। এর নাম ইংরেজিতে 'টমেটো সঙ্গস'। টমেটো জিনিসটি আমাদের ভাষায় টক বেগুন বা খাট্টা বেগুন। কখনো বা শুনি বিলিতি বেগুন। সবচেয়ে বেশি শুনি অবশ্য খোদ টমেটোই। গত শতকের কোন এক রসিক এর তর্জমায় 'তেমতি' কথাটা প্রস্তাব করেন। আমার শখ হল, দেখি চালানো যায় কিনা। পদ্যে কত কিছু চলে! বিলিতি বেগুন তো আসলে বিলিতিও নয়। আদি ও আসল আমেরিকার।

আমাদের দেশের জাপানি সাহিত্য বিশারদ ও জাপানি ভাষা জানা কবিরা এর আরো ভালো তর্জমা করলে আমার চেষ্টার ভালো পুরস্কার হবে। এছাড়া অন্য কোন তামাশা আমার নাই। জাপানি শিখিনি—এই লজ্জা কাটানোর জন্য বসেছিলাম। আবার ভাবলাম কবির নামের দিকে যোগ্যজনের দৃষ্টি আকর্ষণেরও তো একটা মূল্য আছে।

কবিতার ব্যাপারে আমার ধারণা: শত তর্জমার পরও যা বাকি থাকে তার নামই কবিতা।

কালো আণ্ডা

তেমতি সঙ্গীত

জঙ্গ মাতাল
এই দুনিয়ায়
পিছের খেতে
তেমতি ফলাই
শান্তি পাই

তর সয় না
পাকবে কখন—কইছি ঠিকই
লেকিন আজি কিংবা কালি
পাকলো বলে
সব তেমতি

বিহান বিকাল
নয়ন জুড়ায় তেমতি গাছ
দেখতে দেখতে
পিছের খেতে
চোখে আমার ঘুম নামে না

পাতার ছায়ায়
বাত্তি তো হয়
সব তেমতি
আর কটা দিন যাক না রে ভাই
পাক ধরবে

মোর চিলতার সব তেমতি
গোলগাল আর নাদুসনুদুস
নিচের ডালায়
মগডালে ফল ধরছে মেলা
থোকায় থোকায়

এক বিকালে
তোমার পথে চোখ বিছিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকি খেতের ভিতর
আখের গোছাই
লতিক ছিঁড়ি তেমতি গাছের

তুমি আইলা
হাঙ্গা দিলা
গপপো করলা
পাকলো পাকলো তেমতি ফলের
পিছের খেতে

বাচ্চারাও
ভোঁ দৌড়ে দেখে আসে
খুশির চোটে
রাষ্ট্র করে
'পাইক্কা গেছে'

বাড়িত ফিরি
হাত ধুইয়া লই
সবুজ রঙ
ধারণ করে
সাবান ফেনা।

ভাষা

বৈদেশি ভাষার লগে
প্রেম আমার
পড়ান মাস্টারবাবু
উঁচা লম্বা
চোখ নীল

মাস্টারবাবুর আমার
একটা মুদ্রাদোষ
গলাটা একটু
না চড়ালে ওর মুখে
জাপানি বোল ফোটে না

ওর গলার আওয়াজ
আসে সিধা
ঢোকে কলিজার ঘরে
কী যাদু কথার!
কী মজা!

আমার লম্বা মাস্টারের
গলা নরম, সোন্দর
প্রাণ ছুঁইয়া দেয়
একদম
বাচ্চাকাচ্চার মতন।

দেখতে আমরা
এক ছাপ নই, নাই বা হলাম
নীলচোখ মাস্টার
তুমি কিন্তু শেখাও বাবু
প্রাণের দরদে।

বিষ্টি

লোক দেখলে আর লোকে সেলাম বলে না
বলে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে সেলামের বদলে
দেখি বিষ্টি পড়ে

বিষ্টি পড়ে
মাঠে ঘাটে পাহাড়ে পর্বতে দরিয়ার গাঙ্গে
বিষ্টি পড়ে শহরে নগরে ইট সুড়কি ইমারত বনে
বিষ্টি ঝরে
ঝরে বিষ ধোঁয়া মরণের ছাই

বিষ্টি আর পড়বে না একদিন
ঝরবে বেগুনিপাড়ের আলো আকাশের ফুটা
রেখে বিদায় নিয়েছে ওজোন—বলে যাই
প্রাণ লুকাবার ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
আলো ঝরে কালে

রোদ হবে বিষ্টি হবে
হবে নয় ছয়
বে-ইনসাফ ঘুষখোর এই কলির দুনিয়ায়
হয় বিষ্টি হয়

জুনকোর জন্ম

ব্যথা এড়াই
সাধ্য নাই
বলি—সব সই
দেখা যাক কী আছে ঘটে
দেখি কী যে হয়

আসমান জমিন
ফালা ফালা হবার জোগাড়
আমারও সেই হাল হয়
অমনি ওয়া ওয়া
পাওয়া যায় বাচ্চার আওয়াজ।

কান্নার শেষ বলও
শেষ হয় এক সময়
আমার ঘুম পায়
ঘুম আসে অচেতন
তারপর।

চোখ মুদে আসে
আসে না তো ঘুম
এই তো ভাবি
মোর পাশে পুতুল রে
আহা প্রাণের পুতুল।

খোদার ফজলে হাসে সে
আঁতুড়ের দেওতা
দেখি আদর করছে ঝুঁকে
নয়ন জুড়াই আমি
নয়নের সুখে।

লোকে বলে মেয়ে না ছেলে চাই
মোর কোন
আফসোস নাই
জুনকো মারিকো
সোনামানিক আমার।

....
সলিমুল্লাহ খান, ১৯৯৮

বোধিনী ও দোহাই

বোধিনী

ভৃত্যের প্রার্থনা

১. 'In Hegel the slave turns away from the master and turns towards the object.

Here the slave turns towards the master and abandons the object.' (Fanon 1970: 157)

২. 'It is solely by risking life that freedom is obtained; only thus is it tried and proved that the essential nature of self-consciousness is not bare existence, is not the merely immediate form in which it at first makes its appearance, is not its mere absorption in the expanse of life.' (Hegel 1967: 233)

৩. 'The individual, who has not staked his life, may, no doubt, be recognized as a *person*, but he has not attained the truth of this recognition as an independent self-consciousness.' (Hegel 1967: 233; italics in original)

৪. 'As soon as I *desire* I am asking to be considered. I am not merely here-and-now, sealed into thingness. I am for somewhere else and for something else. I demand that notice be taken of my negating activity in so far as I pursue something other than life; in so far as I do battle for the creation of a human world—that is, of a world of reciprocal recognitions.' (Fanon 1970: 155; italics in original)

৫. 'He who is reluctant to recognize me opposes me. In a savage struggle I am willing to accept convulsions of death, invincible dissolution, but also the possibility of the impossible.' (Fanon 1970: 155)

৬. 'I do not know; but I say that he who looks into my eyes for anything but a perpetual question will have to lose his sight; neither recognition nor hate.' (Fanon 1970: 22)

৭. 'Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je dis qu'on nous a menti: Hitler n'est pas mort; quand je tourne le bouton de ma radio, que j'apprends que des Juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti: Hitler n'est pas mort; que je tourne enfin le bouton de ma radio et que j'apprenne qu'en Afrique le travail forcé est institué, légalisé, je dis que, véritablement, on nous a menti: Hitler n'est pas mort.' (See, Fanon 1952: 72) একই বক্তব্যের জন্য দেখুন, সেজার (২০০০)।

৮. 'But, Francis Jeanson says, every citizen of a nation is responsible for the actions committed in the name of that nation...' (Fanon 1970: 64; Fanon 1952: 73)

৩ § আদমবোমাঃ আত্মহত্যা না সত্যাগ্রহ

১. '306. If If any child under twelve years of age, any insane person, any delirious person, any idiot, or any person in a state of intoxication, commits suicide, whoever previously abets by aid the commission of such suicide shall be punished with death, or transportation for life, or rigorous imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

'307. If any person commits suicide, whoever previously abets by aid the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years and must not do less two years, and shall also be liable to fine.' (The Indian Law Commissioners 2002: 40–41)

২. 'One who kills himself does less harm to society than one who leaves its borders forever; for the former leaves all his belongings, whilst the latter takes with him some part of what he owns. Indeed, if the strength of a nation consists in the number of its citizens, one who leaves a society to join a neighbouring nation

does twice the harm of one who simply removes himself by death.' (Beccaria 2003: 83)

৩. 'To kill in order to commit suicide, that's my morality!' (Asad 2007: 40)

৪. 'But death here is an effect not a motive.' (Asad 2007: 42)

৫. '...the founding or recreating a just community on earth.' (Asad 2007: 56)

৫ § সাম্রাজ্যবাদের যুগে দুই বিশ্বের কবিতা

১. গ্রিক Agonistes শব্দের তর্জমা বিবাদী কিংবা বিপথগামী দুইটাই হতে পারে। মহাকবি মিল্টন মনে হইতেছে প্রথম অর্থের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া ছিলাম।

২. কবিতাটির রচনাকাল ৫ অক্টোবর ১৯৭১। এই তথ্য জাতীয় কবিতা পরিষদ আয়োজিত জাতীয় কবিতা উৎসব ২০০৯ সেমিনারে জানাইয়াছিলেন প্রখ্যাত প্রকাশক (সাহিত্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী) মফিদুল হক। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

৮ § যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য

১. 'The real cause I consider to be the one which was formally most kept out of sight. The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon, made war inevitable.' (Thucydides 1951: 15)

২. 'I can make allowance for those who revolt because they cannot bear our empire, or who have been forced to do so by the enemy. But for those who possessed an island with fortifications; who could fear our enemies only by sea, and there had their own force of galleys to protect them; who were independent and held in the highest honour by you—to act as these have done, this is not revolt—revolt implies oppression; it is deliberate and wanton aggression; an attempt to ruin us by siding with our bitterest enemies; a worse offence than a war undertaken on their own account in the acquisition of power. The fate of those of their neighbours who had already rebelled and had been subdued, was

no lesson to them; their own prosperity could not dissuade them from affronting danger; but blindly confident in the future, and full of hopes beyond their power though not beyond their ambition, they declared war and made their decision to prefer might to right, their attack being determined not by provocation but by the moment which seemed propitious.' (Thucydides 1951: 165–66)

৩. 'Let them now therefore be punished as their crime requires, and do not, while you condemn the aristocracy, absolve the people. This is certain, that all attacked you without distinction, although they might have come over to us, and been now again in possession of their city. But no, they thought it safer to throw in their lot with the aristocracy and so joined their rebellion!' (Thucydides 1951: 166)

৪. 'Consider therefore! if you subject to the same punishment the ally who is forced to rebel by the enemy, and him who does so by his own free choice, which of them, think you, is there that will not rebel upon the slightest pretext; when the reward of success is freedom, and the penalty of failure nothing so very terrible?' (Thucydides 1951: 166)

৫. 'We meanwhile shall have to risk our money and our lives against one state after another; and if successful, shall receive a ruined town from which we can no longer draw the revenue upon which our strength depends; while if unsuccessful, we shall have an enemy the more upon our hands, and shall spend the time that might be employed in combating our existing foes in warring with our allies.' (Thucydides 1951: 166)

৬. 'However, I have not come forward either to oppose or to accuse in the matter of Mitylene; indeed, the question before us as sensible men is not their guilt, but our interests. Though I prove them ever so guilty, I shall not, therefore, advise their death, unless it be expedient; nor though they should have claims to indulgence, shall I recommend it, unless it be clearly for the good of the country.' (Thucydides 1951: 169)

৭. '...[B]ut we are not in a court of justice, but in a political assembly; and the question is not justice, but how to make the Mitylenians useful to Athens.' (Thucydides 1951: 169)

১২§ এডোয়ার্ড সায়িদ, এসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

১. 'Revolutionary violence tends to be sociologically and psychologically selective. It strikes at widely perceived symbols of oppression—landlords, rapacious officials, repressive armies. It aims at widening the revolutionaries' popular support by freeing their potential constituencies from the constraints of oppressive power.' (quoted in, Said 1995: 346)

১৫§ আপন ও পরবুদ্ধিজীবী

১. 'There is no such things as a science of man, and this should be understood along the lines of "there's no such thing as an insignificant savings." There is no such things as a science of man because science's man does not exist, only its subject does.

My lifelong repugnance for the appellation "human sciences" is well known; it strikes me as the very call of servitude...'

'Consider Lévy-Bruhl and Piaget. Their concepts—so called prelogical mentality and supposedly egocentric thought or discourse—refer only to the assumed mentality, presumed thought, and actual discourse of science's subject (not science's man).' (Lacan 2006/kha: 729–30; Lacan 1966: 859)

১৭§ স্যার বিদিয়াধর সুরজপ্রসাদ নাইপলের অখণ্ড ভারত

১. বর্তমান নিবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল প্রসিদ্ধ সমালোচক হাসান ফেরদৌস প্রণীত 'নাইপলের পাকিস্তান' নিবন্ধের সমালোচনা আকারে। সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি, *প্রথম আলো* পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকী পাতার সম্পাদকগণ আমাকে ইহা লেখার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

কি জানি কোন অজ্ঞাত কারণে শিরোনামের উপরে 'প্রতিক্রিয়া' নামের ছাপ মারিয়া ১৪ জুলাই ২০০০ তারিখে ইহার অংশবিশেষ ছাপাইয়া তাঁহারা আমাকে বাধিত করেন। প্রত্যক্ষ করিলাম তাঁহারা ছাপাইয়াছেন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত

প্রবন্ধটির প্রথম চারি অধ্যায় মাত্র। শেষ দুই অধ্যায়ের বিষয় ছিল কবি ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে হাসান ফেরদৌসের অপ্রাসঙ্গিক এবং অসাধু সমালোচনা। সম্পাদকদের নতুন অসাধুতার প্রতিবাদ করিলাম। দুই সপ্তাহ পর (২৮ জুলাই) দেখিলাম তাঁহারা সম্ভবত এক প্রকার আপোস করিয়া আমার নিবন্ধের বাকি দুই অধ্যায় পাঠকের পত্রাকারে সংক্ষেপে পত্রস্থ করিয়াছেন।

প্রায় নয় বৎসর পর বর্তমান সংস্করণে পুরা লেখাটা উদ্ধার করা হইল। এই নিবন্ধ লিখিতে বন্ধুবর সাজ্জাদ শরিফের ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহা স্বীকার করিবার নগদ কোন সুযোগ পাই নাই। অদ্য সেই ঋণ নতুন করিয়া স্বীকার করিতেছি। অধিকন্তু এই গ্রন্থে হাসান ফেরদৌসের মূল লেখাটা সঙ্কলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া *প্রথম আলো* পত্রিকার সম্পাদকগণ আমার ঋণের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিলেন।

২. V. S. Naipaul, 'Reading and Writing: A Personal Account,' in *The Writer and India*, p. 48; bibliographic details missing.

৩. 'Servants under the threat of being fired, poor women dragged from their homes, prostitutes, were brought to the public squares and *symbolically* unveiled to the cries of *Vive l'Algerie fransaise!*' (Fanon 1965: 62; italics in original)

৪. 'What is in fact the assertion of a distinct identity, concern with keeping intact a few shreds of national existence is attributed to religious, magical, fanatical behavior.' (Fanon 1965: 41)

৫. দেখুন, *The Voice of Bangladesh* (New York); *Dhaka Courier* (Dhaka).

দোহাই

বই ও পত্রপত্রিকা

১. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৯)।

২. ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৯)।

৩. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি: ১৯২০–১৯২৯*, ২য় মুদ্রণ (কলিকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৭১)।

৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'সায়েবদের গান্ধী,' *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭)।

৫. *কিতাবুল মোকাদ্দস* (ঢাকা: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০)।

৬. *কিতাবুল মোকাদ্দস*, বাংলা অনুবাদ (ঢাকা: মঞ্জিল-ই-কিতাবুল মোকাদ্দস, সনতারিখ নাই)।

৭. আহমদ আবদুল কাদের, *জিহাদ কি ও কেন*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা, ১৯৯৭)।

৮. সলিমুল্লাহ খান, *সত্য সাদ্দাম হোসেন ও 'স্রাজেরদৌলা'*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, ইতিহাস কারখানা ১, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০০৯/ক)।

৯. ________ সম্পাদিত, *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১*, আহমদ ছফা মহাফেজখানা ১, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০০৯/খ)।

১০. ________, *আমি তুমি সে*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, জাক লাকাঁ বিদ্যালয়, ২য় খণ্ড (ঢাকা: সংবেদ এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০০৮/ক)।

১১. ________, 'এডোয়ার্ড ওয়াদি সায়িদ ও জিকমুন্ট ফ্রয়েড', *আমি তুমি সে*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, জাক লাকাঁ বিদ্যালয়, ২য় খণ্ড (ঢাকা: সংবেদ এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা ২০০৮/খ); পৃ. ৬৫–৭০।

১২. _________, 'কঙ্করবোমা: ফ্রয়েড, এডোয়ার্ড সায়িদ ও এয়ুরোপের বিজাতি,' *আমি তুমি সে,* আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, জাক লাকাঁ বিদ্যালয়, ২য় খণ্ড (ঢাকা: সংবেদ এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০০৮/গ), পৃ. ৭১–৭৫।

১৩. _________, *এক আকাশের স্বপ্ন* (ঢাকা: প্রাক্সিস অধ্যয়ন সমিতি, ১৯৮১)।

১৪. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'আর্য্যামি,' *সবুজ পত্র,* বর্ষ ৫, সংখ্যা ১২, বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, *সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ,* ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৪০৬ বাংলা)।

১৫. শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বিভক্ত ভারত* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৬ বাংলা)।

১৬. আহমদ ছফা, 'অলাতচক্র,' *আহমদ ছফা রচনাবলি,* ৮ খণ্ড, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খণ্ড ৩ (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০৮/ক)।

১৭. _________, 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস,' *আহমদ ছফা রচনাবলি,* ৮ খণ্ড, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খণ্ড ৬ (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০৮/খ)।

১৮. সেলিম রেজা নিউটন সম্পাদিত, *মানুষ,* সন্ত্রাস-মিডিয়া-যুদ্ধ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩ (ঢাকা: সমাবেশ, ২০০৩)।

১৯. *পবিত্র বাইবেল,* পুরাতন ও নূতন নিয়ম (বাঙ্গালোর: ভারতের বাইবেল সোসাইটি, সনতারিখ নাই)।

২০. হ্যারল্ড পিন্টার, 'পুরানা সেই দিনের কথা ও অন্যান্য কবিতা,' সলিমুল্লাহ খান অনূদিত, সলিমুল্লাহ খান, *সত্য সাদ্দাম হোসেন ও 'স্রাজেরদৌলা',* আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান সম্পাদিত, ইতিহাস কারখানা ১, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী এবং এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ২০০৯), পৃ. ৯১–৯৮।

২১. হাসান ফেরদৌস, 'নাইপলের পাকিস্তান,' *প্রথম আলো,* ৩০ জুন ২০০০।

২২. গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়* (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪)।

২৩. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮)।

২৪. ফরহাদ মজহার, 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম,' ২৩ নবেম্বর ২০০১ আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা সেমিনারে পঠিত, *চিন্তা,* ১৫ ডিসেম্বর ২০০১।

২৫. কার্ল মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারই ব্রুমেয়ার,' কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলি,* ৪র্থ খণ্ড (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯)।

২৬. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ভূমিকা', ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৯)।

২৭. শামসুর রাহমান, *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ৮ম মুদ্রণ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ২০০৯)।

২৮. এডওয়ার্ড সাঈদ, 'অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ,' *প্রথম আলো,* ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।

২৯. সনৎকুমার সাহা, 'বাংলা গদ্যের স্বরূপসন্ধানে,' হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *প্রাকৃত*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (রাজশাহী, অক্টোবর ১৯৯২)।

৩০. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আবদুল মওদুদ অনূদিত, ৩য় মুদ্রণ (ঢাকা, ১৯৭৪)।

৩১. M. Rafiq Afzal, *Pakistan: History and Politics 1947–1971*, reprint (Karachi: Oxford University Press, 2007 [2001]).

৩২. Giorgio Agamben, *State of Exception*, trans. Kevin Attell (Chicago: University of Chicago Press, 2005).

৩৩. Aijaj Ahmad, 'Jameson's Rhetoric of Otherness and the "National Allegory",' in *In Theory: Classes, Nations, Literatures*, 2nd imp. (Delhi: Oxford University Press, 1995).

৩৪. Eqbal Ahmad, *The Selected Writings of Eqbal Ahmad*, eds. Carollee Bengelsdorf et al. reprint (New York: Columbia University Press, 2006/ka).

৩৫. ________, 'Letter to a Pakistani Diplomat' [*New York Review of Books*, 2 September 1971], in *The Selected Writings of Eqbal Ahmad*, eds. Carollee Bengelsdorf et al., reprint (Karachi: Oxford University Press, 2006/kha).

৩৬. ________, *Confronting Empire: Interviews with David Bersamian*, ed. David Bersamian (Cambridge, MA: South End Press, 2000).

৩৭. Talal Asad, *On Suicide Bombing* (New York: Columbia University Prees, 2007).

৩৮. ________, *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity* (Stanford: Stanford University Press, 2003).

৩৯. ________, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Chistianity and Islam* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993).

৪০. ________, ed., *Anthropology and the Colonial Encounter*, 5th printing (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1990 [1973]).

৪১. Issac Asimov, *Asimov's Guide to the Bible*, 2 vols. in 1 (New York: Gramercy Books, 1981).

৪২. St. Augustine, *City of God*, trans. H. Bettenson (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1984).

৪৩. Granville Austin, *Working a Democratic Constitution: A History of the Indian Experience*, reprint (New Delhi: Oxford University Press, 2004).

৪৪. Charles Baudelaire, *Baudlaire: The Complete Verse*, vol. I, trans. Francis Scarfe (London: Anvil Press Poetry, 1986).

৪৫. _______, *Flowers of Evil and Other Works/ Les fleurs du mal et oeuvres choisies*, trans. and ed. Wallace Fowlie (New York, 1964/ka).

৪৬. _______, 'On the Heroism of Modern life', in *Flowers of Evil and Other Works/ Les fleurs du mal et oeuvres choisies*, trans. and ed. Wallace Fowlie (New York, 1964/kha).

৪৭. Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, trans. Richard Davies, ed. Richard Bellamy, 4th printing, reprint (New York: Cambridge University Press, 2003 [1775]).

৪৮. Walter Beltz, *God and the Gods*, trans. Peter Heinegg (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1983).

৪৯. Walter Benjamin, *Selected Writings*, vol. 4 (1938–1940), trans. Edmund Jephcott et al., eds. Howard Eiland and Michael W. Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006/ka).

৫০. _______, 'The Paris of the Second Empire in Baudelaire,' trans. Harry Zohn, in *Selected Writings*, vol. 4 (1938–1940), trans. Edmund Jephcott et al., eds. Howard Eiland and Michael W. Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006/kha).

৫১. _______, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*, trans. Harry Zohn, reprint (London: Verso, 1997).

৫২. A. J. Bliss, *A Dictionary of Foreign Words and Phrases in Current English* (London: Routledge and Kegan Paul, 1966).

৫৩. Amilcar Cabral, *Unity and Struggle: Speeches and Writings*, texts selected by the PAIGC, trans. Michel Wolfers (London: Heinemann, 1980).

৫৪. _______, *Return to the Source: Selected Speeches of Amilcar Cabral*, ed. Africa Information Service (New York: Monthly Review Press, 1973).

৫৫. Aimé Cesaire, *Discourse on Colonialism*, trans. Joan Pinkham, reprint (New York: Monthly Review Press, 2000).

৫৬. Dhurjati Prasad De, *Bengali Muslims in Search of Social Identity, 1905–1947* (Dhaka: University Press Ltd., 1998).

৫৭. Nilanjan Dutta, 'From Subject to Citizen: Towards a History of the Indian Civil Rights Movement' in eds. Michael R.

Anderson and Sumit Guha, *Changing Concepts of Rights and Justice in South Asia*, reprint (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

৫৮. Frantz Fanon, *Black Skin White Masks*, trans. Chares Lam Markmann, reprint (London: Granada Publishing, 1970).

৫৯. ________, *A Dying Colonialism*, trans. Haakon Chevalier (New York: Grove Press, 1965).

৬০. ________, *Peau noire, masques blancs* (Paris: Editions du Seuil, 1952).

৬১. S. B. Fay, *The Origins of the World War*, 2[nd] ed., reprint (New Delhi, 1975).

৬২. M. I. Finley, *Aspects of Antiquity: Discoveries and Controversies* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1977).

৬৩. La Fontaine, *Selected Fables*, trans. J. Michie (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1979).

৬৪. Michel Foucault, *The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences*, trans. anonymous, reprint (New York, 1994).

৬৫. Richard Gamble, *The War for Righteousness: Progressive Christianity, the Great War and the Rise of the Messianic Nation* (Washiston, DC: ISI, 2003).

৬৬. M. K. Gandhi, *An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth*, trans. Mohadev Desai, The selected works of Mahatma Gandhi, 5 vols., ed. Shriman Narayan, vol. 1, reprint (Ahmedabad: Navajivan, 2001).

৬৭. Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, trans. and eds. Q. Hoare and G. N. Smith, reprint (Calcutta: Orient Longman, 1996).

৬৮. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi: Oxford University Press, 1983).

৬৯. Irfan Habib, 'Understanding 1857,' in ed. Sabyasachi Bhattacharya, *Rethinking 1857* (Hyderabad, 2007), pp. 58–66.

৭০. G. W. F. Hegel, *The Phenomenology of Mind*, trans. J. B. Baillie, reprint (New York: Harper & Row, 1967).

৭১. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 10[th] ed. (London, 1982).

৭২. Thomas Hobbes, *Leviathan*, ed. Richard Tuck (Cambridge: Cambridge University Press, 1996 [1651]).

৭৩. *Insight on the Scriptures*, 2 vols. (New York: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1988).

৭৪. Mahmudul Islam, *Rule of Law in Bangladesh: Barrister Syed Ishtiaq Ahmed Memorial Foundation Lecture 2005* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2005).

৭৫. Fredric Jameson, 'Third-world Literature in the Era of Multinational Capitalism,' in *The Jameson Reader*, eds. Michael Hardt and Kathi Weeks, reprint (Oxford: Blackwell Publishers, 2001).

৭৬. Gul Hassan Khan, *Memoirs of Lt. Gen. Gul Hassan Khan*, 2nd imp. (Karachi: Oxford University Press, 2007 [1993]).

৭৭. Salimullah Khan, *Silence: On Crimes of Power*, ed. Abul Khaer Mohammad Atikuzzaman, Eqbalnama I (Dhaka: Samhati Publications and Centre for Asian Arts and Cultures, 2009/ga).

৭৮. Leonid Kutakov, *At the Centre of Political Storms: The Memoirs of a Soviet Diplomat*, trans. Stephen Coppen (Moscow: Progress Publishers, 1986 [Russian 1983]).

৭৯. Jacques Lacan, *Écrits: The First Complete Edition in English*, trans. Bruce Fink et al. (New York: W.W. Norton, 2006/ka).

৮০. _______, 'Science and Truth,' in *Écrits: The First Complete Edition in English*, trans. Bruce Fink et al. (New York: W.W. Norton, 2006/kha), pp. 726–45.

৮১. _______, *Ethics of Psychoanalysis: The Seminar of Jacques Lacan, Book VII*, ed. Jacques-Alain Miller, trans. Denis Porter (New York, 1997).

৮২. _______, *Écrits* (Paris: Editions du Seuil, 1966).

৮৩. John L. LaMonte, 'Crusade and Jihad,' in ed. N. A. Faris, *The Arab Heritage* (Princeton, NJ, 1946).

৮৪. Claude Lévi-Strauss, *Myth and Meaning* (New York: Schocken Books, 1978).

৮৫. Karl Marx and Frederik Engels, *Selected Correspondence*, 3rd revised ed. (Moscow: Progress Publishers, 1975).

৮৬. Herman Melville, *Moby Dick*, ed. Tony Tenner (Oxford: Oxford University Press, 1988 [1851]).

৮৭. John Milton, *Samson Agonistes*, ed. F. T. Prince, 2nd imp. (Delhi: Oxford University Press, 1982).

৮৮. V. S. Naipaul, 'Reading and Writing: A Personal Account,' in *The Writer and India*, pp. 43–64; bibliographic details missing.
৮৯. ________, *Be yond Belief* (New York: Random House, 1998).
৯০. ________, *Among the Believers: An Islamic Journey* (London, 1981).
৯১. Ziad Obermeyer, Christopher J. L. Murray and Emmanuela Gakidou, 'Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: Analysis of data from the World Health Survey Programme,' *BMJ Online*, 19 June 2008, pp. 1–9; *BMJ*, no. 336 (2008), pp. 1482–86.
৯২. Bhaichand Patel, 'V. S. Naipaul and Khuswant Singh in Conversation: Hindu Revivalists are Mimicking Islamic Fundamentalists,' *Outlook*, 8 May 2000.
৯৩. F. T. Prince, 'Introduction,' in John Milton, *Samson Agonistes*, ed. F. T. Prince, 2nd imp. (Delhi: Oxford University Press, 1982), pp. 7–17.
৯৪. Jacqueline Rose; 'Deadly Embrace,' *London Review of Books*, vol. 26, no. 21 (4 November 2004).
৯৫. Kurihara Sadako, *Black Eggs*, trans. Richard H. Minear (Michigan: Center for Japanese Studies, University of Michigan, 1994).
৯৬. Edward W. Said, *Freud and the Non-European*, reprint (London: Verso, 2004/ka).
৯৭. ________, *From Oslo to Iraq and the Road Map: Essays*, intro. Tony Judt, afterword Wadie E. Said (New York: Pantheon, 2004/kha).
৯৮. ________, *Cove ring Islam* (New York: Vintage Books, 1997).
৯৯. Edward W. Said, 'Identity, Negation and Violence,' in *The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969–1994* (New York: Vintage Books, 1995); first published in *New Left Review*, 171, September–October, 1988.
১০০. ________, *Culture and Imperialism* (New York: Vintage Books, 1994).
১০১. ________, *The Question of Palestine*, reprint (New York: Vintage Books, 1992).

১০২. _______, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1979).

১০৩. Sydney H. Schanberg, 'Pakistan Divided,' *Foreign Affaris*, vol. 50, no. 1 (October 1971).

১০৪. Richard Schlatter, ed., *Hobbes' Thucydides: History of the Peleponnesian War* (New Brunswick, NJ, 1975).

১০৫. Kalyan Kumar Sengupta, *Pabna Disturbances and the Politics of Rent, 1873–1885* (New Delhi: People's Publishing House, 1974).

১০৬. Brigadier A. R. Siddiqi, *East Pakistan: The Endgame–An Onlooker's Journal, 1969–1971*, 3rd imp. (Karachi: Oxford University Press, 2006 [2004]).

১০৭. Gopal Subramanium, 'Emergency Provisions under the Indan Constitution' in eds. B. N. Kirpal et al., *Supreme but not Infallible: Essays in Honour of the Supreme Court of India* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

১০৮. Ian Talbot, *India and Pakistan*, Inventing the Nation (London: Arnold, 2000).

১০৯. T. Taylor, 'Just and Unjust Wars,' in ed. M. M. Watkin, *War, Morality, and the Military Profession*, 5th printing (Boulder, Co., 1982).

১১০. Thucydides, *The Complete Writings of Thucydides: The Peloponnesian War*, trans. R. Crawley, ed. J. H. Finley, Jr. (New York: Modern Library, 1951).

১১১. Gauri Viswanathan, *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India*, 5th imp. (New Delhi: Oxford University Press, 2004).

১১২. Michael Walzer, *Just and Unjust Wars*, 2nd ed. (New York, 1992).

১১৩. Lawrence Ziring, *Pakistan in the Twentieth Century: A Political History* (Karachi: Oxford University Press, 1997).

১১৪. *The Zondervan Pictorial Bible Dictionary*, ed. Merill C. Tenney (Grand Rapids, Michigan: Regency Reference Library, 1967).

১১৫. Alenka Zupancic, 'Lacan's Heroines: Antigone and Synge de Coufontaine,' in ed. Slavoj Zizek, *Jacques Lacan: Critical Evaluations in Cultural Theory* (London, 2003), pp. 276–90.

১১৬. _______, *Ethics of Real: Kant. Lacan* (London, 2000).

দলিলপত্র

১১৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৮)।

১১৮. *31 DLR* [Dhaka Law Reports], 1979.

১১৯. The Indian Law Commissioners, *A penal code prepared by the Indian Law Commissioners, and published by command of the Governor General of India in Council* (London: Pelham Richardson, Cornhill, 1838), reprint (Union, NJ: Lawbook Exchange, 2002).

১২০. United Nations Development Programme (UNDP), *Gender and Human Development: Human Development Report 1995* (New York, 1995).